Socio-Cultural, Economic and Educational Status of Santal Tribes in Paschim Medinipur and Jhargram District

পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

Submitted by

Rima Kisku

Reg. No: A00ED1300817

Supervised by

Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda

(Professor, Department of Education, Jadavpur University)

Department of Education

Jadavpur University

2023

আমার গবেষণার কাজটি আমার মা ঝর্ণা কিস্কু এবং মামীমা

আরতি দাসবেরা এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম

CERTIFICATE

Certified that the Thesis, entitled, **“পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা”** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Professor (Dr.) Bishnupada Nanda, Department of Education, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any other Degree or Diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor.	Candidate.
Professor (Dr.) Bishnupada Nanda	Rima Kisku
Department of Education	
Jadavpur University	
Dated:	Dated:

স্বীকারোক্তি

(Acknowledgement)

এই গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করতে যাঁরা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন আমি তাঁদের প্রতি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রথমেই আমি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ বিষ্ণুপদ নন্দ মহাশয়ের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। উনি বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত নির্দেশনা, পরামর্শ প্রদানের দ্বারা গবেষণাটি করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর কর্মপ্রয়াস ও নিঃশর্ত সহযোগিতা এই গবেষণাটিকে অর্থপূর্ণ করতে সহায়তা করেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ মুক্তিপদ সিনহা মহাশয় এর কাছে কৃতজ্ঞ। উনি বিভিন্ন সময়ে আমাকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করে গবেষণার কাজটি এগিয়ে দিয়েছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক/অধ্যাপিকা, গবেষক/গবেষিকারা বিভিন্ন সময়ে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে আমাকে সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে আমাকে সহায়তা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তথ্য সংগ্রহকালীন যাঁরা আমাকে তাঁদের মূল্যবান তথ্য প্রদান করে গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।

গবেষণার সময়ে মহাশয়া মাননীয়া শর্মিষ্ঠা নন্দ আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন এবং পাশে থেকেছেন। তাই ওনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমার ভাই সাগুন কিস্কু, সঞ্জয় মুরমু, বোন শুভ্রা দাসবেরা, সিন্থিয়া দাসবেরা, অর্চ্য মিদ্যা, সর্বজিৎ সরেন, বাপি মুরমু, জ্যোৎস্না মান্ডি এদের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ যারা আমার গবেষণা কাজটি এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন।

যাদের কথা না বললেই নয় আমার বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মাননীয় সুনীল জানা মহাশয়, আমার অভিভাবক, বন্ধু ও পথ প্রদর্শক বিদ্যালয়ের করনিক মাননীয় কালিপদ সেনগুপ্ত মহাশয়, ভাতৃসম অমিত কুমার সাউ, এছাড়াও সোমা পট্টনায়ক, মৌসুমী দাস, সুস্মিতা পয়ড়্যা, মানবেন্দ্র পট্টনায়ক, প্রসেনজিৎ সামন্ত, শিবরাম সরেন, মিন্টু বেরা, অরুণোদয় মাইতি মহাশয়/মহাশয়া দের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ যাঁরা গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য অনবরত অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন এবং বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার ছোট ভাইবোন ডঃ সৌরভী আটা, অমল দাস, মানস ভূএ্যা, পিঙ্কি মন্ডল, পায়েল গিরি এদের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

সবশেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়য়ের শিক্ষা বিভাগের লাইব্রেরিয়ান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের লাইব্রেরির বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ প্রমুখদের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ রইলাম। তাঁদের অকুণ্ঠ সহায়তা ছাড়া এই কাজ সুচারু ভাবে সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

তারিখ: রিমা কিস্কু

সূচীপত্র

স্বীকারোক্তি (Acknowledgement) i

পরিশিষ্ট (Appendix) vi

মুখবন্ধ viii

দাগ নং	প্রথম-অধ্যায়ঃ ভূমিকা	পেজ নং
১.১	প্রেক্ষাপট	১
১.২	ভূমিকা	৫
১.৩	উপজাতি	৯
১.৩.১	তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের সমস্যা সমূহ	১৪
১.৩.২	সামাজিক সমস্যা সমূহ	১৫
১.৩.৩	পরিবেশগত সমস্যা সমূহ	২০
১.৪	তপশিলি উপজাতিদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র	২৫
১.৫	সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী সমাজ শাসন ব্যবস্থার গঠন	২৮
১.৬	গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য	৩১
১.৭	গবেষণার প্রশ্ন	৩৪
১.৮	গবেষণার উদ্দেশ্য	৩৫
১.৯	সমস্যার বিবৃতি	৩৫
১.১০	গবেষণার সুযোগ	৩৬
১.১১	গবেষণার সীমা নির্দেশকরণ	৩৭
	তথ্যসূত্র	৩৯
	দ্বিতীয়-অধ্যায়ঃ সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা	
২.১	সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার উদ্দেশ্য	৪১
২.২	প্রাক স্বাধীনতা কালে সাঁওতাল সম্প্রদায় সম্পর্কে গবেষণা মূলক নিবন্ধ	৪২
২.৩	স্বাধীনতার পরবর্তী কালে গবেষণা সমূহের পর্যালোচনা	৪৮
২.৪	গবেষণার খামতি/ শূন্যস্থান চিহ্নিতকরণ	১০৬
	তথ্যসূত্র	১০৮

	তৃতীয়-অধ্যায়ঃ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের সম্পর্কে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ সমূহ:	
৩.১	উডের ডেসপ্যাচ	১১৪
৩.২	স্ট্যানলি ডেসপ্যাচ	১১৫
৩.৩	হান্টার কমিশন	১১৫
৩.৪	তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ	১১৬
৩.৫	জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এর সুপারিশ সমূহ	১৩৪
৩.৬	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প	১৫৩
৩.৭	সর্বশিক্ষা অভিযান	১৫৪
৩.৮	জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP-2020)	১৫৪
	চতুর্থ-অধ্যায়ঃ গবেষণার পদ্ধতি	
৪.১	জনসমষ্টি	১৬২
৪.২	গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থান নির্বাচন	১৬২
৪.২.১	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা	১৬৩
৪.২.২	ঝাড়গ্রাম জেলা	১৬৫
৪.৩	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস	১৬৬
৪.৪	ঝাড়গ্রাম জেলার ইতিহাস	১৬৮
৪.৫	পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার অর্থনীতি	১৬৯
৪.৫.১	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অর্থনীতি	১৭০
৪.৫.২	ঝাড়গ্রাম জেলার অর্থনীতি	১৭৩
৪.৬	পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার শিক্ষার ইতিহাস	১৭৫
৪.৭	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাংস্কৃতিক	১৮২
৪.৮	ঝাড়গ্রাম জেলার সংস্কৃতি	১৯৪
৪.৯	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উৎসব সমূহ	২০৭
৪.১০	ঝাড়গ্রাম জেলার উৎসব সমূহ	২১১
৪.১১	পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট সাঁওতালি লেখক	২১৪

৪.১২	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রতিটি ব্লকের ভৌগলিক অবস্থান	২২০
৪.১৩	ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি ব্লকের ভৌগলিক অবস্থান	২৩৮
৪.১৪	Sample বা নমুনা	২৪৭
৪.১৫	গবেষণার নকশা	২৪৭
৪.১৫.১	পর্যবেক্ষণ	২৫১
৪.১৫.২	PRA (Participatory Rural Appraisal)	২৫৩
৪.১৫.৩	ফোকাস দল আলোচনা	২৬০
৪.১৫.৪	সাক্ষাৎকার	২৬২
৪.১৬	গবেষণার কলাকৌশল	২৬৪
৪.১৬.১	তথ্য সংগ্রহের কৌশল	২৬৪
	তথ্যসূত্র	২৬৫
	পঞ্চম-অধ্যায়ঃ সংগৃীত তথ্যের বিশ্লেষণ	
৫.১	তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যের বিশ্লেষণ	২৬৭
৫.২	সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জন্মকালীন আচার-অনুষ্ঠান	৩০৬
৫.৩	সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিবাহ	৩১৫
৫.৪	সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মৃত্যুর পর আচার-অনুষ্ঠান	৩২৫
	ষষ্ঠ-অধ্যায়ঃ প্রাপ্ত ফলাফল ও তার আলোচনা	
৬.১	প্রাপ্ত ফলাফল	৩৩০
৬.১.১	সাঁওতালদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য	৩৩০
৬.১.২	সাঁওতালদের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য	৩৩৩
৬.১.৩	সাঁওতালদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য	৩৩৪
৬.২	আলোচনা	৩৩৬
৬.৩	শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য	৩৪৪
৬.৪	পরবর্তী গবেষণার সুযোগ	৩৪৬
৬.৫	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৩৪৭
	তথ্যসূত্র	৩৪৯
	গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)	৩৫০
	সারাংশ (Summary)	৩৫৮

পরিশিষ্ট

(Appendix)

পরিশিষ্ট – I তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র

পরিশিষ্ট - II তথ্য সংগ্রহ কালীন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট - III তথ্য সংগ্রহ কালীন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট - IV তথ্য সংগ্রহ কালীন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট - V তথ্য সংগ্রহ কালীন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট – VI সাকরাত পরবের মাংস পিঠা (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট - VII সহরায় বঙা (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট - VIII দাঁসায় নাচ (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট - IX সাঁওতালিদের বাড়ির দেওয়াল চিত্র (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট – X সাকরাত বঙা (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট – XI মাঘসিম বঙা (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট – XII মাঃ মড়ে পুজোতে ঠাকুর ভর হওয়ার চিত্র (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট - XIII সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র ও সেমিনার পাঠ করা পত্র

পরিশিষ্ট – XIV সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র ও সেমিনার পাঠ করা পত্র

পরিশিষ্ট – XV সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র ও সেমিনার পাঠ করা পত্র

পরিশিষ্ট - XVI গবেষণা পত্র ও শংসাপত্র

মুখবন্ধ

ভারতের আদিমতম উপজাতি হল সাঁওতাল উপজাতি। সাঁওতাল সম্ভবত একটি বহিরাগত শব্দ থেকে উদ্ভূত। সংস্কৃত 'সামন্ত' বা বাংলা 'সাঁওত' এর অর্থ 'সমতল ভূমি'। এদের আদি জন্মভূমি নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। সম্ভবত অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষার মানুষেরা প্রায় ৩৫০০-৪০০০ বছর আগে ইন্দোচীন থেকে উড়িষ্যার উপকূলে এসেছিল। তারপর এরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় ভারতীয় জনসংখ্যার সাথে ব্যাপকভাবে মিশে যায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শিলদার সাওন্ত অঞ্চলে বসবাসকালে এদের নাম হয়েছিল সাঁওতাল। যারা বাংলা ভাষায় কথা বলতো তারা এদেরকে সাওন্তার বলত এবং সেটি বিকৃত হয়ে ইংরেজিতে সান্তাল (SANTAL) বা সাঁওতাল হয়েছে। সাধারণত তারা নিজেদেরকে হড় (MAN) বা হড়হপন (মানবজাতির সন্তান) বলতো। এদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি আছে। এদের নিজস্ব ভাষা হল সাঁওতালি। এরা এই ভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তারা এই ভাষায় গান করে এবং গানের মাধ্যমে তারা নিজস্বতা প্রকাশ করে। তাদের নাচের ও নিজস্ব ছন্দ আছে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, ধর্মীয় এবং পরব অনুষ্ঠানের ধরণ ও গানের প্রকারভেদ ভিন্ন। তারা প্রধানত ধামসা মাদল সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করে। পাহারা এদের প্রধান উৎসব এছাড়া বাহা, সহরায়, করমও এদের পালনীয় উৎসব। এই সমস্ত উৎসব গুলিতেও এরা ধামসা মাদল সহযোগ নৃত্য পরিবেশন করে। সহরায় উৎসবে বিশেষত এরা দেওয়ালে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্রাঙ্কন করে থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এদের পুরুষেরা পাঞ্চি ধুতি ও মহিলারা পাঞ্চি শাড়ি পরিধান করে। এছাড়াও মহিলারা রূপোর গয়না এবং খোপায় ফুল পরে। এরা অ-সাঁওতালদের

সাথে মেলামেশা করলেও নিজেদের জাতিতেই বিবাহ করতে পছন্দ করে। দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হওয়ায় এরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং শিক্ষার দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। আদিমকালের মতই এখনও এরা জঙ্গলে, মাঠে, গিয়ে পাখি, কাঠবিড়ালি, ইঁদুর, বনবিড়াল শিকার করে নিয়ে আসে। এদের প্রধান খাদ্য ভাত, শাক, গেঁড়ি, কাঁকড়া, মাছ, মাংস প্রভৃতি। এরা মূলত দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে সরকারি সুযোগ সুবিধা নিয়ে তাদের কষ্ট অনেকটাই লাঘব হয়েছে। বিভিন্ন সচেতনতা মূলক শিবির, সরকারি অনুদান, বেসরকারি প্রচেষ্টা এর মাধ্যমে তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে এবং সচেতনতা দেখা যাচ্ছে। অনেকেই তারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও তাদের ভাষা সরকারিভাবে গুরুত্ব পাওয়ায় তারা নিজস্ব ভাষাতেও শিক্ষালাভ করার সুযোগ পাচ্ছে।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাঁওতালদেরও সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও সাঁওতালরা অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। বিভিন্ন গবেষক/গবেষিকা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির উপর আলোকপাত করলেও নিরন্তর সংশ্লিষ্ট পর্যালোচনায় দুটি সাঁওতাল প্রধান অঞ্চল পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রের ওপর বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয়নি। তাই গবেষিকা দুটি সাঁওতাল প্রধান জেলার সাঁওতালদের উপরে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলির ওপর আলোকপাত করে গবেষণা করেছেন।

গবেষিকা সমগ্র গবেষণা কার্যটি মোট ৬ টি অধ্যায়ে সম্পন্ন করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট এবং ভূমিকা, সাঁওতালদের উৎপত্তির ইতিহাস, গবেষণার প্রশ্ন, গবেষণার উদ্দেশ্য, সমস্যার বিবৃতি, গবেষণার খামতি, গবেষণার সুযোগ, সীমা নির্দেশকরণ ইত্যাদি রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষিকা গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য সমূহের পর্যালোচনা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষিকা বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনে সাঁওতাল বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষা সম্পর্কে কি কি সুপারিশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষিকা তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষিকা প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে তুলে ধরেছেন এবং সাঁওতালদের সংস্কৃতি, পালনীয় উৎসব, সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষিকা গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য কে বিশ্লেষণ করেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার উপযোগিতা, পরবর্তী গবেষণার সুযোগ, গবেষণার উপসংহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

গবেষিকা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনীতি, এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা জানার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার মোট ২০ টি ব্লকের, ২০ টি সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

সর্বোপরি এই গবেষণার দ্বারা গবেষিকা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সর্বসমক্ষে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছেন।

প্রথম-অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

১.২ ভূমিকা

১.৩ উপজাতি

১.৩.১ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের সমস্যা সমূহ

১.৩.২ সামাজিক সমস্যা সমূহ

১.৩.৩ পরিবেশগত সমস্যা সমূহ

১.৪ তপশিলি উপজাতিদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র

১.৫ সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী সমাজ শাসন ব্যবস্থার গঠন

১.৬ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য

১.৭ গবেষণার প্রশ্ন

১.৮ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৯ সমস্যার বিবৃতি

১.১০ গবেষণার সুযোগ

১.১১ গবেষণার সীমা নির্দেশকরণ

তথ্যসূত্র

প্রথম-অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট:

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ২৪০-২৪২ বছর পূর্বে ল্যাটিন শব্দ “ট্রাইবাস” শব্দ বলতে বোঝাত টাইটেস, Ramnes, লুসেরস নামক তিনটি গ্রামীন গোষ্ঠীকে যারা রোম শহরের বাইরের বিভিন্ন গ্রামে থাকতেন। এই তিনটি গোষ্ঠী অর্থাৎ ‘ট্রাই’ থেকে ‘ট্রাইবাস’ শব্দের উৎপত্তি। ভারতে সাঁওতাল সমেত ৬৬৫ ধরনের আদিবাসী বা তপশিলি উপজাতির মানুষ রয়েছেন। ‘আদিবাসী’ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৩২ সালে ঝাড়খন্ড আন্দোলনের শুরুতে ‘আদিবাসী’ শীর্ষক পত্রিকায়। জয়পাল সিং ঝাড়খন্ড আন্দোলনের প্রথম সারির অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি ‘Scheduled Tribe’ শব্দের পরিবর্তে আদিবাসী শব্দটিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, যদিও বাবাসাহেব আম্বেদকরের আপত্তিতে তা তখন সম্ভব হয়নি। আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষেরা সাধারণত যথেষ্ট দরিদ্র হন। অমর্ত্য সেন (২০২০, বিখ্যাত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ) লিখেছেন যে, দলিত ও অন্যান্য পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর মানুষেরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে খুবই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আছে। আর তার চাইতেও খারাপ অবস্থায় আছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী।

আর্যরা ভারতবর্ষে আসার পূর্ব থেকেই আদিবাসীরা ভারতবর্ষে বসবাস করতেন। তাঁরা নিজেদের মত করে একটি সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, যদিও সম্ভবত প্রথম মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন ফসিলস্ টি পাওয়া গেছে আফ্রিকাতে। ঐতিহাসিকদের মতে ওই ফসিলস্ এর বয়স আনুমানিক ৩.৩-৩ লক্ষ বছর পূর্বের। এই গোষ্ঠীর মানুষেরা কয়েক

লক্ষ বছর আফ্রিকাতেই বসবাস করতেন। আজ থেকে ৭০-৭৫ হাজার বছর আগে খাবারের খোঁজে একদল মানুষ আফ্রিকা ছেড়ে বাইরের দিকে এগোতে শুরু করেন, মনে করা হয় যে এরাই ছিলেন সমস্ত মানুষের পূর্বজ (বন্দোপাধ্যায়) ।

ঋকবেদে কৃষ্ণ বর্ণের দাস বা দাসায়ুদের কথা বলা হয়েছে। যাদের সঙ্গে গৌরবর্ণের আর্যদের নিরন্তর সংঘাত লেগে থাকতো। বেদে যে অসুরদের কথা বলা হয়েছে তারা বর্তমানে আদিবাসী বলেই পরিচিত। রামায়ণে যে শবরদের কথা পাই তারাও বর্তমানকালে আদিবাসী বলে পরিচিত। মহাভারতে কিরাত এবং কৌরব সেনাবাহিনীদের মধ্যে মুন্ডা সেনাদের উপস্থিতির বিবরণ সঞ্জয় দিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রকে।

শ্রীমদভাগবতে কোল এবং ভিলদের পূর্বপুরুষ 'কোল্লা' এবং 'ভিল্লাদের' কথা জানা যায়। এই ভিল দের কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায়,

"গৌরবঙ্গ রাঢ় উৎকলাদি দেশে গিয়া
লোকের নিস্তার কইলো আপনি ভ্রমিয়া
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝড়িখন্ড
ভিল্ল প্রায় লোক তাহা পরম পাষন্ড"।

অর্থাৎ মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিবাসী ভীলদের পরম পাষন্ড হিসেবে দেখানো হয়েছে।

সপ্তদশ শতকে কবিকঙ্কনের একটি বর্ণনাতে কিরাত, কোল প্রমুখ আদিবাসীদের সম্পর্কে জানা যায় (বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান, ২০১২) ।

আদিবাসীদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। এই ভাষা এবং সংস্কৃতি হারিয়ে গেলে আদিবাসী সমাজের আর নিজস্বতা বলে কিছু থাকে না। আদিবাসীদের ভাষায় গানের মধ্যে তাদের নিজস্বতার পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। যেমন সাঁওতালি ভাষায় একটি গান রয়েছে যেটি পন্ডিত রঘুনাথ মুর্ম্মুর লেখা সচেতনতা মূলক একটি গান -

"অল মেনাঃ তামা রড় মেনা: তামা ধরম মেনাঃ তামা আম হ মেনাম।

অল এম আদ লেরে রড় এম আদ লেরে

ধরমেম আদ লেরে আম হম আদঃ" ।

অর্থাৎ নিজের অলচিকি লিপি, সাঁওতালি ভাষা এবং নিজের ধর্ম আছে বলেই সাঁওতালরা আছেন, তারা নিজের ধর্ম নিজের সংস্কৃতি নিজের ভাষা হারিয়ে ফেললে নিজেরাও হারিয়ে যাবেন।

কাশিপুরের গায়ক কবি ভগবান মাঝি একজন কুভিঙ্গা উপজাতির মানুষ। তাদের ভাষা হল কুভি। কিন্তু বর্তমানে আর কুভি ভাষা কেউ বোঝেনা। ভগবান মাঝির কথায় কুভি ভাষায় কথা বলার মানুষগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বেঁচে রয়েছে কুভিঙ্গা উপজাতি, আর এই ভাষার মাঝে বাঁচে জল, জঙ্গল, জমিন, পাহাড়, পাখির ডাক, ঝরণার শব্দ, মহুয়ার বনে হাওয়ার শব্দ, সেই ভাষার শব্দবোধ। ভাষাটা হারিয়ে যাচ্ছে বলেই হারিয়ে যাচ্ছে জল, জঙ্গল, জমিন, পাহাড়। ভগবান মাঝি তাঁর এই যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন ওড়িয়া এবং হিন্দি মেশানো একটি গানের মধ্যে।

“গাঁও ছোড়ব্ নাহি জঙ্গল ছোড়ব্ নাহি।

মায় মাটি ছোড়ব্ নাহি লড়াই ছোড়ব্ নাহি।

বাঁধ বানায় গাঁও ডুবোয়ে কারখানা বানায়ে

জল জঙ্গল জমিন ছোড়ি হিমিন কাঁহা কাঁহা যাবে

যমুনা শুখি নর্মদা শুখি শুখি সুওনরেখা

গঙ্গা বনে বন্দী নালী কৃষ্ণা কালিরেখা।

তুম পিয়োগে পেপসি কোলা বিসলেরিকা পানি

হাম ক্যায়সে আপনা পিয়াস বুঝায়ে পিকর কাচরাপানি”।

পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে অসুর নামক উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের বসবাস রয়েছে। মূলত চা বাগান এলাকায় এবং ডুয়ার্সের তরাই অঞ্চলের জঙ্গলের মধ্যে এরা বসবাস করেন। অসুরদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে ‘আসুরিন’। কিন্তু বর্তমানে অসুর সম্প্রদায়ের খুব কম মানুষ নিজেদের ভাষায় কথা বলেন বা বোঝেন। অসুর সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষের একটি অতি প্রাচীন আদিবাসী সম্প্রদায়। ঋকবেদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে অসুর শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

আদিবাসী জীবন ও প্রকৃতির উপর আধুনিক সভ্যজগৎ নিরন্তর নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে চলেছে। কিন্তু তবুও আদিবাসীদের মধ্যে এখনো দেখা যায় প্রকৃতি এবং মানুষের সহ সম্পর্কের লালনকে। আদিবাসীরা প্রকৃতির সঙ্গে সহজীবী পরিবেশ সুরক্ষা করে আজও।

আদিবাসীরা জঙ্গলকে নষ্ট না করে জঙ্গলের উপবৃত্ত অথবা অপ্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করেন জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রেখে। অরণ্য, ভূমি, নদী ও বিস্তীর্ণ প্রকৃতির বংশানুক্রমিক

উত্তরাধিকার পেয়েও আজও আদিবাসীরা ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে অনাহার, দারিদ্র ও নিরক্ষরতাকে বরণ করে নিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রতি ১০ জন আদিবাসীর মধ্যে ৪ জনই নিরক্ষর, এবং প্রতি ১০০ জন আদিবাসী শিশুদের মধ্যে ৩৭ জনের মৃত্যু হয়। এই শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ আদিবাসী সমাজের দারিদ্র্য, অনাহার এবং অবশ্যই নিরক্ষরতা।

ভারতে ৬৬৫ ধরনের যে আদিবাসী মানুষ রয়েছেন তাদের মধ্যে সাঁওতালরা অন্যতম। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাঁওতালরা অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন।

১.২ ভূমিকা:

ভারতবর্ষ একটি বহু জাতির দেশ। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রায় ৬৬৫ ধরনের আদিবাসী মানুষ ভারতে বসবাস করে থাকেন। তাঁরা হলেন- অসুর, মুন্ডা, ওঁরাও, মেছ, রাভা, গারো, কোড়া, টোটো, সাঁওতাল প্রভৃতি। এই সকল আদিবাসী মানুষেরা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিছিন্ন হয়ে পৃথক পরিবেশে বসবাস করেন। ভারতবর্ষে আদিবাসীরা হলেন সমাজ বহির্ভূত সম্প্রদায়। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসীরা ভারতবর্ষে বসবাস করেন। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতবর্ষে বসবাস করেন ১০.০৩ কোটি আদিবাসী মানুষ, যা ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৮.৩%। এদের মধ্যে ৮৯.৯৭% মানুষ বসবাস করেন গ্রামাঞ্চলে এবং ১০.০৩% মানুষ বসবাস করেন শহরাঞ্চলে। ভারতবর্ষের প্রতি ১০০০ জন আদিবাসী পুরুষের মধ্যে আদিবাসী মহিলার সংখ্যা ৯৯০ জন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ ধরনের আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে জানা যায়। এদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ সব থেকে বেশি বসবাস করেন। ২০১১ এর আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী মানুষের সংখ্যা হল ৫২,৯৬,৯৫৩ জন, যেখানে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ২৫,১২,৩৩১ জন। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের সাক্ষরতার হার ৪৩.৪%। যেখানে পুরুষের সাক্ষরতার হার (৫৭.৪%) এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ২৯.২%। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ধরনের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের সাক্ষরতার হার মোট ৪২.২%। এর মধ্যে পুরুষদের সাক্ষরতার হার ৫৭.৩% এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ২৭%।

সাঁওতালদের বসবাসের স্থানের সংকুলান খুবই সীমিত। এদের সংস্কৃতি, নিয়ম-কানুন, ধর্ম এগুলিই এদেরকে অন্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা করে। সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে। ডঃ ডি. এন. মজুমদার এর মতে সাঁওতালরা হলেন অনেকগুলি পরিবারের মিলিত রূপ যেখানে সদস্যরা একই জায়গায় বসবাস করেন। একই ভাষা বলেন, একই ধরনের কাজকর্ম করে থাকেন এবং একই ধরনের নিয়মকানুন মেনে চলেন।

এই সাঁওতালরা ব্রিটিশ সরকারের আসার আগে খেরওয়াল নামে পরিচিত ছিলেন। ডঃ বরখা কিস্কু তাঁর বই “The Santals and their Ancestors” এ লিখেছেন যে –“The Santals themselves state that they got this name through foreigners commencing to call them so whilst and because they were living in saont (sant as they pronounce the name of the country), which has been identified with the modern Silda Pargana in Medinipur district”.

সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা সাঁওতালি ভাষা নামে পরিচিত। এই ভাষা মুন্ডা, হো, মাহালি, ভূমিজ, এবং খেড়িয়া ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। Peter W. Schmidt এই ভাষাগোষ্ঠী কে Austro-Asiatic ভাষাগোষ্ঠী বলে শ্রেণিকরণ করেছেন। সাঁওতালি ভাষা যেমন মুন্ডাপরিবারের ভাষার অন্তর্গত তেমনি অন্যান্য ভাষা গুলিকে নৃতত্ত্ববিদ্যায় শ্রেণিকরণ করা হয়েছে- Pre- Dravidians, Kolarians, Dravidians, Proto- Astraloids, Nishadies, and Austric প্রভৃতি। সামান্য কিছু বছরের মধ্যে সাঁওতালরা তাঁদের সাঁওতালি ভাষার লিপিকে উন্নত করেছেন, যা “অলচিকি” নামে পরিচিত।

স্বাধীনতার উত্তরযুগে এমনকি স্বাধীনতার পূর্বযুগে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকালেও সমস্ত ভারতীয়দের মধ্যে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ্ হয়েছেন উপজাতি সম্প্রদায় তাঁরা একদিকে যেমন ব্রিটিশদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন তেমনি অপরদিকে উচ্চজাতির মানুষেরাও সমান ভাবে অত্যাচার করে গেছেন। তাঁদের না আছে নিজস্ব বসবাসের স্থান, জমি তেমনি তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত সঙ্কুল, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী তবুও এই সমস্ত কিছুর পরেও সমস্ত ধরনের উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতালরা তুলনামুলুক ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনীতিতে এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

সাঁওতাল সমাজের অর্থনৈতিক নকশা লক্ষণীয়। এঁদের নিজেদের মধ্যে সংহতি আছে এবং জাতিগতভাবে এঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়। এঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধানত কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। এঁরা বাইরের সম্প্রদায়ের সাথে ব্যাবসা-বানিজ্যও করে থাকেন। এতদ্ সত্ত্বেও সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে

অনেক দুর্বল। প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এঁদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। এঁদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি প্রাকৃতিক উৎস নির্ভর। ফলে এঁদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উন্নতি সীমিত। পূর্ববর্তী রীতি বজায় রেখে এঁরা একই ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদের মধ্যে নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। এঁরা বাইরের সমাজ থেকে বিছিন্ন থাকতে এবং একই রকম ভাবে যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তিত জীবন যাপন করতে পছন্দ করেন। বিশ্বজিৎ পাল ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিভিন্ন উপজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে নিরীক্ষণ করেন, যেখানে তিনি এই উপজাতিদের জীবনধারণের ধরণ, বাসস্থান, নিয়ম-কানুন গুলিকে লক্ষ্য করেন। গবেষণায় তিনি চারটি ভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক আচরণ কে লক্ষ্য করেন।

আদিবাসী সমাজে আদিবাসীদের উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। কারন তাঁদের বসবাসের মান খারাপ, ক্ষুধা, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যসমস্যা প্রাত্যহিক জীবনের সাথে জড়িত, নিরক্ষরতা, বেকারত্বের অভিশাপ আদিবাসী সমাজের রোজনামচা। যেকোনো উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, তার সাথে প্রয়োজন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি। পরিবর্তনের আধুনিক প্রক্রিয়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত হয় শিল্পায়ন, নগরোন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নতি প্রভৃতি। উপজাতি সম্প্রদায় এতদ্ সত্ত্বেও উন্নয়নের সুফল প্রাপ্তি থেকে বহুদূরে রয়েছে। দেশ নির্মাণ এবং সুনাগরিক তৈরীর জন্য শিক্ষা একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় বিষয়। মানবীয় সংস্থানের উন্নতির জন্য শিক্ষা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। শিক্ষা মানুষকে দেয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং চরিত্র। স্বাধীনতার পরে ভারত সরকারের সাক্ষরতা মিশন 3RS (Reading, Writing and Arithmetic) এর

ওপর জোর দিয়েছেন এবং রাজ্যসরকার গুলিকে নীতি নির্দেশ মেনে জনগণের চাহিদা পুরনের জন্য সক্রিয় হতে বলেছেন। শিক্ষা হলো ক্ষমতায়নের সামনের দরজা। এটি মহিলাদের ক্ষমতায়ন এর কার্যকরী সরঞ্জাম ও বটে। সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার হার অন্যান্য উচ্চ জাতির মানুষদের তুলনায় অনেক কম এবং তাঁদের পড়াশোনার প্রতি অনীহা দেখা যায়। বেশিরভাগ সাঁওতাল মহিলারা বাড়ির বাইরে কাজ করেন এবং তারা বিভিন্ন ধরনের দিনমজুরির কাজের সাথে যুক্ত থাকেন। অল্পবয়সী মেয়েরাও তাদের মায়ের সাথে বাড়ি থেকে অনেক দূরে কাজ করতে যায়। বেশিরভাগ সময় তারা প্রত্যহ স্কুলে যেতে পারে না বা যেতে চায় না এবং স্কুলছুট হয়। গরিব পরিবারের পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে চান না কারণ বাচ্চারা তাদেরকে বাড়ির কাজে সাহায্য করে ফলে বাড়ির মহিলারা তাদের পারিবারিক কাজের চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

১.৩ উপজাতি (Tribe):

Tribe শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Tribus থেকে এসেছে। Tribal শব্দটি প্রধানত একদল বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষকে চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হয়। ভারতবর্ষ প্রকৃতিগতভাবে সমৃদ্ধ দেশ। পূর্বতন সমাজের সংস্কৃতি থেকে ভারতবর্ষের যেমন লাভ হয়েছে উপজাতি সম্প্রদায় তেমন লাভ করতে পারেননি। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা সবসময় নিজেদের মধ্যে থাকতে পছন্দ করেন এবং নিজেদের মধ্যে একটা নিজস্ব সংস্কৃতির সম্প্রদায় তৈরি করেছেন- তাঁদেরকেই Tribe বলা হয়।

উপজাতি শব্দটি ব্যবহৃত হয় সারা বিশ্বব্যাপী বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা গোষ্ঠীসমূহকে চিহ্নিত করতে যাদেরকে UN অথবা মানবিক মানবাধিকারের সংগঠন দ্বারা আদিবাসী বা দেশীয়

মানুষ হিসেবে সম্বোধন করা হয়। ভারতবর্ষে এঁদেরকেই মূলনিবাসী অথবা আদিবাসী বলা হয়।

উপজাতি শব্দটির মাধ্যমে অনেকগুলি গোষ্ঠী যারা কোন স্থানের মূলনিবাসী, তাঁদেরকে বোঝানো হয় যারা তাঁদের ঐতিহাসিক জাতিগত সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত অক্ষুন্ন রেখেছেন।

মানব ইতিহাসে আদিবাসীদের সাথে অন্যান্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব প্রায়ই দেখা গিয়েছে। মানব সভ্যতার উন্নয়ন সমাজে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। কিছুসংখ্যক উপজাতি অনেক সময় সমাজে নিম্নবর্ণ, কৃষক অথবা কারিগর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু বাকিরা যারা তাদের সংস্কৃতি বজায় রেখেছেন তাঁরা বন-জঙ্গল এবং কৃষির উপর নির্ভরশীলতা বজায় রেখেছেন। ফলে তাঁরা নিজেদেরকে জাতিপ্রথা থেকে আলাদা রেখেছেন। মূল ধারার সমাজ কৃষি, বাণিজ্য, প্রযুক্তিবিদ্যা কে কাজে লাগিয়ে আজকের আধুনিক সমাজ এবং সভ্যতাকে তৈরী করেছেন। ফলে দেশীয় আদিবাসী মানুষদের প্রান্তিকীকরণ হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলিকে ফলত অসামাজিক, অনগ্রসর, বর্বর এবং অপরিচ্ছন্ন বলে মনে করা হয়েছে বৃহত্তর মূলস্রোতের সমাজে।

ব্রিটিশ সাম্রাজের বিস্তারের সাথে সাথে প্রান্তিকীকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে বনভূমি দখল করেছে। বনজ সম্পদ যেমন কাঠ খনিজ ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য আদিবাসীদের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। নতুন শাসন ও বিচার ব্যবস্থার দ্বারা তাদেরকে শোষণমূলক জমিদারি ব্যবস্থায় কৃষি শ্রমিকে পরিণত করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে ভারত সরকার উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালু রেখেছেন। ২০১১ এর জনগণনা অনুযায়ী উপজাতিরা মোট জনসংখ্যার ৮.৬%। সংখ্যায় ১০৪.২৮ মিলিয়ন এবং তাঁরা দেশের জমির ১৫% অংশে বসবাস করেন। ভারতের সংবিধান তাঁদের অধিকার, জমি এবং সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট। জাতীয় কমিশন বিভিন্ন বিষয় যেমন-কল্যাণ মূলক প্রকল্প প্রয়োগ, আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং এই গোষ্ঠীর প্রতি বিভেদ মূলক আচরণের উপর নজরদারি রাখে। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার সংবিধানের সহায়তায় বিভিন্ন সংরক্ষণমূলক নীতি গ্রহণ করেছেন। তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষে ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল নং ৪৬ (Article No-46) এবং ২৪৪ ধারায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে সমস্ত রাজ্যে উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের জন্য পৃথক মন্ত্রক গঠন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গেও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

কিছু পরিকল্পনা এবং প্রস্তাব কাগজেই রয়ে গেছে। বেশিরভাগ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য সুবিধাবাদী রাজনীতি, অসঙ্গত উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ,এবং উপজাতিদের তথাকথিত মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

অর্থনৈতিক অবহেলা এবং ভূমিহীনতা ছাড়াও উপজাতিরা তাঁদের সংস্কৃতির অবনমন লক্ষ্য করেছেন। বেশির ভাগ উপজাতির সংস্কৃতি মৌখিক, এঁদের কোন লিখিত রূপ নেই কারণ লিপি নেই। যদি ভারতবর্ষের মৌখিক সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায় হাজার উনিশ শতকের লিপি এবং মুদ্রণ আধিপত্য অনেক আদিবাসী সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রভাবকে হ্রাস করেছে। লেখার

অক্ষমতা তাদেরকে ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিতে উপজাতিদের অবদান সম্পর্কে নির্বাক দর্শক করে রেখেছে। এখন সময় এসেছে যেখানে উপজাতিদের আওয়াজ মূলধারা পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। অবাস্তব পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবের পরিবর্তে উপজাতিদের পরামর্শ গ্রহণ করাও যে প্রয়োজন একথা রাজ্য সরকারগুলি এবং ভারত সরকার বুঝতে পেরেছেন।

সংবিধানের প্রণেতারা এই সত্যটি নোট করেছেন যে ভারতের কিছু সম্প্রদায় চরম সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতায় ভুগছে। এই সম্প্রদায়গুলিকে যথাক্রমে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৪১ এবং ৩৪২ এর ক্লজ ১ এ থাকা বিধান অনুসারে তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল।

উপজাতিরা হলেন যে কোন রাষ্ট্রের আদিম স্থানীয় জনগণ যারা ভারতীয় উপদ্বীপের প্রাচীনতম বসতি স্থাপনকারী বলেই মনে করা হয়। এঁদেরকে আদিবাসী বা প্রকৃত অধিবাসী বলে চিহ্নিত করা হয়।

'তপশিলি উপজাতি' শব্দটি ভারতের সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের ৩৬৬(২৫) অনুচ্ছেদ তপশিলি উপজাতিকে সংজ্ঞায়িত করেছে। যেমন, উপজাতি বা উপজাতীয় সম্প্রদায় বা এই জাতীয় উপজাতি বা উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অংশ বা গোষ্ঠী গুলিকে এই সংবিধানের উদ্দেশ্যের অনুচ্ছেদ ৩৪২ এর অধীনে তপশিলি উপজাতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩৪২ তপশিলি উপজাতির নির্দিষ্টকরনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে।

বিস্তৃতভাবে তপশিলি উপজাতিরা দুটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক এলাকায় বাস করেন - মধ্য ভারত এবং উত্তর-পূর্ব এলাকা। তপশিলি উপজাতি জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মধ্য ভারতে

কেন্দ্রীভূত, যেমন-মধ্যপ্রদেশ (১৪.৬৯%), ছত্রিশগড় (৭.৫%), ঝাড়খন্ড (৮.২৯%), অন্ধপ্রদেশ (৫.৭%), মহারাষ্ট্র (১০.০৮%), উড়িষ্যা (৯.২%), গুজরাট (৮.৫৫%), এবং রাজস্থান (৮.৮৬%)।

অন্যান্য স্বতন্ত্র এলাকা হলো উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (আসাম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মনিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরা, সিকিম, এবং অরুণাচল প্রদেশ)।

তপশিলি উপজাতি জনসংখ্যা দুই তৃতীয়াংশের বেশি শুধুমাত্র দেশের সাতটি রাজ্যে কেন্দ্রীভূত, যেমন- মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, গুজরাট, রাজস্থান, ঝাড়খন্ড, এবং ছত্রিশগড়। তিনটি রাজ্যে (দিল্লি, পাঞ্জাব, এবং হরিয়ানা) এবং দুইটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে (পুদুচেরি এবং চন্ডিগড়) কোন নির্দিষ্ট তপশিলি উপজাতির জনসংখ্যা নেই।

- **নির্ধারিত এলাকা (পঞ্চম তপশিল):** তপশিলি এলাকা (সংবিধানের পঞ্চম তপশিলের অধীনে) হল "যে ধরনের এলাকাকে রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে তপশিলি এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন। বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানা নামে দশটি রাজ্য পঞ্চম তপশিলি এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- **ষষ্ঠ তফশিল:** এটি উপজাতীয় জনসংখ্যাকে রক্ষা করে এবং স্বায়ত্ত্বশাসিত উন্নয়ন পরিষদ তৈরীর মাধ্যমে সম্প্রদায়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে যা ভূমি, জনস্বাস্থ্য, কৃষি এবং অন্যান্য বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

  ষষ্ঠ তপশিল আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম রাজ্যের নির্দিষ্ট উপজাতীয় এলাকায় প্রযোজ্য।

ষষ্ঠ তপশিল স্বায়ত্তশাসিত জেলা এবং আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিধান দেয় এবং এই স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে আইন প্রণয়ন, নির্বাহী এবং বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করে। এখনো পর্যন্ত আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, এবং মিজোরামে দশটি স্বায়ত্ত্বশাসিত পরিষদ রয়েছে। এই বিশেষ বিধানটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৪ (২) এবং অনুচ্ছেদ ২৭৫ (১) এর অধীনে দেওয়া হয়েছে।

১.৩.১ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের সমস্যা সমূহ:

বি. কে. রায় বর্মন (১৯৭২) দ্বারা করা সার্ভে দেখায় আদিবাসীরা তাদের স্বল্প সাক্ষরতা এবং আদিম অর্থনীতির কারণে সবচেয়ে পিছিয়ে। এই পার্থক্য থাকা সত্তেও আদিবাসীদের কিছু সাধারণ সমস্যা হল –

১. দারিদ্র্য ও শোষণ।

২. অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা।

৩. সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা।

৪. উপজাতি নয় এমন জনগোষ্ঠীর সাথে আত্তীকরণের সমস্যা।

এস. এম. দুবে ভারতীয় উপজাতিদের পাঁচভাগে শ্রেণীবিভাগ করেছেন যা ভারতের উপজাতিদের সমস্যার একটি স্পষ্ট চিত্র দেয়। দুবে (১৯৮২) উল্লেখ করেছেন-

১. নির্জনে বসবাসকারী আদিবাসী।

২. উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলি প্রতিবেশী অ-উপজাতি সমাজের সাথে কিছুটা মেলামেশা করে এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।

৩. বর্ণ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে গ্রামে বসবাসকারী উপজাতি। এরা নিজেদের পরিচয় বজায় রাখে।

৪. উপজাতি যারা অস্পৃশ্য হিসাবে সমাজে চিহ্নিত।

৫. উপজাতি, যারা উচ্চ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মর্যাদা ভোগ করে।

১.৩.২ সামাজিক সমস্যা সমূহ:

নিরক্ষরতার উচ্চ ঘটনা (শিক্ষার অভাব) এবং লিঙ্গ বৈষম্য - **১৯৯১** সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রায় ৭০% আদিবাসী নিরক্ষর। যদিও এটা অস্বীকার করা যায় না যে শিক্ষা আদিবাসীদের উন্নতির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে যা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের জন্য বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তবুও কিছু কারণ রয়েছে যা আদিবাসীদের শিক্ষা গ্রহণে বাধা দেয়। এই কারণগুলির মধ্যে রয়েছে উপজাতীয় কুসংস্কার এবং চরম দারিদ্র্য। কিছু নির্দিষ্ট উপজাতির যাযাবর জীবনধারা, অন্য ভাষার মাধ্যমে পড়ানো, বিভিন্ন বিষয়গুলির প্রতি আগ্রহের অভাব এবং উপজাতীয় এলাকায় উপযুক্ত শিক্ষক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাব।

- **মৃত্যুর হার :** সম্প্রতি অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর তুলনায় আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিতে সর্বোচ্চ শিশু মৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর হারও নথিভুক্ত হয়েছে।

- **লিঙ্গ সমস্যা :** প্রাকৃতিক পরিবেশের অবক্ষয় বিশেষ করে বন ধ্বংস এবং দ্রুত সংকুচিত সম্পদের ভিত্তি নারীর মর্যাদার উপর প্রভাব ফেলেছে। খনন শিল্প এবং বাণিজ্য, বাণিজ্যিকীকরণের জন্য উপজাতীয় অঞ্চল গুলিকে উন্মুক্ত করা, উপজাতীয় পুরুষ ও মহিলাদেরকে বাজার অর্থনীতির নির্মম ক্রিয়াকলাপ এর কাছে উন্মোচিত করা যা ভোগবাদের জন্ম দিয়েছে এবং মহিলাদের পন্যে পরিণত করেছে।
- **অ-উপজাতি জনসংখ্যার সাথে আত্তীকরণের সমস্যা :** আদিবাসীরা মূলত ভারতের প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক ধারার প্রভাবে এসেছে। পদে পদে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কারণে আদিবাসীদের মধ্যে নতুন বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতে উপজাতীয় সমাজের স্তরবিন্যাসের মূলে রয়েছে ব্রিটিশ নীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবের কারণে অসমতা এবং বৃহত্তর সমাজের সাথে বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। আধুনিকীকরণ ও শিল্পায়ন আপাত দৃষ্টিতে উপজাতি ও অ-উপজাতিদের মধ্যে ব্যবধান কমিয়েছে কিন্তু নতুন সমস্যাও তৈরি হয়েছে। ঐতিহ্যগত সমর্থনের ভিত্তি ছাড়াই তারা একটি নতুন ধরণের দারিদ্র্যের সম্মুখীন হচ্ছে।
- **পরিচয়ের অবক্ষয় :** ক্রমবর্ধমান ভাবে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান এবং আইন আধুনিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে যা তাদের পরিচয় সংরক্ষণের বিষয়ে আদিবাসীদের মধ্যে একটি শঙ্কা তৈরি করে। উপজাতিদের উপভাষা এবং ভাষার বিলুপ্তি উদ্বেগের আরেকটি কারণ। এটি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় উপজাতির পরিচয়ের ক্রমিক অবক্ষয়কে নির্দেশ করে।
- **মাদকাসক্তি :** মাদক গ্রহণ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের একটি অংশ। জাতীয় পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় যে প্রায় অর্ধেক তপশিলি উপজাতির পুরুষ

(৫১%) কোন না কোন ধরনের অ্যালকোহল পান করেন। অ্যালকোহল সেবনের প্রবণতা অ-তপশিলি জাতির পুরুষদের (৩০%) মধ্যে অনেক কম পাওয়া গেছে। অতএব তপশিলি উপজাতির পুরুষদের মধ্যে অ্যালকোহল পান করার এই ধরণের প্রবণতার উপর জনগণের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। আসাম (৭০%), পশ্চিমবঙ্গ (৭০%), উড়িষ্যা (৬৯%), এবং ঝাড়খণ্ডের (৬৭%) মতো পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে অ্যালকোহল গ্রহণের প্রবণতা বেশি পাওয়া যায়। সিকিম, মনিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এবং গোয়ার মত কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে শহরে তপশিলি উপজাতিদের পুরুষদের একটি উচ্চতর অনুপাত তাদের গ্রামীণ প্রতিপক্ষের তুলনায় কম মদ পান করে।

- **দারিদ্র্য ও শোষণ :** দারিদ্র্য বলতে বিশুদ্ধ পানীয় জল, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা,বস্ত্র এবং আশ্রয়ের মতো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের উপায় না থাকা শর্তকে বোঝায়। একে চরম দারিদ্র্যও বলা হয়। আপেক্ষিক দারিদ্র্য হল একটি সমাজ বা দেশের মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় কম সম্পদ বা কম আয় থাকার শর্ত বা বিশ্বব্যাপী গড়ের তুলনায় কম আয় থাকা।

সাধারণত গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য সীমার (BPL) সুযোগের নিচের অবস্থাকে পরিমাপ করা হয়। দারিদ্র্য সীমার নিচে বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক মানদন্ড এবং দারিদ্র্যের সীমারেখা। ভারত সরকার অর্থনৈতিক অসুবিধা নির্দেশ করতে এবং সরকারি সাহায্য ও সাহায্যের প্রয়োজন এমন ব্যক্তি ও তার পরিবারকে চিহ্নিত করতে BPL শব্দটি ব্যবহার করেন। এটি বিভিন্ন মানদণ্ড এবং পদ্ধতিকে ব্যবহার করে নির্ধারিত হয় যা রাজ্য থেকে রাজ্যে এবং রাজ্যগুলির মধ্যে পরিবর্তিত হয়।

- **স্থান চ্যুতি এবং পুনর্বাসন :** স্বাধীনতার পর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফোকাস ছিল ভারী শিল্প এবং মূল খাত। ফলস্বরূপ বিশাল ইস্পাত প্ল্যান্ট, বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং বড় বাঁধ তৈরি হয়েছিল যার অধিকাংশই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়। এসব এলাকায় খনির কার্যক্রম ও ত্বরান্বিত হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির জন্য সরকার কর্তৃক আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণের ফলে উপজাতীয় জনগণকে ব্যাপকভাবে বাস্তুচ্যুত হতে হয়। এর ফলে ছোটনাগপুর অঞ্চল, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নগদ ক্ষতিপূরণও অযথা ব্যয়ের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। শিল্প এলাকায় এর মধ্যে বাস্তুচ্যুত আদিবাসীদের জন্য কোন বসতি দেওয়া হয়নি, ফলে তারা দারিদ্র্যের পরিস্থিতিতে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য বস্তিতে বা পার্শ্ববর্তী রাজ্যে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিল। শহুরে অঞ্চলে এই আদিবাসীদের স্থানান্তর তাদের জন্য মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করে কারণ তারা শহুরে জীবনধারা এবং মূল্যবোধের সাথে মানিয়ে নিতে পারেনা।
- **সরকারী সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে অবগত না থাকা (Lack of awareness about government scheme):** ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তপশিলি উপজাতিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত উন্নতির জন্য বিশেষ সংবিধানিক অধিকার রয়েছে। সাম্প্রতিক আদিবাসী কল্যাণ প্রকল্প গুলি হল –

  ১. তপশিলি উপজাতি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রি-মেট্রিক এবং পোস্ট-মেট্রিক বৃত্তি।

  ২. আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য ছেলে ও মেয়েদের হোস্টেল।

  ৩. উচ্চশিক্ষায় উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য রাজীব গান্ধী জাতীয় ফেলোশিপ স্কিম।

  ৪. উপজাতীয় সাবপ্ল্যান এলাকায় বনবাসী আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন।

৫. উপজাতীয় এলাকায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

৬. আদিবাসী মহিলা স্বশক্তিকরণ যোজনা।

সার্ভে করে দেখা গেছে যে অধিকাংশ আদিবাসী মানুষ খুবই দরিদ্র, কিন্তু তারা বিপিএল রেশন কার্ড, ১০০ দিনের কাজের জন্য জব কার্ড ইত্যাদি সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের অধিকাংশ বিপিএল রেশন কার্ডের নাম জানেনা। ফলে তারা এ ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে নিরক্ষরতা এবং সচেতনতার অভাবের কারণে। অনেক পরিবার তাদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সহায়তা সম্পর্কে অন্ধকারে থাকে। সরকারি কর্মকর্তা ও সহযোগী কর্মচারীরা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। ৭০% এরও বেশি আদিবাসী পরিবারের কোন ব্যাংকিং সুবিধা নেই অথবা কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই।

- **Subsistence Economy:** উপজাতি অর্থনীতিতে জীবিকা নির্ভর হিসেবে কিছু উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়। আদিবাসী অর্থনীতির জনপ্রিয় রূপগুলি হলো শিকার করা, মাছধরা বা শিকারের সংমিশন এবং স্থানান্তরিত চাষ। তথাকথিত লাঙ্গল ব্যবহার করে উপজাতিরা কৃষিকাজ করে থাকে। যেখানে সুযোগ পাওয়া যায় শিকার এবং খাদ্যসংগ্রহের মাধ্যমে কিছুটা আর্থিক সমস্যার সমাধান করে।

এদের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য গুলি হল সরলপ্রযুক্তি, শ্রমের সরল বিভাজন, উৎপাদনে ছোট বড় একক। এরা কোন ধরনের পুঁজির বিনিয়োগ করতে অসমর্থ। একটি নির্বাহ অর্থনীতির প্রধান সমস্যা হল যে, সিস্টেমটি যদি ব্যর্থ হয় এবং এটি আর অর্থনীতির মধ্যে বিদ্যমান তাদের চাহিদা পূরণ করতে না পারে তাহলে অন্য জায়গা থেকে সংস্থান পাওয়া এদের পক্ষে কঠিন। একটি জীবিকা নির্বাহের অর্থনীতি সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তাদের চাহিদা মেটাতে যদি কোন ফসল ব্যর্থ হয় বা তাদের সম্পদ

কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাদের এমন কোন বিকল্প উপায় থাকে না যাতে তারা প্রত্যাহিক অন্তত অন্নের সংস্থান টুকু করতে পারে।

১.৩.৩ পরিবেশগত সমস্যা সমূহ (Environmental Problems):

- **মানুষ - পশু দ্বন্দ্ব :** বন্যপ্রাণীদের ঘন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো খুবই সাধারণ ছিল কিন্তু জঙ্গল পাতলা হওয়ার পর সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মানুষ প্রাণীর দ্বন্দ্ব তীব্রভাবে বেড়েছে। ভূমির ব্যবহার এবং রূপান্তর, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, বিভিন্ন প্রজাতির বাসস্থানের অবক্ষয় এবং খন্ডিত করণ, ইকো-ট্যুরিজম বৃদ্ধি, এবং সংরক্ষণ কৌশলের ফলে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, মানুষের জনসংখ্যার তুলনায় ভূমি ও জৈবিক সম্পদের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও সেই কারণে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এই ভূপ্রকৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রাস্তা প্রশস্ত করণ, ভারী যানবাহন সহ রেললাইনকে ব্রডগেজে রূপান্তর, বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে নদীর গতিপথকে প্রভাবিত করণ, ভুটানের পাহাড় থেকে বয়ে আসা প্রবাহিত নদীতে কনা যুক্ত ডলোমাইড ভুটানের পাহাড়ের পাদদেশে জমার ফলে বাসস্থানের বিভাজন, সামগ্রিক ভাবে আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করছে।
- **শারীরিক সীমাবদ্ধতা :** ঐতিহ্যগতভাবে আদিবাসীরা জঙ্গল ও পাহাড়ের দুর্গম স্থানে বসবাস করতে আগ্রহী। একটি সভ্য সমাজে পরিবহন এবং যোগাযোগের উপায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক চা বাগান এলাকায় প্রধানত বর্ষাকালে জলবায়ু স্বাস্থ্যকর হয় না। একটি পানীয় জলের পাত্র স্পর্শ করার জন্য রাজস্থানের জালুর জেলার একটি বেসরকারি

স্কুলের শিক্ষক মারধর করার ফলে ৮ বছর বয়সী দলিত শিশুটি মারা যায়। পুলিশের মতে যে শিক্ষক শিশুটিকে মারধর করেছিলেন তাকে আটক করা হয়েছে হত্যা এবং তপশিলি জাতি ও তফশিলী উপজাতি আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষক সমাজের মনোভাবে কোন পরিবর্তন আনা যায়নি বা পরিবর্তন আনার জন্য কোন চেষ্টাও সরকারী ভাবে করা হয়নি। কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন করে বা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ যে যথেষ্ট নয় তা বারবার প্রমানিত।

- **তপশিলি উপজাতির উন্নয়ন :** ভারতীয় সংবিধানে নির্দিষ্ট ভাবে তপশিলি উপজাতির সংজ্ঞা দেওয়া নেই। সংবিধানের ৩৬৬(২৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সেই সব সম্প্রদায়ই তপশিলি উপজাতি ভুক্ত যাদের ৩৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তপশিলিভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাষ্ট্রপতি যে সব গোষ্ঠীকে উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করেছেন তারাই তপশিলি উপজাতি। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, দেশের মোট আদিবাসী জনসংখ্যা হল ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬০ হাজার অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৮.০৮ শতাংশ। আদিবাসীরা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা পাহাড় ও জঙ্গল এলাকাতেই মূলত বসবাস করে।
- **তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীগুলির বিশেষত্ব হল –**
  - আদিম জীবনধারা,
  - ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা,
  - আলাদা সংস্কৃতি,
  - বাইরের গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগে সঙ্কোচ,
  - অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা।

১৯৯১-এর জনগণনা অনুযায়ী, তপশিলি উপজাতিভুক্তদের ৪২.০২ শতাংশ কাজ করে। তার মধ্যে ৫৪.৫০ শতাংশ চাষি, ৩২.৬৯ শতাংশ খেত মজুর। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের যারা কাজ করে তাদের মধ্যে ৮৭ শতাংশ মানুষই প্রাথমিক ধরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত। তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে সাক্ষতার হার ২৯.৬০ শতাংশ, যেখানে দেশের মোট সাক্ষরতার হার ৫২ শতাংশ। তপশিলি উপজাতিভুক্ত মহিলাদের এক তৃতীয়াংশই নিরক্ষর। প্রথাগত শিক্ষায় পড়া স্কুল-ছুটদের অত্যধিক হার এই বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে। যে কারণে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এদের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ফলে তপশিলি উপজাতিভুক্তদের দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকার হার জাতীয় হারের চেয়ে যথেষ্ট বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য যোজনা কমিশন যে হিসাব করেছিল, সেই হিসাব অনুযায়ী তপশিলি উপজাতিদের গ্রামীণ জনসংখ্যার ৫১.৯২ শতাংশ এবং শহুরে জনসংখ্যার ৪১.৪ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে।

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেশের ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ১০ হাজার অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৮.১৪ শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। তারা দেশের ১৫ শতাংশ ভূখণ্ড জুড়ে থাকে। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক সূচক ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কেন তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রসূতিমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, মালিকানাধীন কৃষি জমির পরিমাণ ও ব্যবহার, পানীয় জলের সুবিধা, বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা, সব দিক দিয়েই আদিবাসীরা সাধারণ নাগরিকদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৫২ শতাংশই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে।

শুধু তা-ই নয়, সবচেয়ে দুঃখজনক হল ৫৪ শতংশ আদিবাসী অর্থনৈতিক সম্পদ (যেমন পরিবহণ ব্যবস্থা বা যোগাযোগের সুবিধা) ব্যবহারের সুবিধা লাভ থেকে বঞ্চিত।

আদিবাসীদের শোষণ এবং সামাজিক বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং তাদের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন করতে ভারতীয় সংবিধান কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এ জন্য বিশেষ কৌশলেরও আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়াতেই নেওয়া এই বিশেষ কৌশলের নাম 'ট্রাইবাল সাব-প্ল্যান' (টিএসপি)। এই কৌশলের লক্ষ্য রাজ্য সরকারের নেওয়া আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে অর্থ জোগানো, কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক, আর্থিক ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেওয়া। এই কৌশলের মূল বনিয়াদ হল বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে ট্রাইবাল সাব-প্ল্যানের অর্থ বরাদ্দ সুনিশ্চিত করা। উপজাতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রাইবাল সাব প্ল্যান-প্রণয়ন ও রূপায়ণ করার জন্য বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রের নানা মন্ত্রক ও দফতর যে সব উদ্যোগ নিচ্ছে, তা ছাড়াও তফশিলি উপজাতিদের স্বার্থে উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক বেশ কয়েকটি প্রকল্প ও কর্মসূচি রূপায়ণ করেছে।

- **তপশিলি উপজাতি কারা :**

'তফশিলি উপজাতি' শব্দবন্ধটি প্রথম দেখা যায় ভারতীয় সংবিধানে। সংবিধানের ৩৬৬(২৫) অনুচ্ছেদে এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে — "সেই আদিবাসী বা আদিবাসী গোষ্ঠী

অথবা তার ভিতরের অংশ বা গ্রুপ, এই সংবিধানের প্রয়োজনে সংবিধানের ৩৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যাদের সূচিত করা হয়েছে"।

তপশিলি উপজাতি সূচিত করা সম্পর্কিত ৩৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ নীচে দেওয়া হল—

- **৩৪২ নং অনুচ্ছেদ :**

রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করে (রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করে) রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যে সব আদিবাসী গোষ্ঠী অথবা গোষ্ঠীর অংশ বা গ্রুপকে নির্দিষ্ট করে দেবেন, তারা এই সংবিধানের স্বার্থে সেই রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সাপেক্ষে তপশিলি উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত হবে।

সংসদ আইনের মাধ্যমে ধারা-১ (ক্লজ-ওয়ান) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারি করে কোনও আদিবাসী গোষ্ঠী অথবা তার অংশ বা গ্রুপকে নতুন করে তালিকাভুক্ত করতে পারে বা তালিকা-বর্হিভূত করতে পারে। এই বিজ্ঞপ্তি কিন্তু পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করে বাতিল করা যায় না।

সুতরাং রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সাপেক্ষে তপশিলি উপজাতি ঘোষিত হওয়ার প্রথম বিশেষত্ব হল রাষ্ট্রপতিকে রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। এই আদেশ বদলানো যায় কেবলমাত্র সংসদে আইন প্রনয়ণ করে। সংবিধানের উল্লিখিত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তালিকা কেবলমাত্র রাজ্যভিত্তিক, সর্ব ভারতীয়ভিত্তিক নয়।

একটি আদিবাসী সম্প্রদায় তপশিলি উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত হবে কি না, তা বিবেচনার সুচক হল অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে মেশার ব্যাপারে দোলাচল, আদিম জীবনধারা, নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। এই মাপকাঠি সংবিধানে

বলা নেই, কিন্তু এটাই প্রচলিত পদ্ধতি। **১৯৩১** সালের জনগণনা রিপোর্ট, **১৯৫৫** সালের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন রিপোর্ট, কার্লেকর উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্ট, **১৯৬৫** সালের এসসি/এসটি তালিকা সংশোধন সম্পর্কিত লকুর কমিটির রিপোর্ট এবং জয়েন্ট কমিটি অফ পার্লামেন্ট অন দ্য শিডিউলড কাস্টস অ্যান্ড শিডিউলড ট্রাইবস অর্ডার্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল **১৯৬৭**-তে তপশিলি উপজাতির যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাতেই এই বিষয়গুলি উল্লিখিত।

১.৪ তপশিলি উপজাতিদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র:

সাঁওতালরা পূর্ব ভারতের একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী। সাঁওতালরা জনসংখ্যার দিকথেকে ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের বৃহত্তম উপজাতি এবং তাদের উপস্থিতি আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গরাজ্যেও রয়েছে। তারা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগ ও রংপুর বিভাগের বৃহত্তম জাতিগত সংখ্যালঘু। নেপাল ও ভুটানে তাদের উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা রয়েছে। সাঁওতালরা সাঁওতালিভাষায় কথাবলে, এটি অস্ট্রো-এশীয় পরিবারের তৃতীয় বৃহত্তম ভাষা।

- **গোত্র :** সাঁওতালরা বিশ্বাস করে যে, আদি মানব ও মানবী পিলচু হাড়াম (আদম) ও পিলচু বুডহির (হবা) সাতটি সন্তান থেকেই তাদের উদ্ভব। এজন্যই সাঁওতালরা সাতটি গোত্রে বিভক্ত। সাঁওতালি ভাষায় এ গোত্র গুলি ‘পারিস‘ নামে অভিহিত । গোত্র (পারিস) গুলি হল-

  ১. হাঁসদা

  ২. সরেন

৩. টুডু

৪. কিসকু

৫. মুর্মু

৬. মাণ্ডি

৭. বাস্কে

৮. বেসরা

৯. হেম্বরম/হেমব্রম

১০. পাউরিয়া

১১. চঁড়ে

১২. বেদেয়া

প্রথমে সাতটি গোত্র ও পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে আরও পাঁচটি গোত্রের উদ্ভব ঘটে মোট বারটি গোত্র হয়। সাঁওতালদের মধ্যে টোটেম বিশ্বাস প্রচলিত আছে। প্রতিটি গোত্র তাদের পূর্বপুরুষ, কিংবা গাছপালা, জীবজন্তু ও পশুপাখী ইত্যাদি নামে পরিচিত। হাঁসদা গোত্রের লোকের বিশ্বাস তাদের উদ্ভব ঘটেছে হাঁস থেকে। তাই হাঁসদা গোত্রের সাঁওতালদের হাঁস খাওয়া নিষিদ্ধ। আবার সরেন গোত্রের উৎপত্তি হরিণ থেকে তাই তাদের হরিণের মাংস খাওয়া নিষেধ।

- **ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় :** ভাষা এবং নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে সাঁওতালরা বাংলাদেশের অন্য অনেক নৃগোষ্ঠীর মত মঙ্গোলীয় গোত্রের নয়। এরা সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে,যে ভাষাটি অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এদের মধ্যম গড়নের আকৃতির শরীর, ত্বকের গাঢ় কালো রঙ, চ্যাপ্টানাক, পুরুঠোঁট এবং কোঁকড়ানো চুল তাদের অস্ট্রেএশীয় নৃতাত্ত্বিক উৎস নির্দেশ করে যে গোষ্ঠির মানুষ ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল দ্রাবিড়দেরও আগে অস্ট্রেলিয়া এবং সন্নিহিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালা থেকে। দেহ কাঠামোর

বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে সাঁওতালদেরকে বিশুদ্ধ প্রাক-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়। তবে অস্ট্রেলীয় কৌমগুলোর সাথে সাঁওতালদের বেশ মিল লক্ষ্য করা যায় বলে তাদেরকে আদি অস্ট্রেলীয় বলা হয়। ধারণা করা হয় সুঁতার (Soontar) কথাটি থেকে সাঁওতাল শব্দের উদ্ভব হয়েছে।

- **তপশিলি উপজাতি উদ্ভবের ইতিহাস :** পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় বাহুবল, বুদ্ধিবল বা অর্থ বলে বলিয়ান হয়ে সমাজের এক শক্তিমান অংশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশকে বলপ্রয়োগ করে পরাজিত করেছে। বিজিত কে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে বিজেতার সেবা করতে হয়েছে। যারা বিজিত তারা বিজেতার সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। পরাজিতের মধ্যে যে অংশ জুলুম মেনে নিতে পারেনি তারা দুর্গম বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ি এলাকায় অপেক্ষাকৃত অনুর্বর স্থানে বিজেতার আওতা থেকে দূরে স্বাধীন ভাবে বসবাস করে ভাষা এবং সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছে। নিজেদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি পরিবর্তন করেও যে সমস্ত মানব গোষ্ঠী সমাজের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন তারাই উপজাতি বা TRIBAL নামে পরিচিত। এই TRIBE গুলির কোন কোনটির সদস্য সংখ্যা খুবই কম। যেমন-পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলে বসবাসকারী বীরহড় সম্প্রদায়। প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব উপভাষা, সামাজিক আচার আচরণ, টোটেম-ট্যাবু বর্তমান। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকলেই নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে গর্ববোধ করেন ও নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। সাধারণভাবে সমাজের অগ্রসর অংশের মানুষদের থেকে তারা দূরে থাকতে চান। ভারতীয় সংবিধানে এদের নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত এবং তপশিল ভুক্ত করা হয়েছে তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) হিসাবে। তপশিলি উপজাতি বা আদিবাসী লোকেরা সাধারণত জঙ্গল ও পাহাড়ি

এলাকায় বসবাস করে। কিছু তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতবর্ষের সর্বত্র অন্যান্য অংশের মধ্যে বসবাস করে। আসাম সহ উত্তর পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের জেলাগুলি, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, এবং উড়িষ্যায় তপশিলি উপজাতি মানুষেরা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। এদের জন্য তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা।

২. জঙ্গল রক্ষা করে কৃষির উন্নতি সাধন, স্থায়ীভাবে চাষের ব্যবস্থা করা।

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা। সেই সঙ্গে সেই জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চাহিদা অনুসারে শিক্ষাকে সংগঠিত করা।

১.৫ সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী সমাজ শাসন ব্যবস্থার গঠন:

ভারতের অন্যতম একটি প্রধান আদিম জনজাতি গোষ্ঠী হলেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তাঁরা নিজেদেরকে হড়হপন, হড় বা সান্তাড় বলেও অভিহিত করে থাকেন। এই সান্তাড় বা সাঁওতালরা ভারতের অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মত একটি জাতি যে জাতি নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করেন। সাঁওতালদের পুরাণ বা ধর্মগ্রন্থ ‘জমসিম বিন্তি’ (যা হলো সারিধরম এর ধর্মগ্রন্থ) থেকে জানা যায় সেরমাপুরী বা স্বর্গে চাঁওরিয়া মেলা নামে জৈব বিচারালয়ে শাসনকার্য ও বিচারকার্য পরিচালনা ও সম্পাদন করতেন, যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংস করেন। সাঁওতালদের কাছে তিনি ঠাকুর জিউ নামে পরিচিত। তাঁর আদেশ মত বিচার সভার আয়োজন এবং সকল দেবতাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল মারাংবুরুর ওপর, যার পূর্ব নাম হল

লিটা এবং বার্তাবাহকের জন্য তিনি গোডেৎ উপাধি পেয়েছিলেন। তাই তিনি লিটাগোডেৎ নামে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পরিচিত। সাঁওতালি ভাষায় গোডেৎ বা গডেৎ কথাটির অর্থ হলো বার্তাবাহক। সাঁওতালদের এই পৌরাণিক স্বর্গীয় চাঁওরিয়া মেলার প্রতিরূপ প্রতিটি সাঁওতাল গ্রামে দেখা যায়। প্রতিটি গ্রামে একটি করে মাঝি থান এবং একজন করে মাঝি বা গ্রাম প্রধান থাকেন এবং তাঁরাই মূলত শাসন কার্য ও বিচার কার্য পরিচালনা করে থাকেন যিনি ঠাকুর জিউ এর প্রতিরূপ, সাথে একজন গোডেৎ থাকেন যা মানব সমাজে স্বর্গীয় লিটাগডেৎ এর প্রতিরূপ।

আদিকাল থেকে এখনো পর্যন্ত সাঁওতাল সমাজব্যবস্থায় মড়েহড় পঞ্চজন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। গ্রামে যে পাঁচজন মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হলেন মাঝি (গ্রাম প্রধান) পারামানিক (সহকারী গ্রাম প্রধান), জগ মাঝি (নৈতিক অভিভাবক), জগ পারানিক (সহকারী অভিভাবক) এবং গডেৎ (বার্তাবাহক) । এছাড়াও নাইকে (সাঁওতালি) এবং কুটোম নাইকে (সহকারি সাঁওতালি পুরোহিত) নামে দুজন পঞ্চজন ব্যবস্থার অন্তর্গত থাকেন, যারা গ্রামের সকলের পক্ষ থেকে দেব-দেবীদের পূজা দিয়ে থাকেন।

- **মাঝি:** - মাঝির দায়িত্বে যিনি থাকেন তিনি তাঁর গ্রামের সর্বসাধারণের পিতা স্বরূপ সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত থাকেন। গ্রামের সকল কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর ওপরেই থাকে। এই মাঝি পদটি পুরা কালে দৈবনির্বাচিত পদ হিসাবে থাকলেও বর্তমানে তা সর্বসাধারণের দ্বারা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হয়ে থাকে। যিনি মাঝি পদে নির্বাচিত হয়ে গ্রামের জন সাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন করতে ব্যর্থ হন তাকে গণতান্ত্রিক উপায়েই ওই পদ থেকে পদচ্যুত করা হয়। তার কাজই হল তিনি

সর্বদাই জনকল্যাণকামী ও গ্রামের সবাইকে সন্তান স্বরূপ দেখবেন এবং সবকাজে তাদের সহযোগিতা করবেন।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ ও আদেশ অনুসারে ধর্মীয় পূজা অর্চনা অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ ও আদেশ অনুসারে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুতে শ্রাদ্ধের কাজ পরিচালিত ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিচার সভায় তিনি মড়েহড় (পঞ্চজন ব্যবস্থা) ব্যবস্থার রূপায়ন করেন এবং বিচারের ক্ষেত্রে গ্রাম বা সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করেন পঞ্চজন ব্যবস্থার দ্বারা।

- **পারানিক:** - মাঝি এর সহকারী হিসেবে পারানিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কোন কারণে মাঝি অনুপস্থিত থাকলে তিনি মাঝির দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত কাজ সম্পাদন করেন। এছাড়াও মাঝির পদচ্যুতি, পদত্যাগ বা মৃত্যু হলে যদি তার মাঝি হওয়ার যোগ্য কোন পুত্র না থাকে তাহলে পারানিকই মাঝি পদে নিযুক্ত হন। তবে এই পদটিও গনতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন করা হয় এবং পদচ্যুতিও করা হয়।
- **জগ-মাঝি:** - গ্রামের নৈতিক অভিভাবকের দায়িত্ব ইনি পালন করে থাকেন। ইনি গ্রামের যুবক যুবতীদের নৈতিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং তাদের আচার-আচরণের নৈতিক মূল্যায়নও করে থাকেন। গ্রামের যুবক যুবতীদের দ্বারা কোন ধরনের যাতে অনৈতিক এবং অসামাজিক ঘটনা না ঘটে অর্থাৎ যুবক যুবতীদের আচার-আচরণের নৈতিকতা দেখার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। গ্রামে যাতে বাইরে থেকে অসামাজিক বা অনৈতিক কিছু না প্রবেশ করে তা দেখার দায়িত্বও তাঁর উপরই ন্যস্ত থাকে। এই পদটিরও গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন, পদচ্যুতি এবং পদত্যাগ রয়েছে।

- **নায়কে:** - ইনি হলেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত। ইনি গ্রামের পক্ষ থেকে সারা বছর ধরে ধর্মীয় পূজায় দেবদেবীদের পূজো দিয়ে থাকেন। ইনি প্রধানত সাঁওতালদের জাতীয় এবং শুভাকাঙ্ক্ষী দেবদেবীদের পূজা দেবার জন্য নিযুক্ত হন। এই পদটি দৈবনির্বাচিত হওয়ার ফলে এটি বংশগতভাবে চলতে থাকে।
- **গডেত:** - ইনি হলেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আহ্বায়ক। সাঁওতাল সমাজে কোন রীতিনীতি অনুষ্ঠান, বা বিচার হলে ইনি গ্রামের সবাইকে আহ্বান করেন।

১.৬ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য :

যখন কোন দলবদ্ধ কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে বসবাস করে তখন তারা তৈরি করে একটি মানব গোষ্ঠী, আর এখানেই একটি সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। সংস্কৃতি বিভিন্ন স্তরের হতে পারে, যেমন- গ্রামীণ সংস্কৃতি, শহরের সংস্কৃতি, পারিবারিক সংস্কৃতি, জাতীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি। সমস্ত গোষ্ঠীতেই একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত এবং শিল্পগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। এমনকি তাদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস এবং অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়। এই সবকিছুর সম্মিলনে স্থিরীকৃত হয় একটি সমাজ কিভাবে চলবে। যেকোনো সংস্কৃতির কেন্দ্রে থাকে কতগুলি বৈশিষ্ট্য যেমন একটি সর্বজন ব্যবহারযোগ্য ভাষা, ইতিহাস, ধর্মীয় অনুশীলন ইত্যাদি। আদিবাসীদের সমাজ প্রাচীন যুগ থেকে মোটামুটি ভাবে অপরিবর্তিত। বিভিন্ন সময়ে বাইরের বিভিন্ন চাপের মুখে দাঁড়িয়েও আদিবাসী সমাজ এখনো তাদের প্রাচীণ ধ্যান ধারণা গুলিকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য সক্রিয় হয়েছেন। বাইরের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুশাসন, খাদ্যাভ্যাস, জীবন চর্চা, বাড়ি-ঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংগীত নৃত্য ইত্যাদি দ্বারা এখনো পর্যন্ত সামাজিকভাবে এঁরা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হননি।

স্বাধীনতা লাভের পর পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে গিয়ে কোন কোন আদিবাসী মানুষ নিজেকে কিছুটা পরিবর্তিত করলেও সামগ্রিকভাবে এখনো তাঁরা অপরিবর্তনীয়ই রয়ে গেছেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আদিবাসীরা জল, জঙ্গল, জমি, পাহাড় ইত্যাদির উপর আবহমান কাল ধরে নির্ভরশীল। তাদের এই নির্ভরশীলতা প্রকৃতির সঙ্গে তাদেরকে সহজীবি সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে। এখনো জমি চাষ, মাছ ধরা, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প ইত্যাদির উপর এরা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। জঙ্গল থেকে পরিবারের প্রয়োজনে জ্বালানি, শুকনো কাঠ, ঔষধি গাছ, ছাতু (মাশরুম), মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করলেও কোন ক্ষেত্রেই জঙ্গলকে এরা ক্ষতিগ্রস্ত করতে চান না। কারণ জঙ্গল, পাহাড়, ঝরণা, নদী এদের কাছে ঈশ্বরের থেকে পবিত্র দান হিসেবে স্বীকৃত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন কোন আদিবাসী পরিবার অর্থনৈতিকভাবে চিরাচরিত ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে গেলেও সামগ্রিকভাবে এখনো আদিবাসী সমাজ চিরাচরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরা তুলনামূলকভাবে উন্নত হলেও এখনো চূড়ান্ত দারিদ্র্যের শিকার। এরা যে সকল স্থানে বসবাস করেন সেখানে উন্নত পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ সংযোগ, চিকিৎসার সুযোগ, এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রায়শঃই পাওয়াই যায় না। এদের অধিকাংশ জনই আধুনিক প্রযুক্তি সমূহ যেমন দূরদর্শন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির ব্যবহার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এতদ্ সত্বেও এরা এখনো সঠিক ভাবেই এবং নিজেদের মতো করে নিজেদের জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যান। এদের জীবনের অন্যতম চালিকাশক্তি হল চিরাচরিত সংস্কৃতি ও প্রথা সমূহ। ধর্মীয় অনুশাসন, জীবনযাপনের নীতিসমূহ, এবং সর্বোপরি সততা,

এদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও ভাষা, অন্যান্য অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর থেকে অনেকাংশে পৃথক। পারস্পারিক যোগাযোগের জন্য এরা বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে থাকেন যেটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। তাদের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে কতখানি পরিবর্তন এসেছে তার বিচার বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এটিও সত্যি কথা যে একটি সমাজের সংস্কৃতির অনুশীলনকে গাণিতিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। আবার একইভাবে বাইরে থেকে কোন্ কোন্ ধরনের সংস্কৃতি আদিবাসী সমাজের চিরাচরিত সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে তা বাইরে থেকে বলা সহজ নয়। একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতিকে জানতে গেলে সেই সংস্কৃতির একজন হয়ে উঠতে হবে। তাই বর্তমান গবেষিকা সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষা কে অনুধাবন করবার প্রচেষ্টা করেছেন ওই সমাজের একজন সদস্যা হিসেবে।

বর্তমান গবেষিকা লক্ষ্য করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগতভাবে শোষিত হয়ে চলেছেন ব্রিটিশ আমল থেকেই এবং এখনো তারা শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি বিষয়ে সামাজিক শোষণের শিকার। এর ফলে মূল স্রোতের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে তাঁরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন অথবা বৃহত্তর সমাজ তাদেরকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছেন। বিভিন্ন গবেষণায় এটিও ধরা পড়ে যে ধীরে ধীরে সাঁওতাল সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে (Chakraborty, Ghosh, Bhattacharya, & Panda, 2019)।

বর্তমান গবেষিকা নিম্নলিখিত গবেষকদের কাজগুলিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। যেমন- মজুমদার এবং চ্যাটার্জী (২০২১) পূর্ব ভারতের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক

দিকগুলিকে পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন। লক্ষ্য করেছেন যে সাঁওতালরা এখনো বিভিন্ন লোকগান, লোকমডেলের মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে থাকেন। তাদের এই শিক্ষার বৌদ্ধিক উপাদান গুলি হল সম্পদের সুষম বন্টন, পারস্পরিক পরিচর্যা, পরিবেশের প্রতি ইতিবাচক অনুভূতি, পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ, লোককথা এবং পরিবেশের প্রতি কিছু কিছু সংস্কার। গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন যে, আদিবাসীরা যেভাবে চিরাচরিত পদ্ধতিতে পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন তাতে করে তাঁদের পক্ষে সম্পদকে ব্যবহার করেও সম্পদকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব। তাই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে জল জমি এবং জঙ্গলের বহুল ব্যবহারের পরও পরিবেশ ধ্বংস হয়নি।

১.৭ গবেষণার প্রশ্ন :

১. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান কি?

২. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থান কি?

৩. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা কি?

১.৮ গবেষণার উদ্দেশ্য :

১. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থাকে তুলে ধরা।

২. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাকে তুলে ধরা।

৩. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা।

১.৯ সমস্যার বিবৃতি :

বর্তমান এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে Ethnography পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যাকে জানা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করা। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে মানুষের মধ্যে যান্ত্রিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চিরাচরিত রীতিনীতি ও প্রথাগুলির গুরুত্ব হারাচ্ছে। এর ফলে যে কোন সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আদিবাসী সমাজ বিশেষত সাঁওতাল সমাজেও এর ব্যতিক্রম পাওয়া যায় না। একদিকে সাঁওতাল সমাজের চিরাচরিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি, প্রথার প্রতি সাঁওতাল সমাজের আঁকড়ে থাকার প্রবণতা এবং অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বায়নের ও পাশ্চাত্যকরণের ঢেউয়ে সাঁওতাল যুবক যুবতীদের গা ভাসিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এই দুইয়ের মধ্যে সাঁওতাল সমাজের বর্তমান অবস্থাটিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

তাই বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যাটি হল- পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করা।

১.১০ গবেষণার সুযোগ :

ভারতের দেশীয় বা আদিম অধিবাসীদের মধ্যে মুন্ডারী গোষ্ঠীর সাঁওতাল উপজাতি একটি আদিবাসী শ্রেণী। সাঁওতালদের উপর যে গবেষণা গুলি হয়েছে তার প্রায় সমস্ত নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে হয়েছে এবং বহুলাংশে সাঁওতালি ভাষাকে কেন্দ্র করে। পূর্বে হওয়া অধিকাংশ গবেষণায় গবেষকরা বাইরে থেকে সাঁওতালদের সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষাগত অবস্থা সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে বিবেচনা করার চেষ্টা করেছেন। খুব কম গবেষণাতেই সাঁওতালদের চিরাচরিত সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে চিরাচরিত জ্ঞানভিত্তিক গবেষণা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মূল স্রোতের ব্যক্তিদের পক্ষে সাঁওতাল জনজাতির মধ্যে প্রবেশ করে তাদের অবস্থানে তাদের মতো করে তাদেরকে জেনে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। বর্তমান গবেষিকা নিজে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর একজন সদস্যা হওয়ার কারণে এবং সাঁওতাল গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে তাঁদের সমস্যাগুলিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং পূর্বের গবেষণাগুলিতে সাঁওতালি সংস্কৃতি, ভাষা, চিরাচরিত নিয়ম-নীতি, প্রথা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মাচরণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষাগত সমস্যা নিয়ে যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা থাকার সম্ভাবনা ছিল সেই অভাবগুলি পূরণের জন্য বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা চেষ্টা করেছেন। তিনি সামগ্রিক কোন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেননি, বরঞ্চ অনুপুঙ্খ এবং জীবন্ত অভিজ্ঞতা গুলিকে তৃণমূল স্তর থেকে তুলে ধরার

চেষ্টা করেছেন, যেখানে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর উঠে এসেছে। তাঁদের ভাবনা এবং মূল্যবোধ বর্তমান গবেষণায় স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১.১১ গবেষণার সীমা নির্দেশকরণ :

বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যাটি হল – "পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা"। একজন গবেষিকার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সমস্ত সাঁওতাল সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানত ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মালদহ সহ উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি এলাকায় বহু সংখ্যক সাঁওতাল বসবাস করেন। তাই সমস্ত এলাকার সাঁওতালদের নিয়ে গবেষণা করা একক কোন গবেষণায় সম্ভব নয়। তাই এ সমস্যাটিকে নিয়ে গবেষণা করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে এর সীমারেখা নির্দেশ করণ প্রয়োজন বলে গবেষিকা মনে করেছেন। এই গবেষণার সীমায়িতকরণের ক্ষেত্রগুলি হল-

১. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম কেবলমাত্র এই দুটি সাঁওতাল অধ্যুষিত জেলাকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২. সাঁওতাল সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে কেবলমাত্র তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির উপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. তথ্য সংগ্রহের জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি ব্লকের একটি করে সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রূপ মোট কুড়িটি গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. তথ্য সংগ্রহের জন্য সেমি- স্ট্রাকচারড সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, Participatory Rural Appraisal (PRA) Focus Group Discussion (FGD) পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র (Reference):

Sen, Amartya (2020, Feb). Forward. *Living World of the Adivasi of West Bengal.* Asiatic Society and Pratichi Institute.

বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুশ্রী। ভারতবর্ষের আত্ম পরিচয় (পূর্ব) । *ভারত চিন্তাঃ ভারতের স্বরূপ সন্ধান।* পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান (২০১২) । *প্রসঙ্গ আদিবাসী।* Concept Publishing Company Private Limited, New Delhi.

Chakraborty, S. P., Ghosh, J., Bhattacharya., & Panda, S. (2019). Unveiling the Socio-Economic Condition of Tribal Peoples in West Bengal. *International Journal of Operation Research, Technology and Engineering,* 8(4), 12317-12326.

Majumder, K., & Chatterjee, D. (2021). The Cultural Dimension of Environment: Ethnoscientific Study on Santhal Community in Eastern India. *International Journal of Antropology and Ethnology,* 5(16), 1-21.

Mudi, N. C. (2018). Transformation of Socio-Economic Condition of Tribal Community in Frontier Bengal: Identity Crisis and Present Scenario. *Journal of Engineering Technology and Innovative Research,* 5(10), 667-673.

Das, T. (2019). Economic Condition of Santhal Tribe in Lakhimpur District: A Sociological Study. *EPRA International Journal of Research and Development,* 4(10), 123-125.

Das, P. (2020). Educational Status and Drop-Out Rate of Scheduled Tribe in West Bengal: A Study on Birbhum District. *AEGAEUM JOURNAL,* 8(8), 485-495.

Patra, S., & Panigrahi, N. (2018). Educational Status of the Marginalized: A Study among the Santal of Paschim Medinipur District West Bengal. *Journal of Social Science,* 57(1-3), 1-7.

Ghosh, P. (2015). Impact of Globalization on Tribal World of West Benga. *Arts and Social-Science Journal*, 6(2), 1-5.

Saha, R. (2021). Socio-Economic Condition of Tribal People: A Study on Uttar Dinajpur District of West Bengal. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 9(12), 659-661.

Pushpalatha. (2010). The Influence of Globalization Over Tribal Culture, Education and Health in Jharkhand. *The International Journal of Indian Psychology,* 7(3), 776-787.

দ্বিতীয়-অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা

২.১ সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার উদ্দেশ্য

২.২ প্রাক-স্বাধীনতা কালে সাঁওতাল সম্প্রদায় সম্পর্কে গবেষণা মূলক নিবন্ধ

২.৩ স্বাধীনতার পরবর্তী কালে গবেষণা সমূহের পর্যালোচনা

২.৪ গবেষণার খামতি/ শূন্যস্থান চিহ্নিতকরণ

তথ্যসূত্র

দ্বিতীয়-অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা

২.১। সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার উদ্দেশ্য:

- ❖ সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার ফলে গবেষিকা তার গবেষণা ক্ষেত্রে সীমা গুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ❖ সংশ্লিষ্ট গবেষণা সমূহের মাধ্যমে গবেষিকা গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হন।
- ❖ সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার দ্বারা গবেষিকা অপ্রয়োজনীয় সমস্যা গুলিকে চিহ্নিত করতে পারেন।
- ❖ সংশ্লিষ্ট গবেষণার মাধ্যমে গবেষিকা পূর্ববর্তী গবেষণার ইতিবাচক ফলগুলিকে নির্বাচন করবেন, যে ফলাফলগুলি গবেষিকাকে জ্ঞানের দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলবে, এর ফলে তাঁর গবেষণা আরো কার্যকরী হবে।
- ❖ সম্পর্কিত সাহিত্য সমূহের পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষিকা অনিচ্ছাকৃত দ্বিত্বকরণ গুলিকে অপসারণ করতে পারেন।
- ❖ এর দ্বারা যে সকল গবেষণালব্ধ ফলাফল সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে সেগুলিকে তিনি তার গবেষণার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন মাত্র।
- ❖ সংশ্লিষ্ট গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার দ্বারা পূর্ববর্তী গবেষকেরা কোন ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে কি কি বিষয়ে গবেষণা হওয়া জরুরী বলে মনে করেছেন সে সম্পর্কে গবেষিকা নির্দিষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন।

২.২। প্রাক স্বাধীনতা কালে সাঁওতাল সম্প্রদায় সম্পর্কে গবেষণা মূলক নিবন্ধ:

Dalton, Edward Tuite (1872) তাঁর "Descriptive Ethnology of Bengal" নামক প্রবন্ধে সাঁওতাল উপজাতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বাংলার গাঙ্গেয় সমভূমি থেকে বর্তমান উড়িষ্যার বৈতরণী নদী পর্যন্ত ৩৫০ মাইল এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সাঁওতালরা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করেছেন। এই বিস্তীর্ণ সমতল তটে সাঁওতাল সম্প্রদায় যে জেলাগুলিতে অধিক সংখ্যায় রয়েছেন সেগুলি হল- ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগনা, বীরভূম, বাঁকুড়া, মানভূম (বর্তমান পুরুলিয়া), হাজারীবাগ, মেদিনীপুর (অবিভক্ত), সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ এবং বালেশ্বর। সাঁওতাল পরগনা বা সানতালিয়া (Santalia) পূর্বে ছিল বিহার রাজ্যের মধ্যে, যা বর্তমানে ঝাড়খন্ড রাজ্যের অন্যতম অঞ্চল। মানভূম জেলাটিও পূর্বে বিহার, এবং পরে ঝাড়খণ্ডের অধীনে ছিল। কিন্তু মানভূম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পুরুলিয়া জেলা হিসেবে সংযুক্তি লাভ করেছে। ছোটনাগপুর মালভূমি রয়েছে বর্তমান ঝাড়খন্ডে, যেটি সাঁওতাল পরগনা নামে খ্যাত। যদিও ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসীর বাস তবুও সংখ্যায় সাঁওতালরা বেশি হওয়ার কারণে এই অঞ্চলকে সাঁওতাল পরগনা বলা হয়। Buchanan Hamilton ভাগলপুর জেলার পাহাড়ি আদিবাসীদের সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সেখানে সাঁওতালদের উল্লেখ নেই। হিমালয় পর্বতমালা থেকে শুরু করে গঙ্গা নদী বিধৌত সমতল ভূমিতে প্রাচীনকাল থেকে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কোন কলোনি তিনি দেখতে পাননি। সাঁওতালদের বর্তমান জীবনচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে ভারতের উত্তরাংশে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরঞ্চ দক্ষিণাংশে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় যেমন বীরহড়, মুন্ডা, ওঁরাও, কোড়া প্রভৃতি উপজাতির সঙ্গে ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা এবং

প্রথার নিরিখে অনেকটাই মিল রয়েছে। দামোদর নদীর উভয় তীর থেকে ছোটনাগপুর মালভূমি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষরা বসবাস করেন। দামোদর নদী পালামৌ পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে উচ্চগতিতে প্রবাহিত হওয়ার ফলে হাজারীবাগ ও ছোটনাগপুর অঞ্চলকে পৃথক করেছে এবং শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এসে হুগলি নদীর মোহনার একটু পূর্বে হুগলি নদীতে মিশেছে। দামোদর নদী এবং কংসাবতী নদীর মধ্যবর্তী স্থান ছোটনাগপুর মালভূমিকে সাঁওতাল পরগনা বলার কারণে সাঁওতালরা নিজেদের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আদিম অধিবাসী বলে স্বীকার করেন।

সাঁওতালরা বহু পূর্ব থেকে হাজারীবাগ জেলায় (বিহার) কেন্দ্রীভূত হলেও, বীরভূম জেলার (পশ্চিমবঙ্গ) প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে সাঁওতালরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়েছেন বলে ওই অঞ্চলকে সান্তালিয়া বলা হয়।

১৮৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার রাজমহল পাহাড়ের উচ্চভূমি গুলিতে থাকা মানুষদেরকে নিচে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেন। রাজমহল পাহাড়ের উপত্যকা থেকে নীচু ঢালের দিকে যে সমতল ভূমি তৈরি হয়েছে, তা সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপত্যকা নামে পরিচিতি লাভ করে। রাজমহল পাহাড়ের নিম্নভূমি তে বসবাসকারীদের উপর ভাগলপুর জেলার জমিদারদের অত্যাচার সুবিদিত। তাই জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে প্রায় ৩০০ মাইল পরিধি বিস্তৃত উচ্চভূমির উপত্যকা এমনকি পাহাড়ের শীর্ষ দেশ পর্যন্ত সাঁওতালরা নিজেদের বসবাসের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করে নেয়। একেবারে উচ্চভূমিতে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা থাকলেও তুলনামূলক নিম্নভূমি সাঁওতালরা দখল করে। এই অঞ্চলকে বলা হয়েছিল 'Daman-I-Koh' অথবা পর্বত শিরা। কয়েক বছরের

মধ্যে এই অঞ্চলে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। ১৮৩২ সালে মাত্র ৩ হাজার সাঁওতাল জনসংখ্যা, ১৮৫৪ সালে ৮৩ হাজার জনসংখ্যায় পরিণত হয়। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইংরেজ এবং তাদের পদলেহনকারী জমিদার শ্রেণী সাঁওতালদের উপর বিভিন্ন রকমের কর বা খাজনা আদায় করতে শুরু করে। সহজ সরল দরিদ্র সাঁওতাল পরিবারগুলি চাহিদা অনুযায়ী খাজনা দিতে না পারলে তাদের উপর শারীরিক অত্যাচার এবং মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার মতো ঘটনা প্রায় নিয়মিত ঘটতে থাকে। এছাড়াও ছলে-বলে-কৌশলে সাঁওতাল রমনীর হৃষ্টপুষ্ট শরীরকে ভোগ করতে শুরু করেন জমিদার শ্রেণী তথা ব্রিটিশ সরকারের অফিসাররা। স্বাভাবিকভাবেই সাঁওতালরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। Daman-I-Koh নিজেদের জন্য স্বশাষিত সরকার গঠন করেন। সাঁওতাল গ্রামপ্রধান বা মাঝিদের উপর নিজ নিজ গ্রামকে শাসন করা এবং সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব পড়ে। যা পূর্বেই বিহারের সিংভূম জেলার কোলহানদের মধ্যে শুরু হয়েছিল। এইভাবে সাঁওতাল পরগনায় সাঁওতালদের স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা খুব সহজে সম্ভব হয়নি। এর পিছনে ঘটেছে প্রচুর রক্তপাত, খুন, ধর্ষণ এবং অত্যাচার। এই সবকিছুকে এড়িয়ে সাঁওতালরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন সাঁওতাল পরগনায়।

আদিম উপজাতিদের মধ্যে বঙ্গদেশে সাঁওতালরা সবথেকে সম্মানের জায়গায় রয়েছেন। Mr. Mann সাঁওতালদের সমাজব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করে যে পুস্তিকা রচনা করে গেছেন, এবং Mr. Hunter সাঁওতাল আদিবাসীদের ধর্ম, প্রথা এবং ভাষা নিয়ে যে সকল প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন, তা থেকে এটুকু প্রতিষ্ঠিত যে, অনার্যদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায় বঙ্গদেশের সব থেকে বেশি সুপরিচিত আদিম উপজাতি।

সাঁওতালরা সান্তালিয়া (Santaliya) বা সাঁওতাল পরগনা থেকে অর্থাৎ হাজারীবাগ জেলার রাজমহল পাহাড় ছেড়ে নিচের দিকে ছড়িয়েছেন, এবং দামোদর ও গাঙ্গেয় সমতটে তাঁরা একত্রিত হয়েছেন কিন্তু এতদূর এগোনো সত্ত্বেও তাঁরা বেশিরভাগ রয়েছেন সাঁওতাল পরগনাতেই।

মেদিনীপুর জেলার শিলদা অঞ্চলে বসবাসকারী আদিম সাঁওতাল অধিবাসীদের 'Saont' বলা হত। সম্ভবত সেখান থেকেই সাঁওতাল নামটি এসেছে। বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক বাবু রাখালদাস হালদার (ছোটনাগপুর মালভূম অঞ্চলের প্রাক্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার) এর মতে যদিও মেদিনীপুর জেলার (বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলা) শিলদা অঞ্চলে জনসংখ্যার দিক থেকে সাঁওতালরা অধিক সংখ্যায় রয়েছেন, কিন্তু শিলদা অঞ্চল সাঁওতালদের প্রধান বাসভূমি নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে সামন্ত ভূমি। এবং এর সংশ্লিষ্ট ছাতনা অঞ্চলটি মানভূম জেলার অন্তর্গত। সুতরাং বাবু রাখালদাস হালদার নিশ্চিত করে বলতে পারেননি সান্তালিয়া নাম থেকে সাঁওতাল শব্দটি কিভাবে এসেছে, এবং সাঁওতালদের প্রকৃত আদিম বাসভূমি কোনটি। Bagh Rai এর মতে সাঁওতালরা মূলত বঙ্গদেশের পূর্বভাগে বঙ্গোপসাগর এবং গাঙ্গেয় তটভূমিতে বসবাসকারী আদিম অধিবাসী। যারা ক্রমশ মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চল, বীরভূম, পুরুলিয়া (পূর্বের মানভূম), ছাতনা হয়ে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সাঁওতালরা দামোদর নদীকে মনে করেন তাঁদের সমুদ্র। সাঁওতাল পরগনার মানুষজনের পক্ষে সমুদ্র পর্যন্ত আসা সেই যুগে সম্ভব ছিল না। হয়তো বা সমুদ্রের অবস্থান এবং সমুদ্র সম্পর্কে ধারণা ওই সময় সাঁওতাল পরগনার অধিবাসীদের কাছে খুব স্পষ্ট ও ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে দামোদর যেহেতু শেষ পর্যন্ত প্রথমে গঙ্গা এবং পরে সমুদ্রের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে, তাই এভাবেও ভাবা যেতে পারে যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিকট দামোদরই সমুদ্র। তবে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কোন মানুষের মৃত্যু ঘটলে তাকে পোড়ানোর পর তার অস্থি দামোদর নদীতে বিসর্জন করতে না পারলে সাঁওতাল পরিবার মনে শান্তি পান না। তাঁদের বিশ্বাস দামোদর নদীর নিম্ন গতিতে মৃত ব্যক্তির অস্থি প্রবাহিত হয়ে প্রথমে গঙ্গা এবং পরে সমুদ্রে গিয়ে মিশে যাবে।

চাই চম্পা (Chai champa) হাজারীবাগ বা রামগড় জেলার মধ্যে পড়ে। এটি লোকালয় থেকে অনেক দূরে। যেখানে পাঁচ একর জায়গা জুড়ে একটি দুর্গ রয়েছে। দুর্গের দেওয়াল মাটি এবং পাথর দিয়ে তৈরি। সাঁওতাল রাজা জাংরার (Jangra) দুর্গ ছিল এটি। এই রাজা নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে দুর্গের মধ্যে হত্যা করেছিলেন, যখন জানতে পারেন যে জেনারেল সৈয়দ ইব্রাহিম আলি (কারো কারো মতে মালিক বায়া) বিশাল মুসলমান সৈন্য নিয়ে তাঁর দুর্গ কে আক্রমণ করতে চেষ্টা করছেন। সৈয়দ ইব্রাহিম আলী তাঁর সেনাপ্রধানদের মধ্যে থেকে হযরত ফতেখান দুয়ালাকে এই দুর্গের দায়িত্ব দেন। এবং ফতেখান দুয়ালার মৃত্যুর পর তাঁর দেহকে এই দুর্গের মধ্যে কবর দেওয়া হয়। এরপর থেকে দুর্গটি একটি দরগা বা উপাসনা স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

চাই চম্পা থেকে ৪ কিলোমিটার দূরত্বে মানগড় দুর্গ অবস্থিত ছিল। এই দুর্গটি মানসিং নামক একজন সাঁওতাল রাজার দুর্গ ছিল। হাজারীবাগে বিভিন্ন সময়ে তিনজন করে মোট ছয় জন সাঁওতাল রাজার খবর জানা গেছে।

Bagh Rai এবং বাবু রাখাল দাস হালদার প্রমুখদের মত অনুসারে বঙ্গদেশের পূর্ব প্রান্তের সমুদ্র অঞ্চলে সাঁওতালরা প্রথম বসতি গড়ে তোলেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের বাইরের চাপে তাঁরা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল হয়ে আরো উপরে হাজারীবাগ, চাই চম্পা, খড়কডিয়া (Kharakdia) পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে নিজেদের বসতি স্থাপন করেন। Bagh Rai এর মতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের স্থানান্তরিতকরণ হওয়ার প্রবণতা এরপর পূর্ব দিকে অর্থাৎ চাই চম্পা থেকে সাওন্ত (Saont) হয়ে ছোট নাগপুর মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বিশেষ কোনো বহিঃশত্রু আক্রমণ হবে না ভেবে তাঁরা ঐ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে নিজেদের বসতি স্থাপন করেন। Bagh Rai আরো মতামত দেন যে সাঁওতালদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে ‘Kharwar’ উপজাতির সঙ্গে। তবে Mann এবং Hunter দুজনেই মনে করেন যে সাঁওতালদের পূর্ব নাম ছিল Kharwar. Buchanan Hamilton মনে করেন বিহার এবং সাহাবাদে ‘Cheros’, ‘Kols’, এবং Kherwars মিশে গেছে। আর তাই Kherwar দের সঙ্গে সাঁওতালদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাঁরা আরও মনে করেন যে সাঁওতাল সম্প্রদায় কখনোই ইতিহাসে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেননি। তাঁরা সবসময়ই গভীর অরণ্যে এবং শৈলশিরা সমূহে বসবাস করেছেন এবং একস্থান থেকে অন্যস্থানে ক্রমাগত স্থানবদল করেছেন। তাঁরা কখনোই গ্রামীণ জনপদ ছাড়া অন্য কোন জনপদ গড়ে তোলার কথা ভাবেননি। তাঁরা যে কোথাও কোন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ রাজা হয়েছিলেন অথবা শাসক হয়েছিলেন সেই সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় না। যদিও তাদের গানের সুর মাধুর্য এবং ছন্দ যথেষ্ট মিষ্টি কিন্তু প্রাচীন কোন গরীমা তাঁদের সংগীতে উঠে আসেনি। ১৮৫৫ সাল নাগাদ তাঁরা প্রথম জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঙ্ঘ বদ্ধ ভাবে হাতিয়ার ধরেছিলেন। পক্ষান্তরে মুন্ডা এবং হো সম্প্রদায়ের

আদিবাসীরা সর্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থেকেছেন। সাঁওতালরা নিজেদের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বকে গর্ব সহকারে স্বীকার করেছেন।

২.৩ স্বাধীনতার পরবর্তী কালে গবেষণা সমূহের পর্যালোচনা। (Review of related study):

গুহ, এবং ইসমাইল (মে-জুন ২০১৫) পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁদের গবেষণা পত্রটির শিরোনাম- "Socio-cultural changes of tribes and their impacts on environment with special reference to santal in West Bengal" গবেষকরা তাঁদের গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি গড়ে তোলেন- ১. আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক- সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ওপর আলোকপাত করা। ২. আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতি, সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং প্রসারের ওপর আলোকপাত করা। ৩. আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতি এবং শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাধার রূপরেখা তৈরি করা। গবেষক এই গবেষণা পত্রে আগেই উল্লেখ করেছেন পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল জাতি একটি বৃহৎ সম্প্রদায়। তাঁদের জীবনের একটি বড় অংশ হল তাঁদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা এবং কারুকার্য। তাঁরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে বছরের সমস্ত সাংস্কৃতিক উৎসব গুলি পালন করেন। তাঁরা নিজস্ব গান, নাচ, এবং বাজনা যেগুলি ধামসা, মাদল নামে পরিচিত এগুলির মাধ্যমে উৎসবে আনন্দ করেন। তাঁদের নিজস্ব ভাষা সাঁওতালি এবং বাংলা ভাষাতেও তাঁরা যথেষ্ট সাবলীল। এঁরা ভীষণই শান্তপ্রকৃতির হয়ে থাকেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন।

ডঃ সরেন, (জুলাই ২০১৩) সাঁওতাল জাতির স্থানান্তর সম্পর্কে একটি গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণা পত্রটির শিরোনাম- "Impact of globalization on the santals: A study on migration in West Bengal, India." গবেষক তাঁর গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য ঠিক করেছেন - ১. সাঁওতাল গোষ্ঠীদের মধ্যে দেশান্তরের ফলে তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষিকাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাজনীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করা। গবেষক এই গবেষণা কর্মটিকে সম্পাদন করার জন্য মোট ১৪৭ জন নমুনার কাছ থেকে field survey এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষক তাঁর গবেষণার ফলে নিম্নের বিষয়টি খুঁজে পেয়েছেন- স্থানান্তর সাঁওতালদের ঐতিহ্য কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন আনে।স্থানান্তর তাদের চাষবাসের ধরণ, রান্না খাওয়ার অভ্যাস, ভাষা, পোশাক, পরিচ্ছদ, রাজনৈতিক সচেতনতা, সঞ্চয়ের অভ্যাসকে প্রভাবিত করে। স্থানান্তর যখন গ্রাম থেকে শহরে হয়, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের শিশুদের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে, উচ্চমানের স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তোলে। বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার যেমন-ডাইনি প্রথা, ওঝা, গুনিন প্রভৃতি ধারণা থেকে বেরিয়ে আসে।

শ্রীমতি সেন (৩ মার্চ, ২০২১) বীরভূমের সাঁওতালদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- "Socio cultural transformation of santal in Bolpur, Shantiniketan of Birbhum district, West Bengal." গবেষিকা তাঁর গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি গড়ে তোলেন- ১. সাঁওতালদের জীবন যাত্রার সাম্প্রতিক পরিবর্তন নিরূপণ করা। ২. শান্তিনিকেতনের আশ্রম এর সাথে সাঁওতালরা কতটা জড়িত। ৩. শান্তিনিকেতনের ইতিহাস জানা। গবেষিকা তাঁর

এই গবেষণা কর্মটিকে সম্পাদন করার জন্য মোট ৩২৮ জন নমুনার কাছ থেকে প্রশ্নাবলী, নিরীক্ষণ, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ এবং এই জাতির বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

তাঁর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল হল - সাধারণভাবে সাঁওতালদের জীবন যাত্রা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য পরিচালিত হয় ওই স্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা। বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাঁওতালরা প্রকৃতি এবং শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সাথে ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। যা প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনার মাধ্যমে, বিশ্বায়ন এবং প্রকৃতিবাদের দর্শনে বিশ্বাস করে। বিশ্বায়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শান্তিনিকেতনের আশ্রম অন্যান্য স্থানের সাঁওতালদের মত তাদের কে আলাদা করে রাখেনি। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও এই অঞ্চলের সাঁওতালদের সাদরে গ্রহণ করেছে। বিশ্বভারতীর সাথে সাঁওতালদের সম্পর্ক শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য নয়, বরং শান্তিনিকেতন সাঁওতালদেরকে প্রশিক্ষণ দেয় বিভিন্ন রকম শিল্প কলা এবং বিশ্বভারতীর গ্রামীণ পুনর্নির্মাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে। যেটা তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রার অভ্যাসকে পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সাঁওতালদের থেকে তাদেরকে আলাদা করে।

গুপ্ত, এবং পাল (২০১৬) বীরভূমের সাঁওতালদের পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করেন। গবেষকদ্বয়ের গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হলো -The changing cultural pattern among the santhals of Birbhum, West Bengal. গবেষকদ্বয় তাঁদের গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দ্যেশগুলি গড়ে তোলেন- **১.** সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন কে

তুলে ধরা। ২. সাঁওতালদের পেশাগত বৈচিত্র্যকে তুলে ধরা। ৩. আদিবাসী এবং আদিবাসী নয় এরকম সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ককে তুলে ধরা। ৪. সাঁওতালদের ভাষা, শিক্ষা, বিয়ে, পরিবার, কুসংস্কার, গান, নাচ, রীতিনীতি কে তুলে ধরা।

প্রাপ্ত ফলাফল - সাঁওতাল সমাজে আধুনিকতাবাদের প্রভাব তাদের জীবনের চাল চলনে লক্ষ্য করা যায়। আধুনিকতাবাদের পদ্ধতি সাঁওতাল যুবকদের খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, টাকা সঞ্চয়ের অভ্যাস ইত্যাদির পথে পরিচালিত করছে। আদিবাসী নয় এরকম মানুষের সংস্পর্শে এসে বেশিরভাগ সাঁওতালরা তাদের শিশুর পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছেন এবং উন্নত স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তোলাকে প্রয়োজনীয় মনে করছেন। এই গবেষণাপত্রে দেখা গেছে সাঁওতাল সমাজ আধুনিকতাবাদ কে গ্রহণ করে নিজেদের সমসত্বতাকে নষ্ট করেছে। তারা সমাজ সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক পটভূমিকে পরিবর্তনের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটতে থাকলে এটা বলা যায় যে তারা তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিচয়কে শীঘ্রই হারিয়ে ফেলবে। সাংবিধানিক রক্ষা কবচের সুবিধার সাথে এবং আধুনিকতাবাদের উন্নয়নের সাথে প্রাচীণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গুলি এই জাতির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী প্রজন্ম বেশিরভাগই বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতি কে গ্রহণ করছে এবং কিছু সাঁওতাল খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি আসক্ত হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালরা নিজেদেরকে পরিবর্তিত করছে। বর্তমান আধুনিকতাবাদ এবং তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে যদিও এটা শেষ পর্যন্ত তাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি কে নষ্ট করছে অপরদিকে আধুনিকতাবাদ এর জন্যই তারা অর্থনৈতিকভাবে শক্ত হচ্ছে এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদা পাচ্ছে। শিক্ষার প্রতি ও তাদের আগ্রহ বাড়ছে।

দাস (২০১৭) বীরভূমের সাঁওতাল মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন সম্পর্কে একটি গবেষণা করেন। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল – "Economic growth and empowerment through education: a study on santal at Birbhum, West Bengal." গবেষিকা গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি গড়ে তোলেন- ১. মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার গুরুত্ব নিরূপণ করা। ২. স্ত্রী শিক্ষার দ্বারা মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন কে খতিয়ে দেখা।

গবেষিকা তার গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য মোট ১০০ জন নমুনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি Qualitative এবং Quantitative Research Approach ব্যবহার করেছেন। Case study method, পর্যবেক্ষণ,সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন field study এর জন্য। সংগঠিত প্রশ্নাবলী এবং কাই স্কয়ার টেস্ট ব্যবহার করেছেন।

গবেষিকা তাঁর গবেষণা পত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি খুঁজে পেয়েছেন -আর্থিক স্বনির্ভরতা এবং শিক্ষা সাঁওতাল মহিলাদের আত্মনির্ভরতার রাস্তা দেখাবে। এই গবেষণাপত্রটির মাধ্যমে গবেষিকা গবেষণা স্থলের সাঁওতাল মহিলাদের শিক্ষার মাধ্যমে স্থিতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে আরো দেখা হয়েছে শিক্ষার মাধ্যমে সাঁওতাল মহিলাদের আর্থিক স্থিতি কতটা উন্নত করা যায়। বীরভূমের তিনটি গ্রামের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে শিক্ষিতা মহিলারা উচ্চ স্থান পাচ্ছেন এবং তাঁরা নিজস্ব মতামত গ্রহণ করেন, অনেকেই চাকুরীজীবি, নিজেদের ইচ্ছেমত স্থানান্তরিত হতে পারেন, এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। গবেষণাপত্রে এটাও খুঁজে পাওয়া গেছে যে, শিক্ষিতা মহিলারা অনেক বেশি জ্ঞানী এবং সক্রিয় হন, অশিক্ষিতা মহিলাদের থেকে। অশিক্ষিতা

মহিলাদের সম্পত্তির মালিকানার ব্যাপারে সক্রিয়তা অনেক কম হয়। শিক্ষিতা মহিলাদের বিভিন্ন রকমের সম্পত্তির মালিকানা সম্বন্ধে ধারণা থাকে। শিক্ষিতা মহিলারাই পরিবারে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকেন। গবেষণাপত্রে দেখা গেছে যে সক্রিয় শিক্ষিতা মহিলারা অনেক বেশি উন্নত অশিক্ষিতা সাঁওতাল মহিলাদের থেকে এবং এটা দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার মাধ্যমে সাঁওতাল মহিলারা অনেক বেশি ক্ষমতায়িত হচ্ছেন।

দে (জুন, ২০১৫) পশ্চিম মেদিনীপুরের সাঁওতালদের বিশ্বায়ন এবং পরিবর্তন বিষয়ে একটি গবেষণা করেন যার শিরোনাম হলো- "Globalisation and change in tribes of Paschim Medinipur." গবেষক তাঁর গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি গড়ে তোলেন - ১. সাঁওতালদের জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন খুঁজে বের করা। ২. তাদের পেশাগত পরিকাঠামোর পরিবর্তন খোঁজা। ৩. পুরুষানুক্রমিক এবং নতুন সমাজ পরিকাঠামোর মধ্যে তুলনা করা। ৪. সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক শ্রেণী অনুযায়ী নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মান খোঁজা। ৫. বিশ্বায়নের ফলে পুরো সাঁওতালি জীবনের পরিবর্তন খুঁজে বের করা।

গবেষক তাঁর গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ২০০ জন নমুনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি পরিবার গুলিকে নিরীক্ষণ করেন এবং multi stage random cluster sampling method ব্যবহার করেন।

গবেষণা কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর গবেষক নিম্নলিখিত তথ্যগুলি খুঁজে পান-সাঁওতালদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী সামাজিক পরিবর্তনের হার এই গবেষণাপত্রে তুলে ধরা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রায় ৫৭.৫০% সাঁওতাল নতুন মিশ্র সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে।অন্যদিকে

২৩% সাঁওতাল তাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে মেনে চলে। বাকি ১৮.৫০% সাঁওতাল আধুনিক সংস্কৃতিকে মেনে চলে। ১৩% সাঁওতালরা পরম্পরাগত মোড়লদের মানে না। ১০% মানুষ শিক্ষা, নিয়ম এবং মূল্যবোধ ইত্যাদির জন্য পরিবর্তিত হয়েছেন। ৭% মানুষ নিষ্ক্রিয় থেকে গেছেন। প্রায় ৪৩.৫০% সাঁওতালরা আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাকে ইতি বাচক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ২০% মানুষ আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাকে বিস্তর পরিসরে বুঝতে পেরেছেন। ১২% মানুষ বিশ্বাস করেন যে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রভাব নেই। ৪% মানুষ এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থেকেছেন। বিশ্বায়ন সাঁওতাল মানুষদের অর্থনীতিতে পরিবর্তন এনেছে। ৬৫.৫০% মানুষ বুঝতে পেরেছেন তাঁদের অর্থনৈতিক স্থিতি তে বিশ্বায়নের প্রভাব অনেক বেশি। ৩% মানুষ বিশ্বাস করেন তাঁদের অর্থনৈতিক স্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি। ৭% মানুষ নিষ্ক্রিয় ছিলেন। বিশ্বায়নের ফলে সাঁওতাল মানুষরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং নিজেদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছেন। ৫৩% মানুষ বিশ্বাস করেন যে বিশ্বায়ন তাঁদের শিক্ষার স্থিতির পরিবর্তন করেছে। ১৩.৫% মানুষ শিক্ষায় বিশ্বায়নের প্রভাব বুঝতে পারেননি। ৮% মানুষ নিষ্ক্রিয় ছিলেন। ৪৩% সাঁওতাল মানুষ নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন। ৩৫% লোক কবিরাজি এবং ওঝা তে বিশ্বাস করেন। ১০% লোক তাঁদের এলাকায় যা সহজলভ্য তার ওপর নির্ভর করেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ৪৫% সাঁওতালরা তাঁদের পরম্পরাগত ব্যবস্থার সাথে যুক্ত। ৩৩% তাদের সমাজের রাজনীতিতে আগ্রহী। ১২% মানুষ স্থানীয় শাসক রাজনৈতিক দলের সদস্য। ২.৫০% মানুষের রাজনীতিতে কোনো আগ্রহ নেই। ৮.৫০% মানুষ এ সম্পর্কে কিছু জানেন না।

আহমেদ, এবং তত্ত্বসারানন্দ (জুলাই ২০১৮) ঝাড়গ্রামের সাঁওতালদের শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁদের গবেষণার শিরোনাম টি হল– “Education of santals of Jhargram: an ethnographic study.”

গবেষকগণ তাঁদের গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের কথা বলেন -ঝাড়গ্রাম ব্লকের সাঁওতাল সমাজের শিক্ষার চিত্র বর্ণনা করা। গবেষকগণ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য PRA (participatory rural appraisal), FGD (Focus Group discussion), সাক্ষাৎকার এবং পারিবারিক নিরীক্ষণ এর মাধ্যমে ৪৯৬ জন নমুনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

গবেষকগণ তাঁদের গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খুঁজে পেয়েছেন - গবেষণা স্থলে সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৭১.১৪% যেখানে শিক্ষিত পুরুষের পরিমাণ ৭৯.৪২% এবং শিক্ষিতা মহিলার হার ৬৩.০৯% ১-4 শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষিত ছেলের হার ১৫.১৪% এবং মেয়ের হার ১৭.১৭% ৫-৮ শ্রেণি পর্যন্ত পড়া ছেলের হার ২৯.৩৬% এবং মেয়ের হার ২৬.১৮% ৯-১০ পর্যন্ত পড়া ছেলের হার ১৮.৩৫% মেয়ের হার ৮.১৫% এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় বেশিরভাগ সাঁওতাল মেয়েরা প্রাইমারি শিক্ষা গ্রহণের পর তাদের পরবর্তী পড়া শেষ করে না। গবেষণাপত্রে দেখা গেছে গবেষণা স্থলে আদিবাসী জনসংখ্যায় সাঁওতাল, মুন্ডা, লোধা, শবর, প্রভৃতি উপজাতির মানুষ অধিক সংখ্যায় রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের পিতা-মাতারা শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখান এবং তাঁদের সন্তানদের হোস্টেল/ বোডিং-এ বাথরুমে রেখে পড়ানোর প্রতি আগ্রহী হন। দারিদ্র্য, স্থানান্তরিত হওয়া, হাতির ভয়, সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের প্রত্যহ স্কুলে যাওয়ার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে দিনগুলিতে সাঁওতালদের উৎসব হয় এবং স্কুল খোলা থাকে সেই

দিনগুলিতে কোন বাচ্চাই স্কুলে যেতে আগ্রহী হয় না। গবেষণা স্থলে প্রায় ৬২.৫% শিশুদের টিউশনের শিক্ষক আছে। বাংলা এবং ভূগোল সাঁওতাল ছাত্রদের প্রিয় বিষয়। ইংরেজি এবং অংক বেশিরভাগ সাঁওতাল ছাত্রদের কাছে কঠিন বিষয়। প্রায় ২৭.৫% সাঁওতাল ছাত্ররা কোন ধরনের বৃত্তি পায়না। ছাত্ররা যারা হোস্টেলে থাকে তারা হোস্টেলের খাদ্য তালিকা,পরিছন্নতা এবং স্বাস্থ্য বিধি বিষয়ে অসন্তুষ্ট। গবেষণা ক্ষেত্রে সাঁওতালদের শিক্ষিতের হার সন্তুষ্ট হওয়ার মত কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন এমন সাঁওতালদের সংখ্যা খুব অল্প এবং গবেষণা স্থলে বেশিরভাগ শিক্ষিত সাঁওতালরা বেকার।

আহমেদ, এবং তত্ত্বসারানন্দ (২০১৯) ঝাড়গ্রাম এর সাঁওতালদের আধুনিকতা এবং শিক্ষার উপর একটি গবেষণা করেছেন যার শিরোনাম হলো - "Modernization and the educated and non-educated santals of Jhargram: ethnographic study."

গবেষকগণ তাঁদের গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন - আধুনিকতার প্রসঙ্গে শিক্ষিত সাঁওতাল এবং অশিক্ষিত সাঁওদের মধ্যে সম্পর্ক। গবেষকগণ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য PRA, participant observation, FGD, semi-structured interview schedule, ঘরোয়া এবং পারিবারিক নিরীক্ষণ এর মাধ্যমে ৪৯৬ জন নমুনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পারিবারিক নিরীক্ষণ এর মাধ্যমে গবেষকগণ শিক্ষিত সাঁওতাল এবং অশিক্ষিত সাঁওতালদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। গবেষণায় খুঁজে পাওয়া গেছে যে গবেষণা স্থলে অশিক্ষিত সাঁওতালদের তুলনায় শিক্ষিত সাঁওতালরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে উন্নতিকরণ প্রক্রিয়া, যন্ত্রপাতি, এবং নতুন দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

মিশ্র (নভেম্বর, ২০১৪) মালদা জেলার সাঁওতালদের শিক্ষামূলক সচেতনতার উপর একটি গবেষণা করেছেন যার শিরোনাম হলো – "Educational awareness of tribal people (santal) in Malda district, West Bengal."

গবেষক তাঁর গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন- ১. মালদা জেলার সাঁওতালদের বসবাসের ধরন, শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্তি, শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ- সুবিধা, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা, সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধা এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপ করা। ২. গবেষণাপত্রে উল্লিখিত স্তর অনুযায়ী চল গুলির মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা।

গবেষক তাঁর গবেষণা কাজের জন্য ১০০ জন্য নমুনার কাছ থেকে interview scale for assessing educational awarness of Santali people, এবং structural interview scale এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষক তাঁর গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয় গুলি খুঁজে পেয়েছেন - ১. শিক্ষা ক্ষেত্রে সচেতনতা আনার জন্য গবেষণাপত্রে যতগুলি মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছিল সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য তার প্রত্যেকটা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ২. উন্নত সাক্ষাৎকার স্কেল এর সাহায্যে অভিপ্রেত চল গুলিকে মাপা হয়েছে এবং এটি স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখে বিন্যাস হয়েছে।

মন্ডল (ডিসেম্বর, ২০১৮) আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন, গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হলো- "Socio economic status of tribal people Mukundapur village, West Bengal. "

গবেষিকা তাঁর গবেষণার জন্য উদ্দেশ্য ঠিক করেছেন- ১. সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করা যা আদিবাসীদের ভিন্ন অবস্থান তৈরি করে। ২. তাদের

শিক্ষার সমতা এবং আয় এর সমতা মূল্যায়ন করা। ৩. তাদের জীবনধারণের কৌশলের উপাদানগুলি অন্বেষণ করা ৪.বর্তমান সমাজে তাদের ভূমিকা এবং অবস্থা নির্ধারণ করা।

গবেষিকা তাঁর গবেষণার জন্য ৫৭ টি বাড়ির উপর qualitative এবং quantitative method ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষিকা তার গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন যে বর্তমানে এই গ্রামের শিক্ষার অবস্থা নগণ্য, গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো ভীষণ জরুরী। এক্ষেত্রে সরকারের কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী প্রকল্প গুলির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তাদের শিক্ষার মান উন্নত হলে তাদের পেশার পরিবর্তন হবে এবং আয় এর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে।

মুর্মু, দে এবং মাইতি (২০২০) পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসীদের উচ্চ প্রাথমিকে স্কুল ছুটের সমস্যার বিষয়ে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্রের শিরোনাম হলো- "Problems of dropout of schedule tribe students at the upper primary level in Paschim Medinipur district of West Bengal."

গবেষকগণ গবেষণাটি করার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি তৈরি করেছেন - ১. উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুলছুট শিক্ষার্থীদের তালিকা চর্চা করা। ২. আদিবাসী এবং আদিবাসী নয় এমন স্কুল ছুট শিক্ষার্থীদের পরিমাণের মধ্যে তুলনা করা। ৩. উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সমস্যার কারণ গুলি পর্যালোচনা করা।

গবেষকগণ গবেষণা কাজ সম্পন্ন করার জন্য ৪১৮ জন নমুনার কাছ থেকে technique questionnaire, community member questionnaire, non-enrolled children's interview schedule, parent questionnaire, tribal student questionnaire এর

মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। মোট ৪১৮ জন নমুনার মধ্যে ২৮০ জন অভিভাবক, ৮০ জন আদিবাসী শিক্ষার্থী, ৩০ জন তালিকাভুক্ত নয় এরকম শিশু, ২৩ জন শিক্ষক এবং ৫ জন আদিবাসী জাতির সদস্য ছিলেন।

গবেষকগণ গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন যে- ১. ৫ বছরের স্কুল ছুটের সংখ্যা ৩.২৩%। ২. ড্রপ আউট আদিবাসী শিক্ষার্থীদের (১.৮৬%) পরিমাণ বেশি আদিবাসী নয় এরকম শিক্ষার্থীদের ড্রপ আউট এর সংখ্যার থেকে (১.৩৭%)। ৩. আদিবাসী ছাত্ররা স্কুলছুট বেশি হয় বাংলা মিডিয়ামে (৫.০৩%) সাঁওতাল মিডিয়ামের থেকে (১.৪৩%)। ৪. আদিবাসী শিক্ষার্থীরা বাংলা মাধ্যমের স্কুলে ভাষার সমস্যার সম্মুখীন হয়। ৫. ভাষার বাধায় সবথেকে বেশি লক্ষ্যণীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের স্কুল ছুটের ক্ষেত্রে। ৬. কিছু ক্ষেত্রে বাড়ির কাজের জন্য শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুলছুট হয়।

বসু এবং চ্যাটার্জী (২৩ অক্টোবর, ২০১৩) পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষতার অবস্থান বিষয়ে গবেষণা করেন। যার শিরোনাম হল- “Status of educational performance of tribal students: a study in Paschim Medinipur district, West Bengal.”

গবেষকদ্বয় তাঁদের গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি ঠিক করেছেন - ১. আদিবাসী স্কুলগুলির দক্ষতার স্তর খুঁজে বের করা। ২. অন্যান্য জাতির শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতার কারণ খুঁজে বের করা। ৩. আদিবাসী স্কুলের শিক্ষার্থীদের বেশি পরিমাণ স্কুলছুট হওয়ার কারণ খুঁজে বের করা। ৪. আদিবাসী শিক্ষার্থী এবং অন্য জাতির শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল ছুটের মধ্যে তুলনা করা। ৫. আদিবাসী স্কুলগুলির পরিবর্তন এবং উন্নতি বর্ণনা করা।

গবেষকদ্বয় এই গবেষণা কাজটি করার জন্য ৮টি আদিবাসী স্কুলের প্রত্যেকটির থেকে ৩০% শিক্ষার্থী নমুনার কাছ থেকে questionnaire এবং survey এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

গবেষকদ্বয় তাঁদের গবেষণা কাজটি পুরো করার পর নিম্নলিখিত তথ্যগুলি খুঁজে পেয়েছেন- ১.গবেষণা ক্ষেত্রে বেশিরভাগ অঞ্চলগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর হওয়ার জন্য পরিকাঠামোগত উপস্থিতি এবং সুবিধা তাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। ২. গবেষণা ক্ষেত্রে নিচুস্তরের স্কুল বেশি পরিমাণে থাকলেও উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম আছে। এই অসমতার জন্য বিশেষ করে মেয়েরা মাঝপথেই তাদের শিক্ষাগ্রহণ করা ছেড়ে দেয়। ৩. এই স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার খুব কম। ৪. স্কুলগুলিতে স্কুল ছুটের সংখ্যা খুব বেশি এবং এদের মধ্যে আদিবাসী শিক্ষার্থী ও মেয়েদের পরিমাণ বেশি। ৫. এই স্কুলগুলিতে ছাত্রীদের সাফল্যের হার সন্তোষজনক নয়, বিশেষ করে আদিবাসী শিক্ষার্থী এবং মেয়েদের মধ্যে। ৬. বেশিরভাগ অভিভাবকরা তাঁদেরে ছেলেমেয়েদের প্রতিদিন দূরের স্কুলে পাঠাতে চান না। তাঁরা শিক্ষার্থীদের বাড়িতে রাখেন কারণ বাচ্চারা বাড়িতে থেকে কাজকর্ম করলে তাদের অর্থনৈতিক লাভ হয়। তাঁদের কাছে মেয়েদের শিক্ষার মূল্যের থেকে রোজগারের মূল্য অনেক বেশি।

দাস, (২০১৯) আদিবাসীদের শিক্ষাগত অবস্থান এবং স্কুল ছুটের ওপর একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণার শিরোনাম হলো– “Educational status and dropout rate of schedule tribe in West Bengal: a study on Birbhum district."

গবেষিকা তার গবেষণা কার্যক্রমটি শুরু করার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন- ১. বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর প্রতি অভিভাবকদের মনোভাব পরীক্ষা করা। ২. বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো এবং শিক্ষিত করার প্রতি সম্প্রদায়ের একাত্মতা বিবেচনা করা এবং তুলনা করা।

গবেষিকা গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করার জন্য ৪০০ জন্য নমুনার কাছ থেকে নিজের তৈরি প্রশ্নমালা,এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রশ্নমালার সত্যতা যাচাই করার জন্য Cronbach এবং adequacy পরীক্ষার জন্য KMO test ব্যবহার করেছেন এর সাথে নিম্নলিখিত স্কেল গুলি ও ব্যবহার করেছেন- ১. Economic status scale (SESS) এবং ২. Attitude toward education scale.

গবেষিকা তাঁর গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়টি খুঁজে পেয়েছেন- এই গবেষণায় দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকা সন্তোষ জনক নয়। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ধারণা নিজস্ব প্রেষণা কোন উঁচুজাতির শিক্ষার্থীদের থেকে কম নয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্ভুক্তির হার খুব কম। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গুলি আদিবাসী শিক্ষার্থীদেরকে অন্য উঁচু জাতির শিক্ষার্থীদের সাথে সমান করার চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু সবার আগে পিছিয়ে পড়া জাতিদের প্রতি সমাজের চিন্তাভাবনাকে পরিবর্তন করতে হবে।

দে (জুলাই-আগস্ট, ২০১৫) সাঁওতালদের ইতিহাস সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। যার শিরোনাম হল- "An ancient history: ethnographic study of the Santhal " গবেষক তাঁর গবেষণা পত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ঠিক করেছেন- ১. সাঁওতালদের জীবন যাত্রা খোঁজা।

২. সাঁওতালদের প্রকৃতি, অভ্যাস, সংস্কৃতি ও সমাজকে খুঁজে বের করা। ৩. সাঁওতালদের ঐতিহ্য বহনকারী জীবনযাত্রা এবং পরিবর্তনশীল জীবন যাত্রার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করা। ৪. সাঁওতাল জাতিসমূহের বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ খোঁজা। ৫. সাঁওতালদের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে বের করা।

গবেষক এই গবেষণা কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য descriptive method ব্যবহার করেছেন। গবেষক গবেষণা কাজটি শেষ করার পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে খুঁজে পেয়েছেন - সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনের মান আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। শিক্ষার প্রসার এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার তাদেরকে নতুন চাষের পদ্ধতি, রান্নার ধরণ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, পোশাক, রাজনৈতিক সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়ে পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। গ্রাম থেকে মানুষ যখন শহরে যায় তখন তারা বুঝতে পারে তাদের বাচ্চার জন্য শিক্ষা কতটা জরুরি, তারা উন্নত স্বাস্থ্য গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন কুসংস্কার যেমন ডাইনি প্রথা, ওঝা প্রভৃতি বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসে।

সাহা (১২ ডিসেম্বর, ২০২১) উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর গবেষণা করেছেন। শিরোনাম হলো – “Socio economic condition of Tribal people: A study on Uttar Dinajpur district of West Bengal. "

গবেষক তার গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন- ১. উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান খুঁজে বের করা। ২. উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীদের কাজে অংশগ্রহণের হার দেখা। ৩. এই জেলার আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা গুলি কে খুঁজে বের করা।

গবেষক এই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সরকারি রিপোর্ট, জার্নাল, বই এবং ২০১১ এর আদমশুমারি প্রভৃতির সাহায্য নিয়েছেন। এই গবেষণায় প্রধানত descriptive method ব্যবহার করেছেন।

গবেষক এ গবেষণাটি করে নিম্নলিখিত ফলাফল টি খুঁজে পেয়েছেন যে, উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীরা সামাজিক অর্থনৈতিকভাবে ভীষণ পিছিয়ে আছে। শিক্ষার হার, শিক্ষার প্রতি অনীহা এবং সচেতনতা না থাকার জন্য আদিবাসীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন হচ্ছিলেন। ২০১১ এর আদমশুমারিতে দেখা গেছে এখানকার আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসী মানুষেরা উন্নয়নের পথে চলতে শুরু করেছেন। তাঁদের নিজস্ব চেষ্টা এবং শক্তি ভীষণ জরুরি তাদের ভালো থাকার জন্য।

পানিগ্রাহী, এবং পাত্র (২০১৮) পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের শিক্ষা সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন যার শিরোনাম হলো - "Educational status of the marginalized: study among the santals of Paschim Medinipur district West Bengal."

গবেষক দ্বয় তাঁদের গবেষণাপত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি কে গ্রহণ করেছেন- ১. প্রাইমারি স্কুলের সাঁওতাল বাচ্চাদের তালিকা স্কুলছুট এবং স্কুলে থাকার চিত্র চিহ্নিত করা। ২. স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের অসুবিধার প্রকৃতি পরীক্ষা করা। ৩.পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল বাচ্চাদের স্কুলছুট হওয়ার কারণ খুঁজে বের করা।

গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য গবেষকদ্বয় ৩০ জন্য নমুনার কাছ থেকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গবেষণাক্ষেত্র পরিদর্শন, ঘটনা অধ্যয়নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং কিছু ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন।

গবেষকদ্বয় এই গবেষণায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সাঁওতাল উপজাতি দের প্রাথমিক শিক্ষার ওপর আলোকপাত করেছেন। তৃণমূল স্তরে গবেষণায় কিছু বাধা-বিপত্তি খুঁজে পেয়েছেন যা শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যার তৈরি করেছে। উল্লেখযোগ্য ভাবে বলা যায় শুধু স্কুলে ভর্তি করার আইন প্রণয়ন করেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। পরিবর্তে অন্যান্য কারণগুলোর ওপর জোর দিতে হবে যেগুলো শিশু শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। এক্ষেত্রে সন্তানের পিতা-মাতার মানসিক উন্নতির প্রয়োজন। গবেষণা আরো অনেক সুযোগ সুবিধার ওপর আলোকপাত করেছে। মিড-ডে-মিলের জন্য পৃথক কক্ষ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, যেগুলো খুব তীব্রভাবে প্রতিফলন ঘটায় নিত্যকার শিক্ষনীয় কার্যাবলীর ওপর সেই বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দিতে হবে। এই গবেষণায় আরও খুঁজে পাওয়া গেছে যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং নীতি প্রয়োগের মধ্যে বিস্তর ফারাক যা শুধুমাত্র উপজাতি সম্প্রদায় কে বিচ্ছিন্নই করছে না অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উপজাতিদের আর্থসামাজিক, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতিকাররা তাঁদের অসামান্য অবদান দিয়ে চলেছেন। যদিও এটা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল জনজাতির প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা তবুও এই গবেষণা থেকে সারা দেশজুড়ে সাঁওতাল জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার অবস্থা প্রায় সমান। উপরে উল্লেখিত সমস্যাগুলি খুব স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করছে যে উপজাতিদের শিশুশিক্ষাকে আরও উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য নীতি কারকদের আরো ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন।

ঘোষ, (২০১৫) আদিবাসীদের বিশ্বায়ন সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হলো- "Impact of globalization on tribal World of West Bengal"

গবেষক গবেষণার জন্য নিম্নের উদ্দেশ্যগুলি ঠিক করেছেন - ১. পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীরা কিভাবে বিশ্বায়ন পদ্ধতি যেমন যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতিকরণ, শিল্পায়ন, উন্নয়ন, শিক্ষা, বিভিন্ন প্রকল্প ও সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে তাদের জীবনকে উন্নত করছে। ২. আদিবাসী মানুষেরা কিভাবে তাদের বাসস্থান পরিবর্তনের সাথে জীবনযাত্রার পরিবর্তন করছে বিশেষ দক্ষতার সাহায্যে তা পরীক্ষা করা। গবেষক statistical progress and diagram এর মাধ্যমে তথ্যকে বিশ্লেষণ করেছেন।

বিশ্বায়ন জনগণের সমস্যা সমাধানে একটি মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকে এইভাবে বিশ্বায়নের মাধ্যমে বিশ্ব হয়ে উঠবে একটি বিশ্ব পরিবার। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। উন্নয়নশীল পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে আধুনিকতার ছোঁয়া সর্বস্তরে পৌঁছয় না বিশেষ করে উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রান্তিক শ্রেণীর কাছে। সর্বোপরি বিশ্বায়ন এবং এই প্রগতিশীল কিছু কার্যাবলী কখনোই বদলে দিতে পারে না পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র মানুষের জীবন শৈলী। কারণ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য যেখানে উপজাতি সম্প্রদায়ের কখনোই উন্নয়ন কার্যাবলীর রসদ সমানভাবে ভাগ করতে পারেনা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত। এক্ষেত্রে গ্রাম এবং শহরের সব মানুষের মধ্যে বৈষম্য তুলে ধরেছে বিশেষ করে ধনী এবং গরীব মানুষের মধ্যে।ফলস্বরূপ দরিদ্ররা দরিদ্রতর হচ্ছে, উপজাতিরা আরো বেশি করে নিপীড়িত হচ্ছে। সংবিধানে শিক্ষা এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য অনেক বিধান রয়েছে। এইসব বিধান সত্বেও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজন আধুনিকিকরণ এবং

শিল্পায়নের কাছে হার মানছে। ভূমি জঙ্গল ছিল উপজাতিদের উপার্জনের উৎস এবং বাসস্থান এবং নগর উন্নয়নের জন্য এই প্রজাস্বত্ব গুলোকে হারাতে হচ্ছে এবং পারিবারিক গঠনও সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে।

দাস, (অক্টোবর, ১০১৯) লখিমপুর জেলার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থানের ওপর একটি গবেষণা করেছেন।গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হলো - "Economic condition of Santhal tribe in Lakhimpur district: A sociological study"

গবেষক/গবেষিকা তার গবেষণাপত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যকে তুলে ধরেছেন- ১. সাঁওতালদের বিভিন্ন ধরনের পেশা কে তুলে ধরা। ২. হারমাট্টির চা বাগানের সাঁওতালদের জীবন যাপনকে তুলে ধরা।

গবেষক/গবেষিকা explorative এবং descriptive দুই ধরনের Research Design ব্যবহার করেছেন। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন Non-para-metric observation এর মাধ্যমে। তিনি মোট ৩০ জন নমুনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

এই গবেষণা থেকে জানা গেছে যে হারমিট্টি চা বাগানের ৩০ জন নমুনার মধ্যে কুড়িজন সাঁওতাল অস্থায়ী কর্মী এবং দশজন সাঁওতাল স্থায়ী কর্মী। তাদের দৈনিক বেতন ১৩৭ টাকা এবং এটি স্থায়ী অস্থায়ী মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য একই। ১৫ দিন ছাড়া তারা তাদের পারিশ্রমিক পান। চা বাগানে কাজ করার আগে সাঁওতালরা অন্যান্য কাজ করতেন চাষ-বাস এর কাজ, জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে সামনের গ্রামে বিক্রি করা, কাঠের কাজ করা প্রভৃতি। সাঁওতাল মহিলারা বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত থাকেন। এই অঞ্চলে শিক্ষার হার খুবই কম। মোট ৩০ জন নমুনার মধ্যে চারজন উচ্চ প্রাথমিক পর্যন্ত স্কুলে গেছেন।

অন্যান্যরা কোনরকমে নাম সই করতে পারেন। কিন্তু তারা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায়। সাঁওতাল মহিলারা সাঁওতালি ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা বুঝতে পারে না। এখানকার সাঁওতালদের জীবন যাত্রা ভীষনই যন্ত্রণাদায়ক। তাদের বাড়ি গুলি অর্ধেক কাঁচা এবং অর্ধেক পাকা, তাদের শৌচাগার গুলি অস্থায়ী। তারা সাধারণত কুঁয়ো থেকেই পানীয় জল আহরণ করে। চা বাগানের মালিকরা তাদের রেশন কার্ড এবং স্বাস্থ্য সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কিন্তু এদের নিজস্ব কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। এদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি থাকলেও আসামে থাকে বলে সামিয়া সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে, ফলে বর্তমানে তারা তাদের সাঁওতাল পরিচয় হারাচ্ছে।

মুদি, (অক্টোবর, ২০১৮) দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ওপর একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণার শিরোনাম হলো- "Transformation of socio-economic condition of tribal community- in frontier Bengal: Identity crisis and present scenario. "

গবেষক এই গবেষণার মাধ্যমে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের কিছু নির্বাচিত উপজাতি সম্প্রদায়ের পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় পরিবর্তনের ওপর আলোকপাত করতে চেয়েছেন।

গবেষক এই গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন যে- পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ছোটনাগপুরের কিছু পাহাড়ি এলাকা জঙ্গলমহল হিসাবে পরিচিত। জঙ্গলমহলের অধিকাংশ অধিবাসীরাই সাঁওতাল উপজাতির এবং এদের সাথেই কিছু আণুবীক্ষণিক উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ প্রথম থেকেই এই অঞ্চলে বসবাস করে।যেমন-সবর,বীরহড় প্রভৃতি।তারা নিজেদের পরিচিতির বিশুদ্ধতাকে যুগের পর যুগ বজায় রেখে চলেছে। তারা

জঙ্গলমহলের সবথেকে পুরনো বাসিন্দা এবং সামাজিক দিক থেকে তাদের নিজস্ব পৃথক পরিচিতি রয়েছে। তাদের প্রাচীন কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেলেও তারা তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়টা হারিয়ে ফেলেছে কিছু সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের কুফলে। একইভাবে উপজাতি সম্প্রদায়ের নিজস্ব গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল। তাদের গ্রামের প্রধান আদি অকৃত্রিম একটি গ্রাম্য অর্থনীতি তৈরী করেছিলেন। কিন্তু এই ভৌগোলিক অবস্থান ব্রিটিশ ক্ষমতার আক্রমণের সাথে সাথে এই উপজাতি সম্প্রদায় তাদের অর্থনীতির আসল রূপকে হারিয়েছে। এবং ক্রমাগত তারা বিভিন্ন ধরনের আর্থসামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। তাদের নিজস্ব সাঁওতাল ধর্ম থাকা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে।

দত্ত এবং বিশাই (২০২০) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় এবং শিক্ষার প্রবণতা সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্র টির শিরোনাম হল - "Literary Trends and Difference of Schedule Tribes in West Bengal : A Community Level Analysis."

গবেষকবা এই গবেষণা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন - ১. পশ্চিমবঙ্গের জাতিগত সম্প্রদায়ের বর্তমানে শিক্ষার প্রবণতা বিশ্লেষণ। ২. পুরুষ এবং মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণের হার এর মধ্যে পার্থক্য। ৩. বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী মহিলাদের শিক্ষাগত অবস্থান উল্লেখ করা।

গবেষকদের গবেষণাটি করার জন্য Effectively Literary rate এবং Literary Growth Rate মেথড ব্যবহার করেছেন।

বেরা এবং শর্মা (২০১৮) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার উপর একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্র টির শিরোনাম হল- "A Comparative Study About Schedule Tribe in West Bengal, India." গবেষক দ্বয় তাঁদের গবেষণায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন- ১. বাংলার সংস্কৃতিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমিকা বোঝা। ২. পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন করা। ৩. বাংলা সংস্কৃতি এবং আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যে মিল খুঁজে বের করা। ৪. বিশ্বায়নের ফলে আদিবাসীদের উন্নতির মান খোঁজা। ৫. পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের সাক্ষরতা এবং শিক্ষার হার খুঁজে বের করা। ৬. পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের কাজে অংশগ্রহণের হার খুঁজে বের করা।

গবেষকরা গবেষণায় field survey এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই প্রতিবেদনটি শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সহজাত প্রাকৃতিক কার্যের প্রচলিত উদাহরণ বিবরণ-নিরীক্ষণের মাধ্যমে। সহজাত প্রাকৃতিক প্রথা কিভাবে দেশের সাথে সম্পর্কিত তাই এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথমত গবেষকদের পশ্চিমবঙ্গের আদিম বংশানুক্রমিক জনসংখ্যার আয়তন এবং বন্টনের কথা বলেছেন সাঁওতালদের সংখ্যা অন্যান্য উপজাতিদের থেকে তুলনামূলক ভাবে অনেকে বেশি (৫১.৮%)।এবং সবরদের সংখ্যা সেখানে অনেক কম। গবেষকদ্বয় এখানে উপজাতিদের দক্ষতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বলেছেন। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির থেকে ভুটিয়াদের দক্ষতার হার (৭২.৬%) সর্বাধিক বেশি এবং সর্বনিম্ন দক্ষতার হার মুন্ডাদের (৪১%)। উপজাতি জনসংখ্যার ৪৮.৮% শিক্ষিত যা বিশেষজ্ঞদের হিসাবে একত্রিত জাতীয় আদর্শ মানের কাছাকাছি। আদিবাসীদের মধ্যে ৬৫.৭% প্রধান শ্রমিক এবং ৩৪.৩% ক্ষুদ্র শ্রমিক। আদিবাসীদের জনসংখ্যার বৈবাহিক অবস্থানের প্রচলন ব্যাখ্যা করে যে ৫.৬% মানুষ কখনো বিয়ে করেনি, ৪৩.১% বিবাহিত, ৫.৪% বিধবা বা

বিপত্নীক এবং ০.৮% পৃথকীকৃত। মোট জনসংখ্যার মধ্যে যেখানে পৃথকীকৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে যেখানে ওঁরাওরা পৃথকীকৃতের ক্ষেত্রে অনেক পরে (০.৫%)। সমস্ত উপজাতি নারীর জনসংখ্যা ২.৬%। ১৮ বছর যা বিয়ে করার বয়সের সর্বনিম্নসীমায় কেউ বিয়ে করেনি। দশটি উল্লেখযোগ্য উপজাতিদের মধ্যে শবররা সর্বোচ্চ কম বয়সে বিবাহিত (৩.৫%)। যা রাজ্যের অন্যান্য উপজাতিদের গড় মানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪,৪০৬,৭৯৪ জন উপজাতির জনসংখ্যায় ৭৪.৬% হিন্দু, ৬.১% খ্রিষ্টান, ১.৮% বৌদ্ধ, এবং ০.৪% মুসলিমদের থেকে কম সংখ্যায় আছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে উপজাতির জনসংখ্যা রাজ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ।

ঘোষ, (২০১৮) বীরভূমের বীরভূম জেলার আদিবাসীদের শিক্ষার উন্নতির ওপর একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল -"Development of Education and its Impact on the Population Composition of the Tribal People of District of West Bengal."

গবেষক গবেষণার কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন - ১. পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কত সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। ২. বৃহত্তর সমাজের দ্বারা প্রভাবিত এই জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাগত গঠনের পরিবর্তন গুলি খুঁজে বের করা।

প্রচলিত শিক্ষা মানুষের সার্বিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। শিক্ষাগত উন্নয়ন এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সেগুলো যথাযথভাবে নেওয়া হয়নি কিছু সমস্যার কারণে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব যেমন স্কুল,

হোস্টেল, শিক্ষক, শোচনীয় দারিদ্র্য এবং অপ্রাসঙ্গিক কার্যকলাপ ইত্যাদি নিম্নস্বাক্ষরতার হার এর প্রধান কারণ। উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষরা বেশি পরিশ্রমী (বিশেষত মহিলারা) যারা অভিযোজিত এবং সাধারণ মানসিকতা সম্পন্ন। এই কারণে তাদের আর্থসামাজিক জনতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে সাংস্কৃতিক অভিযোজনের মাধ্যমে। ঘরোয়া শিক্ষা তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনযাপন পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যারা অন্য জাতির সাথে সহবাসস্থান করে তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক রূপান্তর সেই মানুষদের থেকে বেশি যারা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে তাদের তুলনায়। যদি তাদের জীবনচর্চার এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধনের নীতি গ্রহণ করা হয় তাহলে তারা তাদের জীবনে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় সেই বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিকাঠামো গত স্কুল এবং কার্যকলাপ সমূহ শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষকের সংখ্যা ইত্যাদির ওপর আরো জোর দেওয়া উচিত। তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাদের বার্তা আদান-প্রদানের পদ্ধতির উন্নয়ন যাতে তাদের জীবনচর্যার উন্নতি হয়। যদি তাদের স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায় তাহলে তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গুলো পরিবর্তিত হবে।

ঘোষ (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৩) বীরভূমের সাঁওতালদের ক্রমবিকাশ কাজের উপর একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল- "Development Programs and The Tribal: A Study on The Santals of Birbhum District."

গবেষক গবেষণার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খুঁজে পেতে চেয়েছেন- ১. সাঁওতালদের অভ্যাস। ২. সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক জীবন। ৩. সাঁওতালদের সামাজিক সাংস্কৃতিক দিকগুলি। গবেষক এই গবেষণাটি করে জানতে পেরেছেন স্বাধীনতার পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নীল চাষ আদিবাসীদের ভূমিহীন করে তুলেছিল। তারা নীল চাষের জন্য কৃষি জমি ও বনাঞ্চল দখল করে। স্বাধীনতার পর গৃহীত কর্মসূচি তাদের আর্থসামাজিক জীবনকে বদলে দেয়। জনসংখ্যার গুণমানের মধ্যে শিক্ষাগত অর্জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষরতার স্তর এবং শিক্ষা অর্জন একটি জাতির অর্থ সামাজিক উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি এবং একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।সাক্ষরতার স্তর, এলাকা, লিঙ্গ, পেশাগত গোষ্ঠী, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে পরিবর্তিত হয়। বীরভূমের সাঁওতালদের শিক্ষা স্তরের উন্নতির জন্য সরকার বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায় যে বিভিন্ন স্কুলে তহবিলের বরাদ্দ এবং ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে (১৯৮০-২০১২)। গবেষক দেখেছেন যে বরাদ্দের প্রায় ৫০ শতাংশ হোস্টেল চার্যের জন্য ব্যবহৃত। এই জেলায় বেশিরভাগই গ্রামীণ অশিক্ষিত এবং পরিশ্রমই আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিরও অবস্থান পরিবর্তন ও পরিবর্তত হচ্ছে অবকাঠমোগত সুবিধার উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে। বেশিরভাগ গ্রাম রাস্তা দ্বারা আন্তঃসংযুক্ত যার ফলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পায়। খাদ্যভাস এবং বস্তুগত সংস্কৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। তারা আধুনিক পোশাক পরে, প্রসাধনী এবং ধাতব অলংকার ব্যবহার করে। উৎসব উদযাপনের ধরনেও পরিবর্তন হয়েছে। তরুণ শিক্ষীতরা ঐতিহ্য প্যাটার্নে নাচতে চায় না। উন্নয়ন কর্মসূচি শুধুমাত্র পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার তরান্বিত শক্তি হিসেবে কাজ করে না,প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য ও উপজাতীয় লোকদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিস্তার এবং সংস্কৃতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন আনে। সাঁওতালরা নিজেদেরকে “হর হপন” বা মানুষের সন্তান বলে অভিহিত করে। প্রাথমিক দিনগুলিতে তাদের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ছিল যার মাধ্যমে তারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত

হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্বকালে খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদেরকে আধুনিক শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার ও কেন্দ্র সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত চাকরীতে এইসব কর্মসূচির সংরক্ষণ নীতির বলে তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন আসে। সাঁওতাল সনাতন সমাজে ধীরে ধীরে আধুনিক সমাজে রূপান্তরিত হয়।

মুখার্জি, (২০১৪) পুরুলিয়ার সাঁওতাল, খেড়িয়া, শবর এবং বীরহড় মহিলাদের শিক্ষার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল – "Status of Female Education among Shantal, Kheriya, Sabar and Birhor Community of Purulia district, West Bengal." গবেষক গবেষণাটি করার জন্য- Female Educational Attainment Index (FEAI), Human Development Index (HDI), Combined Enrolment Index (CEI), Female Literary Index (FLI), প্রভৃতি মেথডের সাহায্য নিয়েছেন। গবেষক তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে একটা উপজাতি সমাজে তথাকথিত সুশীল সমাজের তুলনায় নারীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং অ-আদিবাসীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক। উপজাতীয় মহিলারা অর্থনৈতিক বোঝা উপভোগ করে এবং ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি তার পরিবার ও সমাজের প্রতিটি সিদ্ধান্তে অংশে নেয়। যাইহোক বাস্তববাদী বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে উপজাতির মহিলারা এখনো শিক্ষা এবং শালীন জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান অধ্যয়নের লক্ষ্য হলো উপজাতি নারীদের শিক্ষার স্তর বিশ্লেষণ করা। বিশেষ করে সাঁওতাল, খেড়িয়া, সবর এবং বীরহড় উপজাতি ভারতের (বিশেষভাবে দুর্বল উপজাতির গোষ্ঠী) প্রধান উপজাতীয় সম্প্রদায়ের

যারা দশটি জাতিগত এবং দশটি বহু জাতিগত গ্রামে বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় তদন্তটি সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত ক্ষেত্রে জরিপ থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক ডেটা সেটের উপর ভিত্তি করে। এই ডেটা সেট এবং পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে আদিবাসী মহিলাদের গ্রাম স্তরের শিক্ষা এবং আন্তঃসম্প্রদায়িক অবস্থা তদন্ত করা হয়েছে। উপজাতির সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী শিক্ষার অবস্থা বোঝার জন্য একটি পরিসংখ্যান পরিমাপ কৌশল তৈরি করা হয়েছে।

Basu Babu and Brahmanandam (2016) আদিবাসীদের শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। তাঁদের গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- "Education status among the scheduled Tribes: Issues and challenges." গত সপ্তাহে এই গবেষণায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলি ঠিক করেছেন - ১. আদিবাসীদের উপর বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রমের কার্যকারিতা এবং প্রভাব আলোচনা করা। ২. আদিবাসীদের শিক্ষার নিম্নমানের জন্য যে জটিল চলগুলি দায়ী তাদের অধ্যয়ন করা। ৩. আদিবাসীদের শিক্ষাগত পরিবর্তনের জন্য প্রকৃত শিক্ষাকে উপলব্ধি করা।

উপজাতিরা দুর্গম বন্য অঞ্চলে বসবাস করে। উপজাতিদের জীবন এবং জীবিকা বন সম্পদের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। সে কারণে বহির্জগতের সাথে তাদের সম্পর্ক কৃত্রিম অথবা বিচ্ছিন্ন। ব্রিটিশ শাসনকালে এই সমস্ত এলাকা থেকে উন্নয়নের নামে কর আদায় করা হতো। ভূস্বামী নীতি অনুযায়ী উপজাতিরা তাদের নিজস্ব জমি থেকে উৎখাত হতো এবং জমির দখল পেতো অ-উপজাতির জমিদাররা। এই কারণে বিভিন্ন সময়ে উপজাতিরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ফলে ব্রিটিশরা তোষণের নীতি অবলম্বন করে যা

ভারতবর্ষে তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থকে চরিতার্থ করে। ব্রিটিশদের প্রধান লক্ষ্য ছিল উপজাতিদের নিজের মতো করে বাঁচতে দেওয়া যাতে কোন সমস্যা না হয়। এবং স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমাজের প্রান্তীয় সম্প্রদায় উন্নয়নের জন্য শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইহা তফশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিদের মতো অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। খবরের কাগজের আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে সরকারকে অনেক উন্নতি করতে হবে,বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে। এমনকি সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প চালু করার পর মাত্র ৮৮.৪৬% আদিবাসী পরিবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে। উপজাতিভুক্ত শিশুদের মধ্যে স্কুলছুটদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে কিন্তু এই সংখ্যা আরো কমানোর জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি প্রস্তুত করতে হবে। মিড ডে মিল,নৈশ বিদ্যালয় এবং বয়স্কদের শিক্ষাদান ইত্যাদি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গরনাইক এবং বারিক (অক্টোবর, ২০১২) ঝাড়সুগুড়া জেলার আদিবাসীদের শিক্ষায় আশ্রম স্কুলের ভূমিকা সম্পর্কে একটি গবেষণা করেন, গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- "Role of Ashram School in Tribal Education: A Study of a Block in Jharsuguda District". গবেষকগণ এই গবেষণায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি ঠিক করেছেন - ১. শিক্ষার্থীদের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ তদন্ত করা। ২. স্কুলের সুবিধাগুলি মূল্যায়ন করা। ৩. শিক্ষার্থীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। ৪. আসাম স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত আকাঙ্ক্ষা গুলি মূল্যায়ন করা।

গবেষকরা গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন যে আশ্রমস্কুলগুলি নিশ্চিতভাবে গরীব এবং বঞ্চিত উপজাতির শিশুদের উত্থানে সাহায্য করে, যাদের অভিভাবকরা স্কুলে পাঠাতে সক্ষম নয়

তাদের পক্ষে শিশুদেরকে স্কুলে পাঠানো অর্থনৈতিকভাবে খুব কঠিন এবং তাদের প্রচলিত প্রথার সঙ্গে খুব একটা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাদের অগ্রসতার মুখ্য কারণ হলো দারিদ্র্য। এটা দেখা গিয়েছে যে আশ্রম স্কুলের শিশুদের অভিভাবকদের ৬০% দিনমজুর, ২০% কৃষক এবং ১০% কয়লা খনিতে অথবা সরকারি দপ্তরে কাজ করে। আশ্রম স্কুলগুলি উপজাতিভুক্ত শিশুদের বিনামূল্যে খাওয়া-দাওয়ার সুযোগের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার চাহিদা পূরণ করেছে। কিন্তু ছাত্রদের খাপ খাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও অন্যান্য জিনিসের দিকে যেমন বই খাতা কেনার খরচ, পোশাক, প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ,যাতায়াতের খরচ, গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা এবং পূজা ও পিকনিক ইত্যাদি বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন। কিছু অভিভাবকদের ক্ষেত্রে এগুলো স্বাভাবিক খরচ হলেও অনেকের ওপর এটি অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, নিম্নতর ক্লাসে ছাত্রদের ভর্তি হওয়ার সংখ্যা উচ্চতর ক্লাসে যেমন পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ইত্যাদিতে ভর্তির চেয়ে কম।ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্রদের ভর্তির সংখ্যা সব থেকে বেশি, যাদের মধ্যে অনেকেই খুব দরিদ্র পরিবারের সদস্য। স্বাভাবিকভাবেই তাদের রেজাল্ট খুব হতাশাজনক এবং খুব কম সংখ্যক ছাত্ররাই পরীক্ষায় পাস করতে সক্ষম হয়।

Anbuselvi and Leeson (এপ্রিল, ২০১৫) ভারতবর্ষের আদিবাসীদের শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। যার শিরোনাম হল- "Education of Tribal Children in India: A Case Study". গবেষকগণ তাঁদের গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলি ঠিক করেছেন- ১. শিক্ষার্থীদের পরিবার এবং স্কুলের বিভিন্ন বাধা সম্পর্কে অধ্যয়ন করা যা তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণে বাধা দান করছে। ২. আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য সরকার যে সহায়তা গুলি করে

সেগুলিকে চিহ্নিত করা এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে জানা। ৩. শিক্ষার দ্বারা অপুষ্টি জনিত অবস্থার উন্নতির জন্য উপযুক্ত নিবারক উত্থাপিত করা।

গবেষকরা তাঁদের গবেষণা কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য Simple Random Sampling Method ব্যবহার করেছেন।

গবেষকগণ তাঁদের গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন যে - ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৬তম অংশে শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে বিশেষ যত্ন সহ তফসিলি উপজাতি এবং তফসিলি বর্ণের লোকেদের উন্নতি করার জন্য জোর দেয়। গত চার দশকে তফসিলি উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অনেকটাই অসম। আদিবাসীদের সঠিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে উপজাতীয়দের মধ্যে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা হ্রাস করতে হবে এবং তা দূর করতে হবে। আদিবাসীদের শিক্ষাগত অবস্থার উন্নতির জন্য প্রাথমিক এবং প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার সুযোগ এবং প্রশিক্ষণের সাথে উন্নত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য হোস্টেল সুবিধা জারি ও উন্নত করতে হবে। উপজাতীয় কল্যাণ বিভাগে আদিবাসীদের জন্য কর্মস্থানের সুযোগ তৈরি করার জন্য নতুন প্রোগ্রাম এবং ডিজাইন চালু করতে হবে। কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের পরিচালক উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের কার্যকর কর্মজীবন নির্দেশিকা প্রদান করতে পারেন যাতে তাদের এই ক্ষমতা, যোগ্যতা এবং কর্মজীবনের পরিকল্পনার স্ব-মূল্যায়ন করতে সহায়তা করা যায়। আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উচ্চমানের শিক্ষা নিশ্চিত করা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও আবাসিক শিক্ষা আরো জোরদার করা হবে। সমস্ত উপজাতীয় ছাত্রদের চাহিদা মেটাতে বিদ্যমান টিউশন স্কিম পরিবর্তন করা হবে। বৃত্তি হার ঘন ঘন সংশোধন করা হবে। প্রি-ম্যাট্রিক হোস্টেলের সমাপ্তি এবং তাদের পরিকাঠামগত সুবিধার

উন্নতি এবং মেস চার্যের সংশোধনের জন্য উচ্চ অগ্রাধিকার প্রয়োজন। উপজাতীয় এলাকায় এনজিওদের সম্পৃক্ততা নিয়ে ব্যাপক সচেতনতা ও সাক্ষরতার কর্মসূচির আয়োজন করা জরুরি। মেধাবী তপশিলি উপজাতির শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তির লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন।

তালুকদার এবং মেটে (২০২১) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটি গবেষণা করেন। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হলো - "Social Media in Changing The Culturel of Tribal Community in West Bengal ". গবেষকগণ তাঁদের গবেষণায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলিকে ঠিক করেছেন- ১. সোশ্যাল মিডিয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের জীবন যাত্রার পরিবর্তন কতখানি হয়েছে?। ২. সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীরা পেশাগত ভাবে স্থানচ্যুত হচ্ছেন কিনা?

গবেষকগণ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য Kerlinger Research Design Consists of Structure of Research and Technique, use of Conducting Research মেথডটি ব্যবহার করেছেন।

গবেষকগণ গবেষণাটি করে দেখেছেন যে সোশ্যাল মিডিয়া পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মূল্যবোধ, নিয়ম, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক সহ উপজাতিদের জীবনধারাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উপজাতিরা অনলাইন প্রোগ্রামের মাধ্যমে সহজে ফসল বিক্রি করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছে যার ফলে মোট মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের সরিয়ে দেওয়া

হয়েছে। বর্তমানে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উন্নত করার জন্য এবং তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাদের নিজস্ব প্লাটফর্ম রয়েছে। অনেক উপজাতি তাদের বর্তমান পেশা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পেশাগতা সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে যা তাদের অন্য পেশার দিকে নিয়ে যেতে চালিত করে। গবেষণাটি পশ্চিমবঙ্গের উপজাতিদের ঐতিহ্যগত জীবনধারায় বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং নিয়ম পরিবর্তনে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা এবং প্রভাবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যদিও অনেকেই নিজেদেরকে আধুনিকায়নের ছাদের রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল এবং যারা এখনো আদিম অন্ধকারে ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ আশা করে যে ভবিষ্যতেও তারা সামাজিক মিডিয়ার অগ্রিম প্রতিফলনের সাথে আধুনিকীকরণের ধারায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করার জন্য উপযুক্ত হবে।

সরেন এবং মন্ডল (২০১৯) দক্ষিণ দিনাজপুরের আদিবাসীদের বিষয়ে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণা পত্রটি শিরোনাম হল- "An Analytical Study of Inter District Tribal Development of Dakshin Dinajpur District, West Bengal". গবেষকরা তাঁদের গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য- (1) workforce participation calculation. (2) rank analysis to the light of development and disparity এবং (3) composite indices and weight Score প্রভৃতি মেথড এর সাহায্য নিয়েছেন।

গবেষকগণ তাঁদের গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খুঁজে পেয়েছেন। বর্তমান সমীক্ষাটি নির্বাচিত সামাজিক পরিমিতিগুলির মাধ্যমে ব্লক স্তরের উপজাতীয় উন্নয়ন বিশ্লেষণের উপর পরিচালিত হয়েছে। পোর্টফোলিওর সম্মিলিত কাজের একটি যৌগিক স্কোর উন্নয়নের স্তরে

পৃথক ব্লকের অবস্থান মূল্যায়ন করে। এটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রতিটি পৃথক ব্লকের আদিবাসী উন্নয়নকে বুঝতে সাহায্য করে। এটি শিক্ষা, আয়, বাড়ির ধরণ এবং কর্মশক্তিতে অংশগ্রহণের হারের ক্ষেত্রে সমগ্র জেলার বিভিন্ন ব্লকে উন্নয়নের স্থানিক পরিবর্তন রেকর্ড করেছে। উল্লিখিত পরামিতিগুলির সংশ্লেষিত যৌগিক সূচক বিকাশের জন্য ওজন দেওয়া হয়েছে। ব্লক গুলিকে উন্নয়ন শ্রেণীকরণের চারটি গ্রুপে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। বালুরঘাট ব্লক এ খুব উচ্চ স্তরের উন্নয়ন বিভাগ রেকর্ড করা হয়েছে। গঙ্গারামপুর তপন এবং বংশীবিহারী ব্লকে উন্নয়নের উচ্চ স্তর; হিলি, হরিরামপুর, কুমারগাও এর মাঝারি স্তরের উন্নয়ন এবং হরিরামপুর ব্লকের নথিভুক্ত উন্নয়নের নিম্ন অবস্থা। যৌগিক সূচকটি বিভিন্ন ব্লক স্তরে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়ন স্তরের বিশেষ বন্টন বোঝার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ কোন স্থানগুলির বেশীর ভাগই সংরক্ষণাগার ভুক্ত। উচ্চ স্তরের উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নত এবং অন্য ব্লকের তুলনায় তাদের উচ্চস্থানে অবস্থান। এই অধ্যয়নের প্রধান ফোকাস ভবিষ্যতে একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত সমর্থন পোর্টফোলিও তৈরি করা। যেকোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কোন কল্যাণ বরাদ্দের বিতরণ করা যা পরিকল্পনার সক্ষমতা এবং উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের কোন উন্নয়ন পদক্ষেপে সহায়তা করতে পারে।

গুহ এবং দাস (২০১৩-২০১৪) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের শিক্ষাগত উন্নতি সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- “Educational Advancement of Schedule Tribe in West Bengal (1947-2011)”.

গবেষকদ্বয় তাঁদের গবেষণা পত্রে খুঁজে পেয়েছেন যে শিক্ষায়ই আদিবাসী উন্নয়নের চাবিকাঠি। পশ্চিমবঙ্গে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত শিক্ষামূলক পরিকল্পনার ফলে এই রাজ্যের তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়গুলি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি

করেছে। তারপরও এখানে উল্লেখ্যে যে এই উন্নতিতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না, কারণ শিক্ষার অগ্রগতির পেছনে অনেক কারণ রয়েছে তাই এখন সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো দ্রুততার সাথে আদিবাসী সমাজকে অবগত করা যার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তফসিলি উপজাতিরা অন্তত আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য উন্নত অংশের সমতুল্য হয়ে উঠতে পারে। ১১ টি পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়েছে। তবুও আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার উন্নয়ন একেবারেই ধীর, সুতরাং শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা এবং উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও ছাড় দিয়েও কেন তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় তার কারণ খুঁজে বের করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

চক্রবর্তী, ঘোষ এবং পান্ডা (২০১৯) পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল- "Unravelling the Socio-Economic Condition of Tribal Peoples in West Bengal". এই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য গবেষকগণ নিম্নলিখিত মেথডের ব্যবহার করেছেন- (১) identification of respondent, (২) identification of Civil and economic condition, (৩) education of the respondent's response to construct the social economic condition through ranking and voting.

গবেষকগণ এই গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন যে - আদিবাসী ও উপজাতীয়দের অধিকার সারা বিশ্বে প্রায় সব ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক আন্দোলন গত কয়েক দশকে গতি লাভ করেছে ILO, এর দ্বারা পরিবর্তিত পরিবর্তনের মাধ্যমে। আদিবাসী আন্দোলন পরবর্তীকালে UNDRIPS এর সাথে একটি উল্লেখযোগ্য স্তরে পৌঁছেছে। ১৬৯ নম্বর কনভেনশন এর ৩০ বছর পর শুধুমাত্র ২৩ টি দেশ কনভেনশন টি অনুমোদন করেন।

বেশিরভাগ স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মতো ভারত এই কনভেনশনটি অনুমোদন করেনি এবং এখনো সেকেলে ILO (১০৭) নিয়ে চলেছে যা একটি ঐতিহাসিক ভুল হিসাবে সমালোচিত হয়েছিল। বেশিরভাগ দেশের মতো ভারতও UPR জমা দিতে বাধ্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত UPRS এর কোনটিতে ভারতে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে না। এই গবেষণাটিতে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। কর্মচারী,সমাজকর্মী, এনজিও পেশাদারদের কিছু উপলব্ধি ও উন্নয়ন প্রকল্প এবং জীবিকার আরো ভালো বাস্তবায়নের মধ্যে সুপারিশের একটি সেট অনুসরণ করা হয়েছে।

মল্লিক (জুলাই, ২০১১) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের উন্নতিকরার জন্য একটি গবেষণা করেন। গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল– "Tribal Development Scenario in West Bengal: A Study of Jamalpur Block of Burdwan District".

গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য গবেষক Qualitative Analysis এবং PRA মেথডের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

গবেষক গবেষণাটি করে দেখেছেন যে- পশ্চিমবঙ্গে উপজাতীয় উন্নয়ন, আদিবাসী এলাকায় কৃষি উৎপাদনে অবিলম্বে বৃদ্ধি, আদিবাসীদের মধ্যে ভূমিহীনদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সমবায় ও বিপণন কাঠামোকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং উপজাতিদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য নির্দেশিত। পরিবার ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ভূমি পুনরুদ্ধার, ভূমি উন্নয়ন, কৃষি উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি। এলাকাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে রাস্তা নির্মাণ, ক্ষুদ্র সেচ ও উত্তোলন সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি, যদিও আদিবাসীরা

ঐতিহ্যবাহী সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে উত্তরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। তারা প্রতিষ্ঠানিক শোষণ এবং সমাজিক-রাজনৈতিক প্রান্তিকতার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তারা স্বাস্থ্য সচেতন নন এবং চিরাচরিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুশীলন করেন।

আলি এবং আখতার (২০১৪-২০১৫) আদিবাসীদের লিঙ্গগত উন্নতি করণের জন্য একটি গবেষণা করেন। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- "Gender Development and The Status of Tribal Women : A Study of Tripura". গবেষকরা গবেষণা কাজটি করার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি ঠিক করেছেন - ১. আদিবাসীদের সমাজে লিঙ্গের ভূমিকার প্রতি আলোকপাত করা। ২. আদিবাসীদের উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা এবং বর্তমান অবস্থা খুঁজে বের করা। ৩. ত্রিপুরার আদিবাসী মহিলাদের প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রা পরিবর্তনের মাত্রার উপর দৃষ্টি দেওয়া।

গবেষকরা গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য বই, জার্নাল, সরকারি তথ্য, আদমশুমারি তথ্য ওয়েবসাইট প্রভৃতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষকরা গবেষণাটি করে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পেয়েছেন- ত্রিপুরায় উপজাতীয় মহিলাদের লিঙ্গ উন্নয়ন এবং অবস্থা সম্পর্কে ধারণাকে স্পষ্ট। এটা স্পষ্ট যে উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে লিঙ্গ সমতা একটা জটিল ঘটনা, যা পারিবারিক কাঠামো উর্বরতা শিশু মৃত্যু, সাক্ষরতা, লিঙ্গ অনুপাত, শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিবারের মধ্যে অর্থনৈতিক মূল্য তৈরির মতো বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষাপট সমাধান করা প্রয়োজন। ধর্ম, সংস্কৃতি এবং মূলধারা জনসংখ্যার একটি প্রকাশ। গবেষণা থেকে উপসংহারে গবেষকরা এসেছেন যে, সাধারণ উন্নয়ন কর্মসূচি লিঙ্গ বৈষম্যের মাত্রা কমানোর জন্য যথেষ্ট। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান সমীক্ষা দেখায় যে

ভারতে তফসিলি উপজাতি গোষ্ঠীর জন্য লিঙ্গ সমতাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ধারণা করা উচিত। উপজাতীয় নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সমূহ দুর্বল। আদিবাসী নারী ও আদিবাসীদের সমস্যা অনেকাংশে একই। সবশেষে গবেষকরা উপজাতীয়দের পাশাপাশি উপজাতীয় নারীদের শক্তিশালী ও ক্ষমতায়নের জন্য কিছু সুপারিশের পরামর্শ দিয়েছেন। সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি,আইনি সমর্থন, ইতিবাচক পদক্ষেপ, সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গোষ্ঠীর বিবেক এবং মানসিকতার পরিবর্তনের শক্তি দিয়ে সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন বলে গবেষকরা জানিয়েছেন। সরকারের উচিত তপশীলি উপজাতির নারীর ক্ষমতায়নে মনোযোগ দেওয়া এবং পাঁচ বছরের পরিকল্পনা জুড়ে আলাদা তহবিল বরাদ্দ করা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পুষ্টির মূল ফোকাস ভিত্তিক এলাকা নির্বাচন করা উচিত। পাশাপাশি প্রথাগত দক্ষতার উপর ভিত্তি করে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। উৎপাদিত পণ্যে মূল্য সংযোজনের জন্য নারীদের অতিরিক্ত দক্ষতাও প্রদান করতে হবে।

মজুমদার, এবং চ্যাটার্জী (ডিসেম্বর, ২০২১) পূর্ব ভারতের সমার্থক সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল- “The Cultural Dimension of Environment: Ethnoscientific Study on Santal Community in Eastern India”.

গবেষকরা গবেষণা কাজটিকে সম্পন্ন করার জন্য Qualitative Research Design দ্বারা তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন।

গবেষকগণ এই গবেষণার মাধ্যমে নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি প্রকাশ করেছেন সাঁওতালরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেশকে উপলব্ধি করেছেন। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বাধ্যতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবেশগত সম্পদ উপলব্ধি, এবং ঐতিহগত সম্পদ ব্যবস্থাপনার অনুশীলনগুলি সাঁওতালদের মধ্যে অনুশীলনের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পদ্ধতিতে গভীরভাবে প্রোথিত। সাঁওতালদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিভিন্ন উপলব্ধি ভিত্তিক এবং বহুমুখী ব্যাখ্যা দ্বারা গঠিত বলে পাওয়া গেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে সাঁওতালরা পরিবেশকে একটি সাংস্কৃতিক সত্তা হিসাবে উপলব্ধি করে এবং ব্যাখ্যা করে, যেখানে নৃবিজ্ঞানীরা পরিবেশের জ্ঞান এবং সংস্কৃতির মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করে। বেশিরভাগ পরিবেশগত উপাদানের (প্রাকৃতিক এবং নির্মিত) অপরিসীম সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছিল এবং পৌরাণিক কাহিনী এবং কুসংস্কার পূর্ণ বিশ্বাস এর সাথে যুক্ত ছিল। কিছু গবেষক পরামর্শ দিয়েছেন যে বিজ্ঞানীরা এবং নীতি নির্ধারকরা প্রায়ই জাতি কেন্দ্রিক কক্ষপথের কারণে ফলাফল গুলি প্রকাশ করেছেন সাঁওতালরা জাতি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেশগত উপলব্ধি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বাধ্যতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবেশগত সম্পদ উপলব্ধি এবং ঐতিহ্যগত সম্পদ ব্যবস্থাপনার অনুশীলন গুলি সাঁওতালদের মধ্যে অনুশীলনের বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পদ্ধতিতে গভীরভাবে প্রোথিত পৌরাণিক কাহিনী এবং কুসংস্কার পূর্ণ বিশ্বাস এদের মধ্যে রয়েছে। কিছু গবেষক পরামর্শ দিয়েছেন যে বিজ্ঞানীরা এবং নীতি নির্ধারকরা প্রায়শই জাতি কেন্দ্রিক পক্ষপাতের কারণে আদিবাসী ধারণা এবং বিশ্ব দর্শনকে প্রাসঙ্গিক এবং কুসংস্কারকে বিশ্বাসের সাথে সমতুল্য বলে মনে করেননা। যাই হোক সাঁওতাল আদিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি যা মৌখিকভাবে একটি সাংস্কৃতিক অনুশীলন হিসাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। পরিকল্পিত কর্মের জন্য পরিবেশগত

সম্পদের ব্যবস্থাপনার অনুশীলন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত একটি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে সাঁওতালদের জীবন চর্চায়। তাদের সাংস্কৃতিক শর্তযুক্ত বোঝাপড়া এবং পরিবেশের ব্যাখ্যা থেকে আদিবাসীদের বিচ্ছিন্নতা নিঃসন্দেহে তাদের সংস্কৃতির অবক্ষয় ঘটাবে। অতএব এই সমীক্ষাটি পরামর্শ দেয় যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সত্তা উন্নয়নের (বন সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সম্প্রদায় উন্নয়ন) স্বার্থে নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় একটি উপজাতির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভিত্তিক বিশ্বদর্শনকে বিবেচনা করা উচিত।

বিশ্বাস, এবং চ্যাটার্জি (২০১৮) বাঁকুড়া জেলার সাঁওতালদের লোককাহিনীর সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন গবেষণাপত্র টি শিরোনাম হল- "Folklores of Santhals Inhabiting Jaipur Forest of Bankura District, West Bengal".

গবেষকগ গবেষণাটি করার জন্য Ethnobotanical survey এর সাহায্য নিয়েছেন। গবেষকগণ গবেষণা করে নিম্নলিখিত বিষয়টি খুঁজে পেয়েছেন। এই কাজটি একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ফিল্ড ভিত্তিক সমীক্ষার। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার লোক সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত নৃতাত্ত্বিক উদ্ভিদের ডকুমেন্টেশন নিয়ে কাজ করে এলাকার ঐতিহ্যবাহী অনুশীলন কারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য ১৭ টি পরিবারের অন্তর্গত ২৫ টি উদ্বৃত্ত প্রজাতি,তাদের স্থানীয় নাম, রোগ নিরাময়, সম্পত্তির ব্যবহৃত অংশ, প্রস্তুতি এবং প্রশাসনের পদ্ধতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ঔষধি গাছের শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত ডকুমেন্টেশন এবং তাদের নৃতাত্ত্বিক ব্যবহারের ডকুমেন্টেশন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। তাদের সনাক্তকরণ এবং নামকরণে অনেক যত্ন নেওয়া হয়েছে। এই অধ্যয়নটি সংশ্লিষ্ট ঔষধি গাছে উপর গভীরভাবে অধ্যয়নের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, যার ফলাফল অনেক ভয়ঙ্কর রোগের জন্য অভিনব, ভালো এবং কার্যকর প্রতিকার প্রদান করতে

পারে। যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের বুদ্ধি ভিত্তিক সম্পত্তির অধিকার (আইপিয়ার) সুরক্ষার জন্য এই ধরনের গবেষণা কার্যকর বলে প্রমাণিত।

চক্রবর্তী, এবং পাল (সেপ্টেম্বর, ২০১৪) বীরভূম জেলার আদিবাসী মানুষদের ঔষধী গাছ এবং তার ব্যবহারের সাংস্কৃতিক জ্ঞান সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন তাঁদের গবেষণার শিরোনাম হলো- "Traditional Knowledge on Medicinal Plants used by the Tribal People of Birbhum District of West Bengal in India".

গবেষকগণ গবেষণাটি করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খুঁজে পেয়েছেন।বর্তমান গবেষণাটি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার আদিবাসীদের দ্বারা উদ্ভিদের জাতিগত ঔষধি ব্যবহারের উপর পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। উপজাতীয় ওষুধ একটি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি যা ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের প্রাথমিক ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনের জন্য অনুশীলন করা হয়। এই জেলার আদিবাসীরা প্রধানত তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বনজ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে, এবং অসুস্থতা ও রোগ নিরাময়ে ভেষজ উদ্ভিদকে ব্যবহার করে। জেলা থেকে বিভিন্ন পরিবারের মোট ৩০ টি প্রজাতির উদ্ভিদ রেকর্ড করা হয়েছে। এই উদ্ভিদ প্রজাতি বিভিন্ন সাধারণ মানুষের অসুস্থতার জন্য কার্যকর। উদ্ভিদের পৃথক অংশ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে কুড়িটি ক্ষেত্রে পাতা, ১২ টি ক্ষেত্রে বাকল, ছটি ক্ষেত্রে ফল, তিনটি ক্ষেত্রে কান্ড, দুটি ক্ষেত্রে ক্ষীর, এবং ফুল একটি ক্ষেত্রে রস এবং রাইজোম ব্যবহার করা হয়। পরিবেশে নথিভুক্ত উদ্ভিদ গুলির ট্যাক্সোনমি ভিত্তিক পরিবার, স্থানীয় বা উপজাতির নাম, ব্যবহৃত অংশ, রোগ নিরাময় প্রশাসনের পদ্ধতি ইত্যাদির সাথে তাদের বোটানিক্যাল নাম অনুসারে গণনা করা হয়েছে। ওষুধের ওপর এই লোক জ্ঞান অবিলম্বে নথিভুক্ত করা উচিত এবং এই ভেষজ ওষুধ গুলির চিকিৎসাগত

বৈধতা দেওয়া উচিত। জোর দেওয়া হয় জীব বৈচিত্রের বিলুপ্তি এড়াতে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমন বিরল ঔষধি গাছের চাষ। ঔষধি গাছের চাষে নিয়োজিত কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা, প্রধান বনাঞ্চলে ভেষজ বাগান স্থাপন, এবং বীজ ব্যাঙ্ক তৈরি করা।

মুখার্জি (এপ্রিল, ২০১৪) পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মহিলাদের শিক্ষাগত অবস্থান সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। এটির টাইটেল নাম হল- "Ignored Claims: A Focus on Status of Tribal Women Education of Santal Community of Purulia district, West Bengal, India".

গবেষক গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য Female Educational Attainment Index (FEAI), Combined Enrolment Index (CEI), Female Literacy Index (FEI) এর সাহায্য নিয়েছেন।

গবেষক গবেষণাটি থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খুঁজে পেয়েছেন- উপজাতীয় বিশ্বে বিশেষ করে উপজাতীয় মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাকে সর্বদাই কম উদ্বেগের বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ জীবিকা নির্বাহের দৈনন্দিন উপায় বজায় রাখার অতিরিক্ত চাপের কারণে। এর পাশাপাশি কিছু কুসংস্কার এবং কুসংস্কারের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা যেমন যাদুবিদ্যা উপজাতি নারী সমাজের সামগ্রিক অবস্থার আরো অবনতি করেছে। এই সমীক্ষায় প্রমাণগুলি নিশ্চিত করেছে যে অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা পুরুলিয়া জেলার নির্বাচিত সম্প্রদায়ের আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার মান খারাপের দিকে পরিচালিত করে। এই প্রসঙ্গে B. D. DANI (1979) লিখেছেন, দারিদ্র্য এবং শিক্ষার অভাব খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা তাদের মধ্যে শিক্ষার ধীর অগ্রগতির জন্য দায়ী প্রধাণ কারণ।

চাষযোগ্য জমির প্রাপ্যতা এবং অর্থনীতির অন্যান্য উৎস যেমন নৈমিত্তিক বা কৃষি শ্রম সাঁওতালদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ভালো অর্থনৈতিক পর্যাপ্ততা নিয়ে আসে। বিশেষ করে যারা তুলনা মূলকভাবে উন্নত ব্লকে বা শহরের কাছাকাছি বসবাস করে, এটি তাদের মধ্যে আরো ভালো সাক্ষরতার হার সহজতর করে। বিপরীতে সাঁওতালরা বাগমুন্ডি এবং বান্দোয়ান ব্লকের মত পশ্চাৎপদ অঞ্চলে (পশ্চিমবঙ্গের দুটি সর্বাধিক মাওবাদী প্রভাবিত ব্লক) বসবাসকারী কম অর্থনৈতিক পর্যাপ্ততার কারণে সাক্ষরতার হার তুলনামূলক ভাবে কম। তদুপরি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য, আচরণের প্রতি নীতি নির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সচেতনতা ও উপলব্ধির অভাব বস্তুবাদী বিকাশের প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে ধীর করে দেয়। রামচন্দ্রন (২০০৯) তাঁর "শিক্ষার লিঙ্গ সমতার" দিকে গবেষণায় সম্পূর্ণরূপে সরকারি নীতির উপর তাঁর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এবং লিখেছেন ভালো নীতি, কল্পনা প্রবণ কর্মসূচি, এবং প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোগ সত্ত্বেও বাস্তবতা হলো যে সেগুলি টেকসই হয় না। সামান্য সামাজিক এবং লিঙ্গ এর সামাজিক পার্থক্য দূর করতে এবং সমস্ত শিশুর ভালো মানের শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্তিকে এবং নিশ্চিত করার জন্য এবং সিস্টেমকে প্রস্তুত করার জন্য রাজনৈতিক চাপ সূক্ষ্মভাবে এটি নিশ্চিত করেছে যে পুরুলিয়া জেলার সমগ্র আদিবাসী সমাজের অর্থনীতি ও শিক্ষার সমান্তরাল বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত আদিবাসী মহিলাদের দুর্দশা এত সহজে সমাধান করা যাবে না। অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত সমৃদ্ধি উপজাতীয়তা বিবেচনা করে প্রতিকূলতা হ্রাস করার জন্য একটি ইতিবাচক এবং প্রাথমিক দিক হতে হবে।

দারিপা (২০১৮) পুরুলিয়ার আর্থসামাজিক অবস্থানের উপর একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- "Socio Economic Status of the Tribals of Purulia

District in the Post Colonial Period". গবেষক গবেষণাটি করতে গিয়ে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি ঠিক করেছেন - ১. পুরুলিয়া জেলায় মোট আদিবাসীদের সংখ্যা পরিমাপ। ২. আদিবাসীদের সাক্ষরতার হার । ৩. পুরুলিয়া জেলার আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা। ৪. পুরুলিয়া জেলার আদিবাসীদের মাতৃভাষা জানা।

গবেষক গবেষণাটি করে জানতে পেরেছেন যে ভারতে ১০.২ কোটি আদিবাসী মানুষের বাসস্থান যারা আদিবাসী নামে পরিচিত, এবং ভারতের সংবিধান "উপজাতি"কে তফসিলি উপজাতি (আর্টকেল ৩৬৬) হিসাবে মনোনীত করেছে। এই আদিবাসীরা মূলত বন ও পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করে। আদিবাসীরা ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এবং বঞ্চিত অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। ব্রিটিশ আমল থেকে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগ পর্যন্ত এই আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন উপেক্ষিত। এই আদিবাসীদের নিজস্ব একটি অনন্য জীবনধারা রয়েছে, যা আধুনিকতার দ্বারা অস্পৃশ্য। উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের যুগে তারা এখনও নিরক্ষরতা, ভয়াবহ দারিদ্র্য, অসুস্থ স্বাস্থ্য, দরিদ্র জীবিকা এবং স্বল্প আয়ের সমস্যাগুলির মুখোমুখি যা তাদের আদিম পরিস্থিতিতে বসবাস করতে বাধ্য করে। পুরুলিয়া হল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পিছিয়ে পড়া আদিবাসী জেলা। এই জেলার আদিবাসীদের রয়েছে স্বতন্ত্র প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, জীবনধারা ও ভাষা। কিন্তু এই মানুষগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে তারা দেশের সবচেয়ে দরিদ্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই জেলার আদিবাসীরা তাদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে বনজঙ্গল কে ব্যবহার করে।

ব্যানার্জি এবং অধিকারী (২০১৭) সাঁওতালদের প্রাতিষ্ঠানিক লাইব্রেরী ব্যবহারের ওপর একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- "Multiculturaism and Academic Libraries: A Case Study of Santal Tribe of West Bengal, India". গবেষকরা শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণাটি করতে গিয়ে সাক্ষাৎকার, সমীক্ষা পদ্ধতি, এবং আলোচনা পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন।

গবেষকরা তাঁদের গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন যে সাঁওতাল ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরীতে সংকোচ বা লাজুকতার শিকার হয়, ফলে তারা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য আহরণে অসমর্থ হয়। এগুলি এমন পরিস্থিতি যার মধ্যে কিছু লাইব্রেরির কর্মীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এই শিক্ষার্থীদের সাথে ক্রমাগত মিথস্ক্রিয়া দ্বারা সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারে। কতৃপক্ষ বা তাদের সহপাঠীরা তাদের মিথস্ক্রিয়ায় জড়িত করার চেষ্টা করতে পারে। যখনই তারা লাইব্রেরিতে পা রাখেন, তাদের প্রয়োজন পূরণের পর, কর্তৃপক্ষ এবং তাদের সহপাঠীরা তাদের সাথে তাদের তুচ্ছ বিষয় যেমন হোস্টেলে জীবন, বাড়িতে ফিরে জীবন, তাদের পড়াশুনা, স্কলারশিপ স্কিম ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলার জন্য তাদের সাথে কিছু সময় ব্যয় করতে পারে। গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে, এই মিথস্ক্রিয়া যা লাইব্রেরীতে তাদের প্রয়োজনের সাথে কোন সম্পর্ক যুক্ত নয়, তবে যোগাযোগের সংকোচের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাঁওতাল ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে খুবই সহায়ক। এটি ছাড়াও, এই মিথস্ক্রিয়া বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের অনুভূতি তৈরি করে থাকে যাকে সামাজিক নেটওয়ার্ক হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে যার ফলে সামাজিক মূলধন গঠন করা যায়। শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষার প্রতিবন্ধকতা একটি বাস্তব সমস্যা। যদি প্রার্থী তার তথ্যের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে না পারে, তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে তিনি ঠিক কী চান তা জানা

কঠিন হবে। শুধুমাত্র তথ্যের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে নয়, একই সাথে দুজন একই ভাষা ভাষীদের মধ্যে বন্ধন বিভিন্ন ভাষা ভাষীদের তুলনায় প্রকৃতিগত ভাবে অনেক বেশি দৃঢ় হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, গ্রন্থাগারের কর্মীরা সাঁওতালি ভাষা শেখেন - অন্তত তিনি কী বলছেন তা তাঁরা বুঝতে শিখবেন। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে, গ্রন্থাগার লাইব্রেরিতে বহুসংস্কৃতির জনগোষ্ঠীর সেবা করার চেষ্টা করে। দেখা গেছে এই সাঁওতালি ছাত্রীদের মূল স্রোতের অধ্যয়নে নিয়ে আসা এবং তাদের সাধারণ চাহিদা পূরণ করার জন্য লাইব্রেরি স্টাফ কে ক্রমাগত প্রচেষ্টা করে যেতে হবে।

পাত্র, দত্ত এবং উপাধ্যায় (২০২১) ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিক্ষাগত সচেতনতার উপর একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- "An Analysis on the Educational Awareness of Marginalized Community of Nayagram Block, Jhargram District, West Bengal". গবেষণাগণ গবেষণাটি করার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন- ১. পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাগত সচেতনতার পার্থক্য খুঁজে বের করা। ২. নবীন এবং প্রবীনদের মধ্যে শিক্ষাগত সচেতনতার পার্থক্য খোঁজা। ৩. শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে শিক্ষাগত সচেতনতার পার্থক্য খুঁজে বের করা।

গবেষকগণ তাঁদের গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়টি খুঁজে পেয়েছেন- নয়াগ্রাম ব্লক পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলির মধ্যে একটি। বর্তমান সমীক্ষাটি প্রতিফলিত করে যে শিক্ষাগত সচেতনতার স্তরে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। বর্তমান সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে তরুণ এবং বৃদ্ধদের মধ্যে শিক্ষাগত সচেতনতার ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। অর্ধ-শিক্ষিত এবং স্বাক্ষর ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অধ্যয়নটি

ইঙ্গিত করে যে অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষিত ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকে। এটি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য শিক্ষার প্রবেশাধিকারে বাধা সৃষ্টি করে। অধ্যয়ন এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি একটি সরকারি কলেজ ও একটি সরকারি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে শিক্ষাগত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিশেষ করে অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজন। স্থানীয় সাংস্কৃতিক উপাদান, ওরিয়েন্টেশন এবং সচেতনতা শিবির ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমাগত প্রচারনা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। বর্তমান তদন্ত থেকে প্রাপ্ত হিসাবে, লেখকরা নিশ্চিত করেছেন যে শিক্ষার গুরুত্ব, প্রভাব, সুযোগ-সুবিধা, সুযোগ এবং সুযোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তৃণমূল পর্যায়ে প্রণোদনা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চাকরির সুযোগ, ক্যারিয়ার গাইডেন্স সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা উচিত। সচেতনতা হল অজ্ঞতা দূর করার এবং শেষ পর্যন্ত প্রান্তিক শিশুদের তালিকাভুক্তি ও ধরে রাখার এবং ঝরে পড়ার হার রোধ করার প্রবেশদ্বার। এই দৌড়ে, এটা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে স্কুল-ছুট শিশুদের সংখ্যা প্রত্যাশিতভাবে হ্রাস পাবে। শিক্ষা আমাদের চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান দেয় এবং এটিকে আরও ভাল কিছুতে পরিবর্তন করে। এটি আমাদের জীবনে দায়িত্ব ও ক্ষমতায়নের দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করে। এটা আমাদের মতামত একত্রিত করতে সাহায্য করে এবং আমাদের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী জীবনের জিনিসগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে সাহায্য করে। শিক্ষার গুরুত্ব একজন ব্যক্তির জীবনে একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়। এটি ভবিষ্যত তৈরিতে সাফল্যের দরজা হিসাবে কাজ করে এবং একটি টেকসই জীবন নিশ্চিত করার জন্য অনেক সুযোগ তৈরি করে। সচেতনতা তৈরির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে,

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রান্তিক শিশুদের অন্তর্ভুক্তি সামাজিক অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ার দিকে একটি প্রতিশ্রুতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সামন্ত, (২০২১) পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের শিক্ষার প্রতি মনোভাব এবং সামাজিক - অর্থনৈতিক অবস্থানের ওপর একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল- "Attitude Towards Girl's Education and Socio-Economic Status of the Tribal Village in W.B".

গবেষকের গবেষণায় তথ্য এবং ফলাফলগুলি দেখায় যে গ্রামটি রাস্তা এবং রেলপথের সাথে সংযুক্ত। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল, গ্রামীণ ডাক্তার ইত্যাদির মতো ভাল স্বাস্থ্য সুবিধা হিসাবে কিছু মৌলিক সুবিধা পাওয়া যায়; সাবমার্সিবল পাম্প, নলকূপ সহ পানীয় জলের প্রাপ্যতা, স্কুল এবং কলেজ অ্যাক্সেসযোগ্য যোগাযোগের অধীনে আছে। কৃষিভিত্তিক ভিত্তিভূমির সাথে প্রতি পরিবারে গড়ে ২-৪ বিঘা চাষযোগ্য জমি রয়েছে। এলাকার লিঙ্গ অনুপাত ৫৬% (৮৭ এর মধ্যে ৪৯ জন মহিলা) জনসংখ্যায় বেশ ভাল। বয়সের পিরামিডে সর্বোচ্চ প্রাপ্তবয়স্ক গোষ্ঠী (৪১%) এবং একটি সুস্থ তরুণ গোষ্ঠী (২০%) সহ একটি ভাল অবস্থান দেখায়। অধ্যয়ন এলাকার লিঙ্গ অনুপাত প্রতি ১০০০ পুরুষে ১২৮৯ জন মহিলা, যেখানে ২০১১ সালের আদমশুমারিতে পশ্চিমবঙ্গে ৯৫০ জন এবং ভারতে ৯৪৩ জন মহিলা ছিল প্রতি ১০০০ জন পুরুষে। ১৯৬১ সালে ভারতে ৮.৫৩% আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ স্বাক্ষর এবং মোট জনসংখ্যার ২৮.৩% স্বাক্ষর ছিল। এছাড়াও দেখা যায় যে ৭৭.৫৫% আদিবাসী মহিলা স্বাক্ষর, ৭৮.৯৫% পুরুষ স্বাক্ষর। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতে যথাক্রমে ৪৯.৩৫% এবং ৬৮.৫৩% পুরুষ এবং মহিলা স্বাক্ষর। অধ্যয়ন এলাকা পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের তুলনায় ভাল স্বাক্ষরতার অনুপাত দেখায় ভারতের মোট

জনসংখ্যার স্বাক্ষরতা ৭৪.০৪% যেখানে পুরুষের স্বাক্ষরতা ৮২.১৪% এবং মহিলা ৬৫.৪৬%। সুতরাং, আদিবাসী এবং ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্বাক্ষরতার ব্যবধান কমছে। বেশি অশিক্ষিত এবং কম কলেজগামী মহিলা জনসংখ্যা সত্ত্বেও, স্কুলগামী মেয়েরা (৩৯.০৮%) ছেলেদের তুলনায় বেশি সংখ্যায় (২৪.১৪%)। তাদের পেশাগত কাঠামোতে বিপুল সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণ করে (৫৫%) বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে। এটা বোঝায় যে এমন কোন পরিবার নেই যা জ্বালানী কাঠ বিক্রির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা কৃষি শ্রম ও চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল। প্রায় ৫% পরিবার পরিষেবা খাতের উপর নির্ভরশীল, যেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ ১% এর কম। প্রায় ৬০% পরিবারের আয় ১০,০০০ এর কম। ১৪টি পরিবারের মহিলারা (৯৩.৩৩%) তাদের আয়ের ২৫% পর্যন্ত অবদান রেখে পরিবারে সহায়তা করে।যেখানে ৬.৬৭% মহিলা ২৬% থেকে ৫০% পর্যন্ত পরিবারকে সাহায্য করে।অভিভাবকদের তাদের মেয়েদের প্রতি মনোভাবের চিত্রের পর এটা স্পষ্ট যে তারা উচ্চশিক্ষা ও পছন্দের ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। বয়স ও অর্থের সীমা হিসেবে স্কুল পর্যায় পর্যন্ত তাদের মেয়েদের শিক্ষার প্রতি অভিভাবকরা আগ্রহ দেখান। মেয়েদের শিক্ষার জন্য অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করা এবং মেয়েদের স্কুলে পাঠানো, মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য ভালো। কিন্তু বাকি প্রতিক্রিয়াগুলি দেখায় যে মেয়েদের শিক্ষা অনুশীলনে স্পষ্ট লিঙ্গ পক্ষপাত রয়েছে।

মাল এবং খাতুন (২০২২) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- “The Status of Women Among the Tribal Communities of West Bengal, India”.

১৯৫০ সালের সংবিধানের (তফসিলি উপজাতি) আদেশ অনুসারে উপজাতীয় জনসংখ্যাকে ১৯৫১ সাল থেকে তফসিলি উপজাতির জনসংখ্যা হিসাবে গণনা করা হয়েছে। তারা আদিবাসী বা ভারতের আদি বসতি স্থাপনকারী এবং তারা ভারতের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী। এই গবেষণাপত্রটি সাধারণ এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠী উভয় ক্ষেত্রেই তাদের পুরুষ সমকক্ষদের সাপেক্ষে তাদের সম্প্রদায়ের উপজাতীয় মহিলাদের অবস্থার উপর আলোকপাত করে। চারটি সূচক যেমন লিঙ্গ অনুপাত, সাক্ষরতার হার, মহিলাদের সাধারণ উর্বরতার হার এবং মহিলাদের কাজের অংশগ্রহণের হার উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা এবং লিঙ্গ বৈষম্য মূল্যায়নের জন্য নেওয়া হয়। কুন্ডু এবং রাও (১৯৮৬) এর পরিবর্তিত সোফার্স বৈষম্য সূচক (১৯৭৪) লিঙ্গ বৈষম্য সনাক্ত করতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সূচকগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পিয়ারসনের পারস্পরিক সম্পর্ক সহ-দক্ষ কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। দেখা গেছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো আদিবাসী পরিবারের অর্থনৈতিক সম্পদ থাকলেও তারা প্রায়শই তাদের সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এই গবেষণাপত্রটি লিঙ্গ বৈষম্যের কারণগুলিও খুঁজে বের করে এবং লিঙ্গ বৈষম্যের সম্মুখীন ভারতে উপজাতি মহিলারা লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রশমিত করার জন্য কিছু ব্যবস্থার পরামর্শ দেয়। তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

পাত্র এবং মাল (২০২০) পুরুলিয়া জেলার গৌরাঙ্গ ডি অঞ্চলের সাঁওতালদের শিক্ষাগত অবস্থান সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন।গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- "A Study on Educational Status of Santal (Tribal) Community: A Theoretical Study on Gourangdih Gram Panchayat of Purulia (1978-2011)" .

গবেষকগণ গবেষণাটি থেকে নিম্নলিখিত বিষয়টি খুঁজে পেয়েছেন - বিখ্যাত উদারপন্থী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল একবার বলেছিলেন, "সর্বজনীন শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র কখনই সফল হতে পারে না"। প্রাচীনকালে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্য সভ্যতার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে যেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। শিক্ষার জন্য ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। ব্রিটিশ সরকার তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে কিছু ভারতীয়কে তাদের নিজস্ব কেরানি বানাতে চায়। স্বাধীনতার পর, ভারত সরকার শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার জন্য বিভিন্ন কমিটি, কমিশন এবং নিয়ম প্রণয়ন করে। প্রতিটি কমিটি ও কমিশন বলেছে, সাঁওতাল (উপজাতি) সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সাঁওতাল (উপজাতি) সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষণা করা হয়েছিল, যাতে তারা ঐতিহ্যগত শিক্ষা লাভ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার এত বছর পরেও নানা কারণে সাঁওতাল (উপজাতি) সম্প্রদায়ের মানুষ এখনো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারেনি। তবে সরকার শিক্ষার এই বৈষম্য দূর করে সবাইকে শিক্ষার ময়দানে নিয়ে আসার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সেন (২০১৮) ভারতবর্ষের আদিবাসীদের উন্নয়নের উপর একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল- “Tribal Development: A new Vision for Transforming India”.

গবেষিকা গবেষণাটি করে নিম্নোক্ত ফলাফল খুঁজে পেয়েছেন- উপজাতীয় উন্নয়নকে একটি পদ্ধতি হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে যা উপজাতীয় জনগণকে কেন্দ্রের পর্যায়ে রাখে।

আদিবাসীরা সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। যাইহোক, তারা এখনও অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যা তাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে যেমন, দারিদ্র্য, শিক্ষাগত সমস্যা, ভূমি সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, নকশালবাদ, শিশুদের শোষণ, অদক্ষ প্রশাসন এবং শাসন যা এই গবেষণাপত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রটি সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং প্রয়োগ করা বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের বিশ্লেষণ করে, যেমন, সাংবিধানিক বিধান এবং সুরক্ষা, শিক্ষাগত সুবিধা, উপজাতি উপদেষ্টা পরিষদ, আইনসভা এবং পঞ্চায়েতগুলিতে প্রতিনিধিত্ব, তফসিলি উপজাতিদের জন্য কমিশন, চাকরিতে রিজার্ভেশন, সুযোগ সুবিধা, তফসিলি ও উপজাতীয় এলাকার প্রশাসন, রাজ্যগুলিতে কল্যাণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং উপজাতি গবেষণা ইনস্টিটিউট। ভারতীয় সমাজ ও জাতির ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য ভারতের আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কীভাবে যথেষ্ট উন্নতি হওয়া উচিত তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

গোপ, বেহারা এবং রায় (২০১৭) টেকসই উন্নতির ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রকৃতিগত সম্প্রদায় কেন্দ্রিক জ্ঞানের অবদান সম্পর্কে একটি গবেষণা করেন। গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল- "Identification of Indigenous Knowledge Components for Sustainable Development among the santhal community".

গবেষকগণ গবেষণাটি করে জানতে পেরেছেন যে- আদিবাসী জ্ঞান 'প্রকৃতিগতভাবে সম্প্রদায়কেন্দ্রিক, যা প্রতিফলিত করে সাধারণত ভূমি, লোকালয় এবং সম্প্রদায়ের সাথে গভীর সম্পর্ক রেখে। আদিবাসী জ্ঞান অত্যন্ত কৌশলী, এবং তাই আদিবাসী জ্ঞানকে কোড করা এবং নথিভুক্ত করা বেশ কঠিন। এছাড়াও, আদিবাসী জ্ঞান সাধারণত বিষয়বস্তুর

মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুশীলন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আদিবাসী জ্ঞান অত্যন্ত ব্যক্তিগতকৃত, এবং সম্প্রদায়কেন্দ্রিক। অতএব, এটা প্রতীয়মান হয় যে আদিবাসী জ্ঞান সম্প্রদায় নির্দিষ্ট এবং প্রকৃতিগতভাবে ঐতিহ্যগত। অধ্যয়নের লক্ষ্য সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য আদিবাসী অনুশীলন এবং তাদের ব্যবহারের ধরণ জানা। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, গবেষকরা ব্যাপক লাইব্রেরি কাজ এবং ক্ষেত্র সমীক্ষা গ্রহণ করেন। সমীক্ষাকালে দেখা গেছে, সাঁওতাল সম্প্রদায় বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী প্রথা ব্যবহার করে থাকে। এই অনুশীলনগুলি হল ঐতিহ্যগত স্বাস্থ্যসেবা, শিশু লালন-পালন অনুশীলন, কৃষি, বাসস্থান, জল সংরক্ষণ, পশু লালন, মাছ ধরা, বন সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এই অধ্যয়নটি দেখায় যে এই অনুশীলনগুলি নির্দিষ্ট তিনটি মাত্রায় স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য উচ্চ প্রাসঙ্গিকতার অধিকারী-সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত।

পুষ্পলতা (২০১৯) ঝাড়খন্ডে বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের প্রভাব সম্পর্কে একটি গবেষণা করেন।

গবেষিকার বর্তমান অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হল ঝাড়খণ্ডের উপজাতিদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন অন্বেষণ করা। গবেষিকা পূর্ব সিংভূম এবং পশ্চিম সিংভূম থেকে আদিবাসীদের নমুনা নিয়েছেন। আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, রীতিনীতি এবং বিশ্বাস বজায় রেখে প্রাকৃতিক অবস্থায় বসবাসকারী একটি দুর্বল অংশ। তারা জমি ও রক্তকে সমজাতীয় মনে করত। তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, পরিচয় এবং তাদের অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত তাদের ধারণকৃত জমির সাথে যুক্ত ছিল। যখনই তাদের ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোন চেষ্টা

করা হয়েছিল তখনই তারা অস্থির হয়ে উঠেছিল এবং এমনকি এটিকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্রও তুলেছিল। সামাজিকভাবে ভারতীয় আদিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এখনও ঐতিহ্যে আবদ্ধ এবং একটি প্রতিকূল অবস্থানে রয়েছে। যেহেতু বিশ্বায়ন ভারতীয় অর্থনীতিকে খুব দ্রুত গতিতে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে, প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিগুলি ছাড়াই, আদিবাসী যারা ঐতিহ্যগত উপায়ে উৎপাদনের সাথে জড়িত, তাদের অসংখ্য সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে এবং এখনও একটি উন্মুক্ত অর্থনীতি প্রতিশ্রুতি দেয় এমন সুযোগগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করার জন্য।

তাই প্রয়োজন হবে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করে উপজাতিদের সমৃদ্ধ ও দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা। তাই এই উপজাতির মূল্যবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য মিডিয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। তথ্যচিত্রের আকারে উপজাতীয় মূল্যবোধের বিস্তৃত ডকুমেন্টেশনের জন্য মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি সম্পর্কে জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে। মিডিয়া তাদের ডকুমেন্টেশন এবং সংস্কৃতির উপস্থাপনার মাধ্যমে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং স্বতন্ত্রতা বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে এবং প্রচার করতে সাহায্য করবে। মিডিয়াকে অবশ্যই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে, যেমনটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে করবে। এই আকাঙ্ক্ষাটি প্রকৃতপক্ষে সরকারের দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করা হয় যখন এটি দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সাথে মিডিয়ার ভূমিকাকে সংযুক্ত করে: ভারতের মিডিয়াকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে যে এটি একটি ছোট দুর্বল সমাজের সেবা করে যা একটি স্বতন্ত্র শক্তির উপর টিকে থাকে। “সাংস্কৃতিক পরিচয়” এবং এটি অবশ্যই দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিবেশে সাংস্কৃতিক

ও সামাজিক জটিলতার প্রতি সংবেদনশীল হবে। পূর্ব ভারতের ঝাড়খণ্ডের উপজাতীয় সংস্কৃতির উপর গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল আদিবাসী সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ, উপজাতীয় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা অন্বেষণ এবং তাদের সংরক্ষণ, প্রচার এবং প্রচারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়ার জন্য।

শর্মা এবং বেরা (২০১৮) পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসীদের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। গবেষণার উদ্দেশ্য গুলি হল-

১. বাঙালী সংস্কৃতিতে আদিবাসী জনগনের ভূমিকা।

২. পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির বিবর্তন।

৩. পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী এবং আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক খোঁজা।

৪. বিশ্বায়নের আদিবাসী সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে সে সম্বন্ধে জানা।

৫. সাঁওতাল ও অনান্য আদিবাসী সংস্কৃতির জীবনচর্চা বিষয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক খোঁজা।

৬. পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনগণের সাক্ষরতা ও শিক্ষাগত স্তর খুঁজে দেখা।

৭. পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায় কতখানি কাজের মধ্যে যুক্ত রয়েছে তা বিচার করা।

গবেষণার ফলাফল হিসাবে দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল এবং অনান্য আদিবাসীদের সংস্কৃতি অনেকখানি বাঙালী সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। বাঙালী এবং আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যে গভীর ভাবে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে উভয় সংস্কৃতিতেই বহুলাংশে মিল রয়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাব আদিবাসীদের এবং বিশেষ করে তাঁদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসীদের সংস্কৃতির মধ্যে গবেষকরা

তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সাক্ষরতা বিষয়ে আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায় অনেকাংশে এগিয়ে রয়েছে।

সমস্ত ধরনের আদিবাসীই বিভিন্ন ধরনের কর্মক্ষেত্রে যুক্ত রয়েছেন। তবে বেশিরভাগ মানুষ গ্রামঞ্চলের সাধারণ কাজই অধিক পছন্দ করেন।

Buzdar and Ali (2011). Buzdar এবং Ali পাকিস্তানের আদিবাসী এলাকায় আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষার প্রতি মা বাবার মনোভাব বিষয়ে গবেষণা করেছেন। উল্লিখিত গবেষণায় গবেষণা ধর্মী প্রশ্নগুলি ছিল-

১. মেয়েদের শিক্ষার তাৎপর্যকে আদিবাসী বাবা মারা কিভাবে বিচার করে থাকেন?

২. আদিবাসী বাবা মায়েরা তাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য কিরূপ ভূমিকা পালন করতে চান?

৩. আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষার জন্য বাবা মায়েরা কিরূপ ভূমিকা পালন করছেন?

৪. আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বাবা-মার ভূমিকা কে আরও উন্নত করতে হলে সম্ভাব্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে?

Geswell (2003) এবং Bernard এর মত অনুযায়ী গবেষকরা গুণগতমান ভিত্তিক গবেষণা করে বাবা-মার আচরণ জানার চেষ্টা করেছেন। গবেষণা তে মোট ৩০ জন আদিবাসী বাবা মা এবং ৫ জন শিক্ষকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য সেমি স্ট্রাকচার ইন্টারভিউ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা তো দেখা গেছে যে আদিবাসী

বাবা-মা রা তাদের মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বাধার কারণে তারা তাদের মেয়েদের সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারেন না।

Anbuselvi and John Leeson (2015) গবেষকরা ভারতের আদিবাসীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে কেস স্টাডি পদ্ধতিতে গবেষণা করেছেন। গবেষণার উদ্দেশ্য গুলি হল -

১. ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বিষয়ে পরিবার এবং বিদ্যালয় কি কি বাধার সৃষ্টি করছে তা জানা।

২. আদিবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় সরকারের সহায়তা গুলিকে চিহ্নিতকরণ এবং তাদের ব্যবহার।

৩. আদিবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে সে বিষয়ে দিকদর্শন করানো।

বর্তমান গবেষণাটি দক্ষিণ ভারতে সংঘটিত হয়েছে এবং ২৫০ জন সরকারি বিদ্যালয়ে পাঠরত দুটি পঞ্চায়েতের আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল গুলি হল -

১. অধিকাংশ আদিবাসী ছেলেমেয়ে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করে তাই তারা শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ নিতে পারেনা।

২. আদিবাসী ছেলে মেয়েরা জানিয়েছে উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে তারা স্কুলে পৌঁছতে পারে না।

৩. বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন।

৪. অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা শহর অথবা আধা শহরে কাজ করতে চান উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার অভাব একটাগত সমস্যা ইত্যাদির কারণে শিক্ষক শিক্ষিকারা আদিবাসী এলাকায় করতে চান না।

৫. অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিশ্বাস করে যে পড়াশোনা করলে ভালো কাজের সুযোগ পাওয়া যাবে।

৬. প্রায় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী জানে যে আদিবাসীদের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী (২৫%) বিশ্বাস করে যে সরকারি আর্থিক সহায়তা পেলে তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারবে।

৭. রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে এদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন এ বিষয়েও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা সঠিক ধারণা পোষণ করে।

৮. দারিদ্র, অপুষ্টি, পেশাগত সমস্যা, চিকিৎসার অভাব ইত্যাদির কারণে আদিবাসী ছেলে মেয়েরা প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

৯. ৮% আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী জানে যে তাদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় রয়েছে।

১০. ১৩% আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী জানে যে লেখাপড়া করা কালীন তাদের জন্য ফ্রি মেডিকেল চেকআপের ব্যবস্থা রয়েছে।

Rupa Vath, R. (2016). Tribal Education: A Perspective from Below. গবেষক এই প্রবন্ধে ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন তার মতে স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সকল আইন প্রণীত হয়েছে

এমনকি যে সকল শিক্ষা কমিশন আদিবাসীদের নিয়ে পৃথকভাবে চিন্তা করেছেন তার কোনোটি আদিবাসীদের শিক্ষাগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারিনি আর এই কারণে আদিবাসী এবং ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মূল ধারার শিক্ষাগত উন্নয়নে বিশাল পার্থক্য তৈরি হয়েছে এর কারণ হিসাবে গবেষক জানিয়েছেন আধুনিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন এবং সংস্কৃতির সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নয় এই কারণে শিক্ষার দিক থেকে আদিবাসী সমাজ অনেকাংশে পশ্চাৎপদ ভারতের বর্তমান শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য একটি পদ্ধতিগত উন্নয়ন যার প্রতিফলন ঘটে থাকে সংখ্যা তত্ত্ব এবং চিত্রে আদিবাসী সমাজ পৃথকভাবে চিহ্নিত হয় না আদিবাসী সমাজ পিছিয়ে থাকলেও ও আদিবাসী সমাজের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির রৈখিক চিত্রটি সকলের সামনে উঠে আসে যার থেকে প্রতিভাতা হয় যে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটছে কিন্তু আদিবাসী সমাজের বৃদ্ধি এবং বিকাশ যে ব্যাহত হচ্ছে তা কখনোই পৃথকভাবে ভারতের শিক্ষানীতি গুলিতে উঠে আসেনা। আদিবাসী সমাজ ভীষণ ভাবে ভিন্নধর্মী। এর প্রধান কারণ প্রতিটি আদিবাসী সমাজের আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত ভিন্নতা। তাই বিশেষ কয়েকটি আদিবাসী সমাজের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটলেও অধিকাংশ আদিবাসী সমাজ শিক্ষার দিক থেকে যথেষ্ট পর্ষদ এর কারণ হিসাবে ভুলভাবে বিশ্লেষণ করা হয় যে আদিবাসীদের বুদ্ধিমত্তা কম এবং আদিবাসী সমাজ সবদিক থেকে মূল স্রোতের আধুনিক সমাজ থেকে পৃথক গবেষক এও দেখিয়েছেন যে আদিবাসী সমাজ বিশেষত বর্তমান কালের আদিবাসী ছেলে মেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী কিন্তু ভাষাগত সমস্যা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, এবং অনেক ক্ষেত্রে বাবা মায়ের শিক্ষার দিক থেকে পশ্চাৎপদতার কারণে আদিবাসী ছেলে মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়ে যেতে পারছেন না। গবেষক এখানে কেসটারী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

তিনি ৩৩৩ জন নমুনার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের নালগণ্ডা জেলার দক্ষিণ অংশ থেকে গবেষক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি আদিবাসী শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রহণ করেছেন গবেষক শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত এসেছেন যে আদিবাসী সমাজের মাদকাসক্তি যাযাবর বৃত্তি ভাষাগত সমস্যা পেশাদারিত্বের অভাব বাবা মায়ের শিক্ষার অভাব এবং সন্তানদের শিক্ষা সম্পর্কে মা-বাবার অনেকাংশে নেতিবাচক মনোভাবের কারণে আদিবাসী সমাজ শিক্ষার দিক থেকে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে।

২.৪ গবেষণার খামতি/ শূন্যস্থান চিহ্নিতকরণ:

পশ্চিমবঙ্গে যে ৪০ প্রকারের আদিবাসী রয়েছেন সাঁওতাল গোষ্ঠী তাদের মধ্যে অন্যতম। আদিবাসীদের মোট জনসংখ্যার বিচারে সাঁওতালদের সংখ্যা সর্বাধিক। তাই আদিবাসীদের উপর যে সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ এবং নৃতাত্ত্বিকরা গবেষণা করেছেন তাদের একটি বড় অংশ সাঁওতালদের বিষয়ে গবেষণাতে যুক্ত হন। গবেষিকা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপর বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীদের নিয়ে মনের গবেষণা হয়েছে যে বিষয়ে ৪৯ টি সংশ্লিষ্ট গবেষণা পত্র কে দীর্ঘকাল ধরে পাঠ করেছেন। তার অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণায় অভাব রয়েছে সেই বিষয়ে চিহ্নিত করনের চেষ্টা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপর খুব বেশি গবেষণা হয়নি এবং যা হয়েছে তাও খণ্ডিত। এই খন্ডিত চিত্রগুলিকে একত্রিত করে উল্লিখিত দুটি জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সমাজ-সাংস্কৃতিক, আর্থিক অবস্থা এবং শিক্ষার চিত্র অংকন করা সম্ভবপর নয়, কারণ সমাজ এবং সংস্কৃতি যেমন পরস্পর গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে আদিবাসী

জনগোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে, ঠিক তেমনি করে সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও একটি স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আবার সমাজ- সংস্কৃতি এবং সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা যেকোনো সমাজের বিশেষত আদিবাসী সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। অথবা এভাবেও বলা যায় যে আদিবাসী সমাজে শিক্ষার প্রকৃত অবস্থান নির্ধারিত হয় তার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা। তাই বর্তমান গবেষিকা পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সমাজের সামাজিক-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন এবং নিম্নলিখিত গবেষণার শিরোনামটি প্রস্তুত করেছেন- “পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা”।

তথ্যসূত্র (Reference): -

Guha, S., & Ismail, M.D. (2015). Socio-Cultural Change of Tribes and Their Impacts on Environment with Special Reference to Santhal in West Bengal. *GJISS*, 4(3), 148-156.

Saren, G. (2013). Impact of Globalization on the Santals: A Study on migration in West Bengal, India. *IJHSSI*, 2(7), 29-33.

Sen, M. Socio-Cultural Transformation of Santhals in Bolpur Shantiniketan of Birbhum district, West Bengal. *IJCRT*, 9(3), 3117-3126.

Paul, S. K., & Gupta, A. (2016). The Changing Cultural Pattern among the Santals of Birbhum, West Bengal. *South Asian Anthropologist*, 16 (1), 7-18.

Das, M. (2017). Economic Growth and Women Empowerment through Education: A Study on Santal at Birbhum, West Bengal. *IJEDR*, 5(3), 392-397.

Dey, A. (2015). Globalization and Change in Santhal Tribes at Paschim Medinipur (West Bengal), India. *International Journal of Scientific Reesearch*, 4(6), 37-41.

Ahmed, N., & Tattwasarananda, S. (2018). Education of Santals of Jhargram: An Ethnographic Study. *IOSR-JHSS*, 7(3), 51-58.

Ahmed, N., & Tattwasarananda, S. (2019). Mordenization and the Educated and Non-Educated Santals of Jhargram: An Ethnographic Study. *JETIR*, 6(5), 180-200.

Mishra, M. (2014). Educational Awareness of Tribal People (Santali) in Malda District, West Bengal. *IJIFR*, 2(3), 630-639.

Mondal, J. (2018). Socio-Economic Status of Tribal People Mukundapur Village West Bengal. *International Journal of Innovative Science and Research Technology,* 3(12), 354-357.

Basu, A., & Chatterjee, S. (2013). Status of Educational Performance of Tribal Students Study in Paschim Medinipur District, West Bengal, *S-Academic Journal,* 9 (20), 925-937.

Das, P. (2020). Educational Status and Dropout Rate of Schedule Tribe in West Bengal: Study on Birbhum District. *Aegaeum Journal,* 8 (8), 485-495.

Dey, A. (2015). An Ancient History: Ethnographic Study of the santhal, *International Journal of Novel Research in Humanity and Social Science*, 2 (4), 31-38.

Patra, S. & Panigrahi, N. (2018). Educational status of the Marginalised: Study among the Santals of Paschim Medinipur District West Bengal. *Journal of Social Sciences,* 57 (1-3), 22-28.

Ghosh, P. (2015). Impact of Globalization on Tribal World of West Bengal. *Arts and Social Sciences Journal,* 6 (2), 1-5.

Saha, R. (2021). Socio- Economic Condition of Tribal People: A Study on Uttar Dinajpur District of West Bengal. *IJCRT,* 9 (12), 659-661.

Das, T. (2019). Economic Condition of Central Tribe in Lakhimpur District: A Sociological Study. *IJRD,* 4(10), 123-125.

Mudi, N, R. (2018). Transformation of Social-Economic Condition of Tribal Community in Frontier Bengal: Identity Crisis and Present Scenario. *International Journal of Innovative Science and Research Technology,* 5 (10), 667-673.

Dutta, S., & Bisai, S. (2020). Literacy Trends and Differences of Schedule Tribe in West Bengal: A Community Level Analysis. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 16(1), 125-132.

Sharma, P., & Bera, S. (2018). A Comparative Study about Scheduled Tribe in West Bengal, India. *IOSR-JESTFT*, 12(2), 10-15.

Ghosh, P. (2018). Development of Education and its Impact on the Population Composition of the Tribal People of Birbhum District of West Bengal. *ASSRJ*, 5 (1), 64-82.

Ghosh, P. (2013). Development Programme and the Tribal Study on the Santal of Birbhum District. *IOSR-JAGG*, 1 (5), 35-39.

Mukherjee, S. (2014). Status of Female Education among Santal, kheria Sabar and Birho & Tribal Communities of Purulia District West Bengal, India. *Transactions*, 36 (2), 271-278.

Babu, T. B., & Brahmanandam, T. (2016). Educational Status among the Schedule Tribes Issue and Challenges. *NEHU*, 14(2), 69-85.

Garnaik, I., & Barik, Dr. N. (2012). Role of Ashram School in Tribal Education is Study of a Block in Jharsuguda District. *Orisha Review*, 85-89.

Anbuselvi, G., & Leeson, P. G. (2017). Education of Tribal Children in India: A Case Study. *IJAIR*, 4 (3), 205-209.

Talukdar, D., & Mete, J. (2021). Social Media in Changing the Culture of Tribal Community in West Bengal. *ACCESS*, 6 (5), 164-174.

Soren, D. D. L., & Mondal, S. (2019). An Analytical Study of Inter District Tribal Development of Dakshin Dinajpur district, West Bengal. *JHSSS*, 1(5), 39-52.

Guha, N., & Das, P. (2013-14). Educational Advancement of Schedule Tribes in West Bengal (1947-2011). *GJISS*, 18, 112-131.

Chakraborty, S. P., Ghosh, J., & Panda, S. (2019). Unraveling the Socio-Economic Condition of Tribal Peoples in West Bengal. *IJRTE,* 8 (4), 12317-12324.

Mallick, M. A. (2011). Tribal Development Scenario in West Bengal A Study of Jamalpur Block of Burdwan District. *IJSW,* 72(3), 315-334.

Ali, S., & Akter, T. (2014-2015). Gender Development and the Status of Tribal Women: A Study of Tripura. *A Journal on Tribal life and Culture,* 18 (2), 86-93.

Majumder, K., & Chatterjee, D. (2021). The cultural dimension of environment: Ethnoscientific study on santal community in eastern India. *IJAE*, 5 (16), 1-21.

Biswas, S., & Chatterjee, M. (2018). Folklores of Shantal Inhabiting Joypur Forest of Bankura District, West Bengal. *RJLBPCS*, 4 (6), 780-788.

Chakraborty, N, R., & Paul, A. (2014). Traditional Knowledge on Medicinal Plants used by the Tribal People of Birbhum District of West Bengal in India. *IJAEB*, 7 (3), 547-554.

Daripa, S. K. (2018). Social Economic Status of the Tribals of Purulia District in the Post colonial Period. *International Journal of Research in Social Science,* 8(2), 727-739.

Banerjee, S., & Adhikary, B. (2017). Multiculturalism and Academic Libraries: A case study of Santal Tribe of West Bengal, India. *NSOU*, 4(1), 36-44.

Patra, S., Dutta, A. K., & Upadhyay, P. (2021). An Analysis on the Educational Awareness of Marginalized Community of Nayagram Block, Jhargram District, West Bengal. *NSOU*, 4 (1), 36-44.

Samanta, S. (2021). Attitude towards Girls' Education and Socio-Economic Status of the Tribal Village in W. B. *IJCRT*, 9(1), 2624-2631.

Mal, S., & Khatun, S. (2022). The Status of Women among the Tribal Communities of West Bengal, India, *Research Journal of Humanities and Social Science.*

Patra, B., & Mal, S. (2020). A Study on Educational Status of Santal (tribal) Community a Theroitical Study on Gourangdih Gram Panchayat of Purulia (1978-2011). *International Journal of Social Science and Humanities Research*, 8 (1), 356-359.

Sen, M. (2018). Tribal Development: A New Vision for Transforming India. *IJRSR*, 9 (12, E), 30118-30121.

Gope, L., Behera, S. K., & Roy, R. (2017). Identification of Indigenous Knowledge Components for Sustainable Development among the Santal Community. *AEGAEUM*, 5(8), 887-893.

Pushpalata (2019). The Influence of Globalization over Tribal Culture, Education and Health in Jharkhand. *The International Journal of Indian Psychology*, 7 (3), 776-787.

Sharma, P., & Bera, S. (2018). A comparative study about scheduled tribes in West Bengal, India. *IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology.* E-ISSN: 2319-2402, p- ISSN: 2319-2399.

Buzdar, M. A., & Ali, A. (2011). Parent's Attitude toward Daughter's Education in Tribal Area of Dera Ghazi Khan (Pakistan). *Turkish Online Journal of Qualitative inquiry*, 2 (1), 16-23.

Rupvath, R. (2016). Tribal Education: A Perspective from Below. *South Asia Research,* 36 (2), 206-228.

তৃতীয়-অধ্যায়

তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের সম্পর্কে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ সমূহ:

৩.১ উডের ডেসপ্যাচ

৩.২ স্ট্যানলি ডেসপ্যাচ

৩.৩ হান্টার কমিশন

৩.৪ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ

৩.৫ জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এর সুপারিশ সমূহ

৩.৬ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প

৩.৭ সর্বশিক্ষা অভিযান

৩.৮ জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP-2020)

তৃতীয়-অধ্যায়

তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের সম্পর্কে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ সমূহ:

৩.১ উডের ডেসপ্যাচ:

ব্রিটিশ সরকারের বোর্ড অফ কন্ট্রোল এর সভাপতি স্যার চার্লস উড মনে করতেন যে ভারতে সার্বিকভাবে শিক্ষার বিস্তার করলে ইংরেজ সরকারের এদেশের স্থায়িত্বের কোন আশঙ্কা থাকবে না। বরঞ্চ এদেশের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজ ইংরেজদের স্থায়িত্বের পক্ষে সহায়ক হবে। তাই স্যার চার্লস উডের নির্দেশে একটি মূল্যবান শিক্ষা দলিল রচিত হয় ১৮৫৪ সালে। যেহেতু স্যার চার্লস উডের নির্দেশে এই শিক্ষা দলিল রচিত হয়েছিল তাই একে উডের ডেসপ্যাচ বলা হয়।

উডের ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে যে ব্রিটিশ সরকার এ যাবৎ ভারতবর্ষের সার্বিক জন শিক্ষার সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেননি। বরঞ্চ জনশিক্ষাকে অবহেলাই করে গেছেন। জনশিক্ষা বলতে আপামর সাধারণ মানুষের শিক্ষাকে বোঝায়। এই সাধারণ মানুষ বলতে মূলত ভারতবর্ষের তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষকে বোঝানো হয়। বাস্তবিকই ব্রিটিশ সরকার মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চ জাতির উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ এবং শক্তি ব্যয় করেছেন। ফলে সাধারণ জনগণের বিশেষত তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে। অর্থাৎ 'চুঁইয়ে নেমে আসা নীতি' (Filtration Theory) এর নিন্দা করা হয়েছে উডের ডেসপ্যাচে। উডের ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে যে সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক প্রচেষ্টা না থাকলে এই বিশাল দেশের পিছিয়ে পড়া জন সম্প্রদায়ের জন্য উন্নত গুণমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র বেসরকারি

প্রচেষ্টায় সাফল্য আসতে পারেনা। এর জন্য উডের ডেসপ্যাচ এ বলা হয়েছে প্রতিটি জেলার বিভিন্ন স্থানে সাধারণ জনগণের জন্য একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এবং এইগুলি হবে মূলত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশীয় স্কুলগুলির মান উন্নত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বিশেষত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনার জন্য এবং তাদেরকে ধরে রাখার জন্য নিয়মিত ছাত্র বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং উডের ডেসপ্যাচে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে গণশিক্ষার বিস্তারের স্বপক্ষে বলা হয়েছে। যার মধ্যে তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

৩.২ স্ট্যানলি ডেসপ্যাচ (১৮৫৭):

স্ট্যানলির শিক্ষানীতি বিষয়ক ডেসপ্যাচে উডের ডেসপ্যাচ কে সমর্থন করা হয়েছে। এবং তিনি গণশিক্ষা বিস্তারের পক্ষ গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে স্ট্যানলি পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রাথমিক শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন। ভারতের নিজস্ব দেশজ শিক্ষার ধারাকে তিনি বুঝতে পারেননি।

৩.৩ হান্টার কমিশন (১৮৪২):

হান্টার কমিশন বা ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে বলা হয়েছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্নদের ক্ষেত্রে বেতন গ্রহণের স্বপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। একইসঙ্গে শিক্ষা বোর্ড পরিকল্পিত বা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের দরজা কে সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। হান্টার কমিশন

বুঝেছিলেন জাতিভেদ প্রথার কুফল গুলিকে। তাই তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই কমিশন সুস্পষ্ট মতামত ব্যাখ্যা করেছেন।

৩.৪ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ (১৯৬৪-১৯৬৬):

ভারতের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত। তাদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ গুলি হল –

১. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার বিষয়ে যে সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেগুলিকে বহাল রাখতে হবে এবং এই সকল সুবিধাকে আরো বাড়াতে হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অনুন্নত শ্রেণি বিশেষত আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। জনবিরল অঞ্চলে বিশেষত বনাঞ্চলে আদিবাসী শিশুদের জন্য আশ্রমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৩. আদিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ও ডে স্কুল সেন্টারের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৪. তপশিলি সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা যাতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর সম্পূর্ণ করতে পারে সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

৫. তপশিলি উপজাতির শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঙ্গনে আগ্রহী করতে এবং ধরে রাখতে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাতে বহুল পরিমাণে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান করেন সে বিষয়ে

কমিশন দৃঢ় মতামত দিয়েছেন। কারণ পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর আদিবাসী ছেলে মেয়েরা অতিরিক্ত তাত্ত্বিক বিষয়কে সহজে গ্রহণ করতে এবং ধরে রাখতে পারে না।

৬. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের জন্য সংগঠন তৈরি করতে হবে। যেখানে প্রথম সাধারণ শিক্ষিত মানুষ তার দায়িত্ব নিলেও ধীরে ধীরে উদ্যোগী এবং মেধাবী যুবকদের এই কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। আদিবাসী যুবকরাই আদিবাসী এলাকায় শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকে বিকশিত করতে সমর্থ হবেন।

৭. যাযাবর এবং অর্ধ যাযাবর শ্রেনীর ছেলে মেয়েরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকার তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত উন্নয়নে সচেষ্ট হবেন।

৩.৪.১. তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী ঝাড়গ্রাম জেলার রাঙামাটিয়া গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী রাঙামাটিয়া গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়গুলির শিক্ষার ব্যাপারে সেভাবে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল না। বর্তমানেও তাই বহাল আছে। অবস্থার পরিবর্তন হয়নি বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশন প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল রাঙামাটিয়া গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। তা সত্বেও এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ অনেক দূরে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা করে হোস্টেল নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেনি যার ফলে এই গ্রামের বেশির ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে। পড়াশোনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গাইড লাইনের অভাব, এবং বেশিরভাগ ছেলেমেয়েদের ফেল করার জন্য স্কুলছুট হয়েছে। শুনশান জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য রাস্তা হওয়ার কারণে অনেক অভিভাবক তাদের মেয়েদেরকে স্কুল-কলেজে পাঠাতে চান না। গ্রামের ২৩ জন ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্রছাত্রীরা কেউই কোন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পায় না।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাবের জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। এই গ্রামে সাধারণত সবাই দিনমজুরের কাজ করে থাকেন। আয়ের বিকল্প চিন্তা ভাবনা এদের মধ্যে নেই। তবে কয়েকজন বন রক্ষা কমিটির মধ্যে আছেন।

৩.৪.২ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী ঝাড়গ্রাম জেলার বড়াশুলি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - কোঠারি কমিশনের এই সুপারিশ অনুযায়ী বড়াশুলি গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে

সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল বড়াশুলী গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেল নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেনি যার ফলে এই গ্রামের ২০-২৫ জন স্কুলে যায়। এই গ্রামে চারজন স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এবং এদের মধ্যে দুজন মহিলা আছে। সঠিক গাইডেন্স এর অভাবে অচিরেই ছেলেমেয়েরা স্কুলছুট হয়ে যায়।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্র ছাত্রীরা কেউই কোন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পায়নি।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাবের জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি।

৩.৪.৩ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় ব্লকের গাডরা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী গাডরা গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা আরও উন্নত হয়েছে।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল গাডরা গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল আছে

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে প্রভূতভাবে লক্ষ্য করা যায়। পাঁচজন স্কুলছুট আছে যারা ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর আর পড়াশোনা করেনি এবং স্কুলছুট হওয়ার কারণ হিসেবে তাদের পিতা-মাতার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শনের অভাবকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিদ্যমান।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে মানুষজন বছরে তিন থেকে চার বার একসাথে বসে আলোচনা করে।

৩.৪.৪ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর ব্লকের গগনাশুলি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী গগনাশুলি গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল গগনাগুলি গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - বিভিন্ন জায়গাতে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে হোস্টেল আছে এই গ্রামের কিছু ছেলে মেয়ে সেখানে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছে।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেছে যার ফলে এই গ্রামের ১০ জন ছেলে-মেয়ে কলেজ স্তরের শিক্ষা শেষ করেছে। ৩ জন কলেজ যাচ্ছে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্রছাত্রীরা কিছু কিছু শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পেয়েছে।

৬. সংগঠন পরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের সচেতনতা এবং ছেলেমেয়েদের সচেতনতার জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

৩.৪.৫ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনেরঅভিমত অনুয়ায়ী ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের কুড়চিবনী গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী কুড়চিবনী গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল কোঠিয়া গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - বিভিন্ন জায়গাতে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে হোস্টেল আছে এই গ্রামের কিছু ছেলে মেয়ে সেখানে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছে।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেছে যার ফলে এই গ্রামের 2 জন ছেলে ও এক জন মেয়ে কলেজ স্তরের কোর্স পাস করেছে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পেয়েছে।

৬. সংগঠন পরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের সচেতনতা এবং ছেলেমেয়েদের সচেতনতার জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

৩.৪.৬ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ১ ব্লকের কালীপুর গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী কালিপুর গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল

বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল কালীপুর গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেল নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেনি যার ফলে এই গ্রামের ২০-২৫ জন স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে। ৩ জন কলেজ ড্রপ আউট।এই গ্রামে কেউ কলেজ পাশ করেনি।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্রছাত্রীরা কিছু কিছু শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পেয়েছে।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাবের জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি।

৩.৪.৭ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনেরঅভিমত অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের পলাশী গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী পলাশী গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে

সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল পলাশী গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - বিভিন্ন জায়গাতে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে হোস্টেল আছে এই গ্রামের কিছু ছেলে মেয়ে সেখানে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছে।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেছে যার ফলে এই গ্রামের ১২ জন ছেলে-মেয়ে কলেজ স্তরের শিক্ষা গ্রহণ পাস করেছে। ৫ জন কলেজ যাচ্ছে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্রছাত্রীরা সামান্য কিছু শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পেয়েছে।

৬. সংগঠন পরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের সচেতনতা এবং ছেলেমেয়েদের সচেতনতার জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

৩.৪.৮ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর ব্লকের কোঠিয়া বেনাপুর গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল: -

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী বেনাপুর গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল কোঠিয়া গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - বিভিন্ন জায়গাতে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে হোস্টেল আছে এই গ্রামের কিছু ছেলে মেয়ে সেখানে তার সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছে।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেছে যার ফলে এই গ্রামের ১০ জন ছেলে-মেয়ে কলেজ স্তরের ডিগ্রী পাস করেছে। ৩ জন কলেজ যাচ্ছে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্রছাত্রীরা অতি সামান্য কিছু শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পেয়েছে।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের সচেতনতা এবং ছেলেমেয়েদের সচেতনতার জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

৩.৪.৯ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী ঘাটাল ব্লকের রানীর বাজার গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:-

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী রানীর বাজার গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল রানীর বাজার গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - বিভিন্ন জায়গাতে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে হোস্টেল আছে এই গ্রামের কিছু ছেলে মেয়ে সেখানে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছে।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার থাকলেও আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে এই গ্রামের ছেলে-মেয়ে সেভাবে পড়াশোনা করতে পারেনি।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - কোনও ব্যবস্থা নেই। ৩ জন কলেজ পাশ করেছে।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই গ্রামের মানুষের সচেতনতা দেখা যায় না।

৩.৪.১০ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ ব্লকের ঝাঁকড়া, কামারবান্ধি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল: -

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী কামারবান্ধি গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে কোনো সুযোগ সুবিধা পায়না। বর্তমানেও তাই চলছে।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল কামারবান্ধি গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। তা সত্বেও এই গ্রামে শুধুমাত্র অঙ্গনওয়াড়ি আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় দূরের গ্রামের স্কুলে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা করে হোস্টেল নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেনি যার ফলে এই গ্রামে ৬৮ জন ছেলে মেয়ে স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে।পড়াশোনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গাইড লাইনের অভাব, স্কুল ছুট হওয়ার

কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক সমস্যা, স্কুলের দূরত্ব, বনপথ, এবং খেলাধুলার জন্য পড়াশোনা হয় না বলেই গ্রামের মানুষের ধারণা।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা নেই।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাবের জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। এই গ্রামে সাধারণত সবাই দিনমজুরের কাজ করে থাকেন আয়ের বিকল্প চিন্তা ভাবনা এদের মধ্যে নেই। যেকোনো অনুষ্ঠানে বাড়িতে হাঁড়িয়া এবং মদ তৈরি করা হয়।

৩.৪.১১ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ ব্লকের মোহনপুর (টালিপাড়া) গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী মোহনপুর গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বৃদ্ধি হয়নি।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল মোহনপুর গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - এই গ্রামে ছাত্রাবাস বা ডে স্কুল সেন্টার নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেনি। হাই স্কুল এবং প্রাইমারি স্কুল অনেক দূরে। তাও তিনজন মাধ্যমিক পাশ করেছে।উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কেউ নেই।।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - পাওয়া যায়নি।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - এই গ্রামে কোন সংগঠন নেই।

৩.৪.১২ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী ব্লকের আসমানচক গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী পলাশী গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল আসমানচক গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - বিভিন্ন জায়গাতে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে হোস্টেল আছে এই গ্রামের কিছু ছেলে মেয়ে সেখানে সমস্ত তার সুযোগ সুবিধা পেয়েছে।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেছে যার ফলে এই গ্রামের প্রতিটি ছেলে-মেয়ে কলেজ পাস করেছে। ৪ জন ছেলে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - বেশিরভাগ ছেলেরাই মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর পড়াশোনা করেনি সচেতনতার অভাব এবং দূরদর্শিতার অভাবে। স্কুলে যে সমস্ত বাচ্চারা যায় তারা অনলাইন গেমে আসক্ত।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই গ্রামের মানুষের সচেতনতা এবং ছেলেমেয়েদের সচেতনতার জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

৩.৪.১৩ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ২ ব্লকের বুলানপুর (মোড়লপাড়া) গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী বুলানপুর গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল বুলানপুর গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেল নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটায় এই গ্রামে সবাই পড়াশুনা করে।পুরনো প্রজন্ম থেকে পড়াশুনা করার কালচার লক্ষ্য করা যায়। ডাক্তারি পড়াশোনা করছে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্রছাত্রীরা কিছু কিছু শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পেয়েছে।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন আছে।এবং এই গ্রামের মানুষের সচেতনতার জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

৩.৪.১৪ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের গোহালউড়া গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী গোহালউড়া গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল গোহালউড়া গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটু দূরে আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেল নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেনি যার ফলে এই গ্রামের ১০ জন স্কুল ছুট আছে। স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে। পড়াশোনাতে তারা আগ্রহী নয়। একজন সেনাবাহিনীতে কাজ করে তিনজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। সবাই পুরুষ, কোন মহিলা চাকরিজীবী এই গ্রামে নেই।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - কোন শিখা সহায়ক উপকরণ পাওয়া যায়নি।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাবের জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি।

৩.৪.১৫ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা-৩ ব্লকের নলবনা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী বুলানপুর গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল নলবনা গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি বিদ্যালয় থাকলেও প্রাইমারি এবং হাই স্কুল একটু দূরে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - এই গ্রামের তিনটি ছেলে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে। কিন্তু এই গ্রামে কোন ছাত্রাবাস ও ডে সেন্টার নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অঙ্গনওয়ারি স্কুল গ্রামের কাছে হলেও প্রাইমারি এবং হাই স্কুল একটু দূরে। এই গ্রামের **১৫** জন ছাত্রছাত্রী ড্রপআউট হয়েছে হাই স্কুলে এসে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে একটি মেয়ে কলেজে পড়াশোনা করে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্রছাত্রীরা কোন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পায়নি।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই।

৩.৫ জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এর সুপারিশ সমূহ:

তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতিতে নিম্নলিখিত সুপারিশ গুলি করা হয়েছে-

১. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের এলাকাগুলিতে গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। যাতে দূরত্বের কারণে তপশিলি উপজাতির শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় বিমুখ হতে না পারে।

২. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীরা তাদের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা সহ ইংরেজি ভাষাকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনা। এই কারণে এদের মধ্যে স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা অধিক, তাই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীদের যতখানি সম্ভব তাদের মাতৃভাষায় পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা যাতে আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. তপশিলি উপজাতিদের জন্য পাঠক্রম রচনা করতে হবে উপজাতীয় ভাষাতে। তাই উপজাতীয় ভাষাতে বই রচনা করতে পারলে এই সকল শিক্ষার্থীরা অধিক আগ্রহী হবে।

৪. আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় ও আশ্রমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উপরে গুরুত্ব সহকারে সুপারিশ করেছেন জাতীয় শিক্ষানীতি।

৫. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত কারণে যেহেতু উচ্চ শিক্ষায় যেতে আগ্রহী নন তাই তাদের জন্য তাদের জীবন ধারণের

প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কারিগরী শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

৬. দারিদ্র্যের কারণে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের আগ্রহ থাকলেও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ নিতে পারেনা। তাই তাদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক আর্থিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা রাখার পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে।

৭. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মেয়েরাও যাতে তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে।

৮. প্রথা বহির্ভূত এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে তপশিলি উপজাতির বয়স্কদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষত এই সকল অঞ্চলে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা কে সুপারিশ করা হয়েছে।

৯. আদিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে, আশ্রমিক বিদ্যালয়ে এবং অনান্য আদিবাসী বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও উচ্চশিক্ষিত মেধাবী আদিবাসী যুবক-যুবতীদের শিক্ষকতার চাকুরীতে বহাল করতে হবে। এতে করে একদিকে যেমন আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হবে, তেমনি আদিবাসী সমাজ বুঝতে পারবে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। এর ফলে অন্যদিকে আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথ্যার সীমারেখা এক সময় মুছে যাবে এবং পরস্পর পরস্পরের সমাজ সংস্কৃতি এবং প্রথাকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে।

৩.৫.১ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এর অভিমত অনুযায়ী রাঙামাটিয়া গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়ে এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা নিজস্ব ভাষার সাঁওতালিতে পড়াশোনা করে না।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না।শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, স্কুলের ক্ষেত্রে এখানেও কিছু ভাষাগত সমস্যা দেখা যায়। এখানে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় বেশি।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। তিনজন চাকরি করে একজন হাইস্কুলে, একজন বেসরকারি, এবং একজন নার্সিং এর কাজ করেন।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে অল্প বয়সে বিবাহের কারণে পড়াশোনা হচ্ছে না বলে গ্রামের মানুষ জানিয়েছেন।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম হলেও সেভাবে কোনও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

৩.৫.২ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী বড়াশুলি গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার সমস্যা প্রবল ভাবে সাঁওতাল শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করেছে। সাঁওতাল শিশুরা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলা শিক্ষকদের সাথে কথোপথনের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বাধা। যখন হাইস্কুলে যায় সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে তখন তারা বাংলা ভাষা কিছুটা রপ্ত করতে পারে।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়নি।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

৭. নারী শিক্ষা: - সরকারি স্কিম সম্পর্কে এই গ্রামের মানুষের কাছে তেমন তথ্য নেই বা সেই সম্পর্কে তারা ততটা আগ্রহী নন। কারণ তারা শিক্ষিত না হওয়ার জন্য নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন। এই গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে মেয়েরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়না।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম হলেও সেভাবে কোন প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

৩.৫.৩ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী গাডরা গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি অলচিকি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।গ্রামের কিছু ছেলে মেয়েরা এই স্কুলেই পড়াশোনা করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামে প্রাথমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক অলচিকি স্কুল আছে। বাংলা ও অলচিকি ভাষাতেই স্কুলে পড়াশোনা করে। কিন্তু শিক্ষকরা সাঁওতাল নয়। এই গ্রামের সাঁওতালিতে এম.এ. দুজন, বি.এড. একজন এবং ডি.এল.এড. দুজন করেছে, হাইস্কুলে সাতজন পড়ে।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা বেশিরভাগ অলচিকি ভাষাতে পড়াশোনা করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাতেও পড়াশোনা করে।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় আছে।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - গ্রামে চারজন সরকারি চাকরি করে, তাদের মধ্যে একজন রেলওয়ে, একজন আপার প্রাইমারি, একজন ভেটেনারি, এবং একজন পুলিশে চাকরি করে।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে পূর্বতন প্রজন্মের মেয়েদের মধ্যে নারী শিক্ষার বিস্তার লাভ না করলেও নতুন প্রজন্মের মধ্যে নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। ছেলেদের থেকে মেয়েরা তুলনামূলক বেশি পড়াশোনা করছে।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যে যারা চাকরি করে তারা এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

৩.৫.৪ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী রানীর বাজার গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব ভাষায় অর্থাৎ সাঁওতালিতে পড়াশোনা না করলেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষা নিয়ে পড়াশুনা করাকে বেছে নেয়। এবং কোনরকম সমস্যা ছাড়াই তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না। যারা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাঁওতালি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের জন্য উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম রচনা করা হয়েছে।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা নেই। অভিভাবকদের সচেতনতায় সব মেয়েরাই বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম হলেও সেভাবে কোন প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

৩.৫.৫ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী কালীপুর গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব ভাষায় অর্থাৎ সাঁওতালিতে পড়াশোনা করে না।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে মেয়ারা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ সবাই পায়না।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম হলেও সেভাবে কোন প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

৩.৫.৬ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী বেনাপুর গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব ভাষা সাঁওতালিতে পড়াশোনা না করলেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে লেখা পড়ায় আগ্রহী এরা কোনরকম সমস্যা ছাড়াই তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না। যারা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাঁওতালি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের জন্য উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম রচনা করা হয়েছে।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা নেই। অভিভাবকদের সচেতনতায় সব মেয়েরাই বর্তমানে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম হলেও সেভাবে কোনও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল মাঝে মধ্যে বন্ধ থাকে।

৩.৫.৭ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী পলাশী গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব ভাষার সাঁওতালিতে পড়াশোনা না করলেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেছে কোনরকম সমস্যা ছাড়াই এরা কলেজ স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না। যারা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাঁওতালি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের জন্য উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম রচনা করা হয়েছে।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা নেই। অভিভাবকদের সচেতনতায় সব মেয়ারাই বর্তমানে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম হলেও সেভাবে কোনও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

৩.৫.৮ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী কামারবান্ধি গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মিড ডে মিলের সমস্যা আছে খাবারের মান ভালো নয়।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা নিজস্ব ভাষার সাঁওতালিতে পড়াশোনা করে না।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, স্কুলের ক্ষেত্রে এখানেও কিছু ভাষাগত সমস্যা দেখা যায়।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - এই গ্রামে কারিগরি শিক্ষার অভাব দেখা যায়।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - বর্তমানে চাকরির অবস্থা বেহাল বলে পড়াশুনায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছেনা।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে শিক্ষার হার খুবই কম ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার হার বেশি হলেও উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে মেয়েরা বা তাদের পরিবার অবগত নয়।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা নেই। এখানে সবাই প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করে। বয়স্করা মদ হাঁড়িয়া খায় এবং তার সাথে নতুন প্রজন্মও খাওয়া শুরু করেছে।

৩.৫.৯ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী মোহনপুর গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে বিদ্যালয় নেই। তাও গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা দূরের গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে। স্কুলে জাতিগত ভেদাভেদের কোন সমস্যা নেই।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা বাংলা ভাষাতেই পড়াশোনা করে।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - অলচিকি ভাষায় কেউ পড়াশোনা করে না।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা নেই।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে মেয়েরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়না।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষার ব্যবস্থা এই গ্রামে নেই।

৩.৫.১০ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী আসমানচক গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব ভাষার সাঁওতালিতে পড়াশোনা না করলেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাঁওতালি মাধ্যমকেই বেছে নেয়। এবং কোনরকম সমস্যা ছাড়াই তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না। যারা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাঁওতালি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের জন্য উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম রচনা করা হয়েছে।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। এই গ্রামের ১৪ জন চাকরি করছে। এদের মধ্যে একজন পশু দপ্তরে, একজন

কলেজে পার্ট টাইম শিক্ষক, তিনজন প্রাথমিক শিক্ষক, একজন রেল ইঞ্জিনিয়ার, দুইজন হাই স্কুল শিক্ষক, একজন শিক্ষা দপ্তরে, একজন আইসিডিএস, একজন স্টেশন মাস্টার, একজন ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে, একজন হসপিটালে, একজন পোস্ট অফিসের পেশার সাথে যুক্ত। দুজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীও আছেন এই গ্রামে। বর্তমানে চাকরির অবস্থা ভালো নয় বলে শিক্ষায় আগ্রহ হারাচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের আগ্রহ বেশি। অভিভাবকদের সচেতনতায় সব মেয়েরাই বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম থাকলেও সেভাবে কোন প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

৩.৫.১১ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী বুলানপুর গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব ভাষার সাঁওতালিতে পড়াশোনা করে না।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। পুরানো জেনারেশনে চারজন শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা মারা গেছেন। নতুন জেনারেশন দুজন মহিলা উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষিকা, একজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা, দুজন শিক্ষক, একজন প্রফেসর, একজন ডাক্তার, একজন এ ডি ও, তিনজন সিআরপিএফ, দুজন পুলিশ, একজন ক্লার্ক, একজন রেলে, তিনজন রেলের প্রাক্তন অফিসার, দুজন রেশন সরবরাহের কাজ করে।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার হার বেশি।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম রয়েছে এবং প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে।

৩.৫.১২ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী গোহালউড়া গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব ভাষায় অর্থাৎ সাঁওতালিতে পড়াশোনা করে না।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। ছেলেরা পড়াশোনাতে আগ্রহী নয়। পড়াশোনার থেকে বিভিন্ন জায়গায় ফুটবল, ঢালাই বল, মেলা, পরব ঘুরতে বেশি ভালোবাসে। অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো নয় এবং তাদের বাবা-মা অশিক্ষিত তাই পড়াশোনা করতে দিতে চায় না।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে মেয়ারা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ সবাই পায়না। বাড়ির কাজের জন্য মেয়েদেরকে অভিভাবকেরা স্কুলে যেতে দেন না।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম হলেও সেভাবে কোন প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

৩.৫.১৩ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপী বল্লভপুর ১ ব্লকের মাঠাসাই গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী মাঠাসাই গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলির শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সময়ের সাথে সাথে অনেক বেশি পাচ্ছে।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল মাঠাসাই গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। হাইস্কুল দূরে হলেও যাতায়াতের কোনো অসুবিধা হয় না।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেল নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেনি যার ফলে এই গ্রামের ১০-১২ জন ছাত্রছাত্রী স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে। ৫ জন ছেলেমেয়ে কলেজ পাস করেছে। বর্তমানে আরো পাঁচজন ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করছে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - মিড ডে মিল, কন্যাশ্রীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায়।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাবের জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি।

৩.৫.১৪ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী মাঠাসাই গ্রামে বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব ভাষায় অর্থাৎ সাঁওতালিতে পড়াশোনা করে না। এই গ্রামে অলচিকি স্কুল নেই।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। ৪ জন চাকরি করে। পড়াশোনার থেকে খেলাধুলায় বেশি আগ্রহী। ছেলে মেয়ে যদি স্কুলে না যায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাড়িতে এসে বাচ্চাদের খোঁজখবর নেন এবং স্কুলে নিয়ে যান। তাই পড়াশোনার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে অধিকাংশ পরিবারের মেয়ারা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়না।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম থাকলেও নির্দিষ্ট ভাবে কোন প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

৩.৫.১৫ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী নলবনা গ্রামের বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব ভাষার সাঁওতালিতে পড়াশোনা করে না।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না। গ্রামে কোন অলচিকি স্কুল নেই।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - বর্তমানে তিনটি ছেলে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা নেই। পুরানো অন্য জেনারেশন বা নতুন জেনারেশন কারুর মধ্যেই পড়াশোনা করার কোন আগ্রহ নেই। কারণ আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভালো নয়। বেশিরভাগ মানুষ মজুর খেটে দিনযাপন করে এবং কাঠবিড়ালি, খরগোশ, ইঁদুর, গোসাপ খাদ্য হিসেবে জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে খায়। মাত্র দুজন এই গ্রামে সরকারি চাকরি করে। একজন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং একজন সেনাবাহিনীতে চাকরি করে। চাষের জমি থাকলেও জল সংকটের ফলে চাষ হয় না তাই এখানে খাদ্য সংকট বেশি।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার হার বেশি।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম হলেও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার কোনও প্রসার ঘটেনি।

৩.৬ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প:

১৯৯৬- ৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের কাজ তাত্ত্বিকভাবে শুরু হয়। ১৯৯৭-৯৯ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় (বীরভূম, কোচবিহার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, উত্তরদিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই প্রসারিত হয়। এই প্রকল্পে তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের জন্য পৃথক করে কিছু বলা হয়নি। তবে সমস্ত শিক্ষার্থী যাতে প্রাথমিক শিক্ষাটুকু (পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত) সম্পূর্ণ করতে পারে এবং পরবর্তী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের

শিক্ষার বিষয়ে এখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মা-মেয়ে মেলা, লোকগান, কবিগান, ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বসাধারনের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ধারাবাহিক ভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই বিষয়ে অবগত করানো হয়েছে।

৩.৭ সর্বশিক্ষা অভিযান:

২০০২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে সর্বশিক্ষা অভিযানের কাজ শুরু হয়। সর্বশিক্ষা অভিযানেও তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত নয়। তবে পশ্চাৎপদ অঞ্চল গুলিতে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গঠন উপযুক্ত নয় বা শিক্ষকের সংখ্যা কম রয়েছে সেই সকল ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ভবনের সংস্কার, নতুন ভবন তৈরি এবং শিক্ষক নিয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরাও অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভের সুযোগ পেয়েছে।

৩.৮ জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ (NEP 2020):

১৯৯২ সালে যে National Policy of Education বা শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়েছিল তাতে মূলত শিক্ষার সমান অধিকার ও সকলের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরে ১৯৯২ সালে এই বিগত শিক্ষানীতির সংশোধিত রূপ আনার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়। আরো পরে ২০০৯ সালে পেশ করা একটি আইনে বিগত

শিক্ষানীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটানো হয়েছিল। বিশেষত শিশুদের জন্য সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

২০২০ সালে ভারত সরকারের অধীন শিক্ষা মন্ত্রক যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশ করেন সেখানে সকলের জন্য পক্ষপাতহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে আর্থ-সামাজিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা ভৌগোলিক পরিচয়ে যারা পশ্চাদপদ রয়েছেন তাদের শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এখানেও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় বিশেষের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব দানের উপর আলোচনা করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ এর তথ্য অনুসারে তপশিলি জনজাতির শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যার ১০.৬১% (প্রাথমিক স্তরে) এবং ৬.৮% (উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে)। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি থাকা তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীর অসময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই ঝরে পড়ার প্রবণতা অধিক। এর কারণ হিসেবে NEP (2020) জানিয়েছেন যে উচ্চ গুনমান সম্পন্ন বিদ্যালয়ের অভাব রয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছাকাছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। এছাড়াও আদিবাসী মানুষদের সামাজিকতা রাজনীতি সামাজিক প্রথা ভাষাগত সমস্যা ইত্যাদিকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর না হওয়ার অন্যতম কারণ বলে জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) তে স্বীকার করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে অতীত কাল থেকে সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত তপশিলি উপজাতি ভুক্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজ কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিখন ফলাফলের বাধা গুলিকে অতিক্রম করানো বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে

তপশিলি উপজাতি শ্রেণীভুক্তদের শিক্ষার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আবার তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শিশুরা চিরাচরিত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সেজন্য এরা প্রায়শই স্কুল শিক্ষাকে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগতভাবে তাদের জীবনে অপ্রাসঙ্গিক ও বিদেশী বলে মনে করে। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বাস্তবভিত্তিক এবং সময়োচিত ব্যবস্থা নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এরই সাথে আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলিকে গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়টিকে নিশ্চিত করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দানের কথা বলা হয়েছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিশেষত মেয়েদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য কোন্ কোন্ পদক্ষেপ গ্রহণ বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে সে বিষয়ে গবেষণার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন আদিবাসী ছেলে মেয়েরা গ্রাম থেকে অনেক দূরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাতায়াত করে প্রায়শই দীর্ঘ জঙ্গল পথ অতিক্রম করে। তাই তাদের জন্য সাইকেলের ব্যবস্থা করা, দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করা এবং তাদের জন্য ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এদের জন্য প্রয়োজনে বুদ্ধিদীপ্ত এবং এগিয়ে থাকা সহপাঠীদের দ্বারা পাঠদান, মুক্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থা, উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং যথার্থ প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অরণ্য সঙ্কুল পাহাড়ের উপর বা পাহাড়ের তলদেশে যে সকল আদিবাসী মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করছেন, তাঁদের এলাকায় তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ছাত্র-ছাত্রীর আবাস যুক্ত বনবাসী বিদ্যালয় স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া। এর লক্ষ্য হল এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব চেনা পরিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন না করে তাদের বসবাসের সমপরিবেশে শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে ভাববে না। সুতরাং এদের শিক্ষার জন্য সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে হলে গবেষণার ফলাফল ভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

আদিবাসী শিক্ষার্থীরা এমনকি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও মূল স্রোতের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দ্বারা বর্জন ও বৈষম্যের সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সামাজিক মাধ্যমে এ বিষয়ে অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরবার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই অধিক পিছিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এমনকি যৌন লাঞ্ছনারও সম্মুখীন হয়। তাই আদিবাসী ছেলেমেয়েদের বিশেষত মেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে কর্মক্ষেত্র এবং বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থায় সুরক্ষিত রাখার গুরুদায়িত্বের কথা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করা হয়েছে। আবার আদিবাসী মেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা, কর্মক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক ও সম্প্রদায়গত সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব দান করতে না পারলে এদের পরিবারের ছেলেদেরকে শিক্ষাঙ্গনে আনা কঠিন হবে। তাই আদিবাসী মেয়েদের উচ্চশিক্ষা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দান সমাজের প্রয়োজনেই গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ন্যায় আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নবোদয় বিদ্যালয়ের ধাঁচে নিশুল্ক ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস তৈরির উপর, এবং ছাত্রাবাসে এ সকল শিক্ষার্থীদের বিশেষত মেয়েদের সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) তে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার এই সকল আদিবাসী শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে যাতে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণের উপরও গুরুত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উন্নত গুনমানের শিক্ষাদানের লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল গুলিতে জওহর নবোদয় বিদ্যালয় বা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করার উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তপশিলি উপজাতির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিকাশে বৈষম্য হ্রাস করার উপর গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। এমনকি এজন্য ফি মুকুব করা, ছাত্রাবাস তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে NCC Wing খোলার জন্য বলা হয়েছে। এর ফলে উপজাতি শিক্ষার্থীদের "স্বাভাবিক প্রতিভা ও অনন্য ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে এবং তারা প্রতিরক্ষা বাহিনীতে সফল কেরিয়ারের জন্য উৎসাহিত হবে" (জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-পৃঃ ৩০)। উপজাতি শিক্ষার্থীদের জন্য যত রকমের বৃত্তি, সুযোগ সুবিধা ও স্কিমের ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলিকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একত্রে ঘোষণা করতে হবে। যাতে তারা One Window System এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারে। সর্বোপরি শিক্ষক,শিক্ষিত সমাজকর্মী ও মনোবৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতার সহায়তায় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নতুন স্কুল সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীল

করা হবে। এবং প্রয়োজনে তাদের জন্য পাঠক্রমে কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে। এর জন্য উল্লিখিত শিক্ষাঙ্গনে উল্লিখিত মানব সম্পদের বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে অন্তর্ভুক্তি ও সাম্যতার পাঠ শিক্ষক শিখনের অন্যতম আচরণীয় দিক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্ত স্তরের সমতার প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যা পূর্বে অন্য কোন শিক্ষা কমিশন বা জাতীয় শিক্ষানীতিতে কখনোই বলা হয়নি।

বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা লক্ষ্য করেছেন যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সেই রকমের শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট তাদের ছেলেমেয়েদের পঠন পাঠন কে পছন্দ করেন, যাঁরা সাঁওতাল সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শহর থেকে আসা উঁচু জাতের শিক্ষক শিক্ষিকারা সাঁওতাল গ্রামগুলির সন্নিহিত অঞ্চলের স্কুলগুলিতে কাজ করেন চাকুরীর বাধ্যবাধকতা থেকে। কিন্তু এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে তাদের কোন আগ্রহ থাকে না। তাই জাতীয় শিক্ষানীতি কে NEP (2020) এর প্রেক্ষাপটে বাস্তব রূপ দিতে হলে আদিবাসী ছেলেমেয়েদেরকে আদিবাসীদের শিক্ষায় আরো বেশি করে নিযুক্ত করতে হবে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা যাতে সাঁওতালি ভাষায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় তার জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভাষাগত বৈষম্য দূর হলে বেশিরভাগ আদিবাসী(সাঁওতাল) ছাত্র, ছাত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অকালে ঝরে পড়বে না বলে বর্তমান গবেষিকাকে জানিয়েছেন বিভিন্ন গ্রামের

বয়স্ক অভিভাবকরা। এছাড়াও আদিবাসীদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি, পাঠক্রম, মূল্যায়ন ইত্যাদি নিয়ে নিরন্তর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদিও আদিবাসীদের বিষয়ে বিশেষ কোনো গবেষণা এখনো পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। আবার যে সকল গবেষণা হয়েছে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডাটা ভিত্তিক। কিন্তু NEP (2020) এই বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যায় গুণগত মানসম্পন্ন একাডেমিক গবেষণার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কেবলমাত্র শিক্ষা বিজ্ঞানের গবেষণা তে আদিবাসীদের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। এই বিষয়ে শারীর শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চা, ভাষাবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান এবং জঙ্গলে প্রাপ্ত ঔষধি গাছ সমূহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আদিবাসী ভিত্তিক গবেষণা অত্যন্ত জরুরী।

যে সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এখনো নিরক্ষর তাদের জন্য সন্ধ্যাকালীন নৈশ বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা, এবং জীবনব্যাপী শিখনের (Life-Long-Learning) উপর NEP (2020) গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান গবেষণাতেও গবেষিকা লক্ষ্য করেছেন যে অধিকাংশ নিরক্ষর বা কেবলমাত্র স্বাক্ষর অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে এখনো অপারগ। আদিবাসী সম্প্রদায়ের বয়স্কদের বই পড়বার অভ্যাস বাড়িয়ে তোলার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে। এর জন্য আদিবাসী গ্রামগুলিতে ছোট ছোট পাঠাগারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এখানে থাকবে আদিবাসী ভাষায় লিখিত বই সমূহ। আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন বই, সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক পত্রপত্রিকা এমনকি টিভি চ্যানেলও ব্যবহার করে এরা যাতে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। যে সকল নিরক্ষর বয়স্ক/বয়স্কা সাঁওতাল মানুষজন নিয়মিত পাঠাগারে আসবেন এবং লেখাপড়া করবেন তাদের উৎসাহ ভাতা এর ব্যবস্থা বা টিফিনের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এছাড়াও যে সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

স্বতঃস্ফূর্তভাবে এদের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে এসে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন তাদের জন্য কিছু কিছু আর্থিক ব্যবস্থা নেওয়ার উপরে গুরুত্ব দিতে হবে।

চতুর্থ-অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি

৪.১	জনসমষ্টি
৪.২	গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থান নির্বাচন
৪.২.১	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা
৪.২.২	ঝাড়গ্রাম জেলা
৪.৩	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস
৪.৪	ঝাড়গ্রাম জেলার ইতিহাস
৪.৫	পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার অর্থনীতি
৪.৫.১	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অর্থনীতি
৪.৫.২	ঝাড়গ্রাম জেলার অর্থনীতি
৪.৬	পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার শিক্ষার ইতিহাস
৪.৭	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতি
৪.৮	ঝাড়গ্রাম জেলার সংস্কৃতি
৪.৯	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উৎসব সমূহ
৪.১০	ঝাড়গ্রাম জেলার উৎসব সমূহ
৪.১১	পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট সাঁওতালি লেখক
৪.১২	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রতিটি ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থান
৪.১৩	ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থান
৪.১৪	Sample বা নমুনা

৪.১৫ গবেষণার নকশা

৪.১৫.১ পর্যবেক্ষণ

৪.১৫.২ PRA (Participatory Rural Appraisal)

৪.১৫.৩ ফোকাস দল আলোচনা (FGD)

৪.১৫.৪ সাক্ষাৎকার

৪.১৬ গবেষণার কলাকৌশল

৪.১৬.১ তথ্য সংগ্রহের কৌশল

তথ্যসূত্র

চতুর্থ-অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি

৪.১ জনসমষ্টি বা Population:

যে কোনো ধরনের গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য জনসমষ্টির ধারণাকে সুস্পষ্ট করতে হয়। একটি জনসমষ্টি বলতে একটি বড় দলকে বোঝায়। বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা সমসত্ব জনসমষ্টিকে (Homogenous Population) গ্রহণ করেছেন। এখানে এই জনসমষ্টিতে যে নমুনা অর্থাৎ মানুষেরা রয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সাঁওতাল উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই সাঁওতালি ভাষা বোঝেন এবং এই ভাষায় কথা বলেন। সাংস্কৃতিক এবং আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যাবে এরা প্রায় সকলেই একই বৈশিষ্ট্য যুক্ত।

৪.২ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থান নির্বাচন:

বর্তমান গবেষিকা ভারতের বিভিন্ন ধরনের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল উপজাতিকে নিয়ে গবেষণা করেছেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যেমন মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, বিহার, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, প্রভৃতি স্থানে অধিক সংখ্যায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের ন্যায় সাঁওতালরাও দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পছন্দ করেন। সমগ্র ভারতের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে গবেষিকার একার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে গবেষণা কাজটি করা সম্ভব ছিল না। তাই গবেষিকা তথ্য সংগ্রহ করেছেন কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে। এ দুটি জেলা নির্বাচন করার পেছনে প্রধান যুক্তিটি হল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবথেকে বেশি সাঁওতাল উপজাতির মানুষ

থাকেন ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে। এই দুটি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গভীর জঙ্গল থাকায় এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সঙ্গে ঝাড়খন্ড রাজ্যের সীমানাগত যোগ থাকায় সাঁওতালরা ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমির উচ্চভূমি থেকে ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর এর নিম্ন ভূমিতে নেমে এসে জঙ্গল আবৃত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের যে মানুষরা রয়েছেন তারা তাদের সমাজব্যবস্থা এবং সংস্কৃতিকে মোটামুটি অপরিবর্তিতই রেখেছেন তাই তাদের সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ে জানতে পারলে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের সমাজব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এই ধারণা থেকে গবেষিকা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাকে চিহ্নিত করেছেন।

৪.২.১ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা:

ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। এই জেলাটি ২ টি লোকসভা কেন্দ্র, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঘাটাল লোকসভা নিয়ে গঠিত। পশ্চিম মেদিনীপুরে মোট **২১** টি ব্লক রয়েছে। নীচে পশ্চিম মেদিনীপুরের সমস্ত ব্লকগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল –

i. চন্দ্রকোনা-১	viii. গড়বেতা-৩	xv. নারায়নগড়
ii. চন্দ্রকোনা- ২	ix. ঘাটাল	xvi. সবং
iii. দাসপুর -১	x. কেশিয়াড়ি	xvii. পিংলা
iv. দাসপুর -২	xi. কেশপুর	xviii. শালবনি
v. ডেবরা	xii. খড়গপুর-১	xix. মোহনপুর
vi. গড়বেতা-১	xiii. খড়গপুর -২	XX. দাঁতন-I
vii. গড়বেতা-২	xiv. মেদিনীপুর	xxi. দাঁতন-II

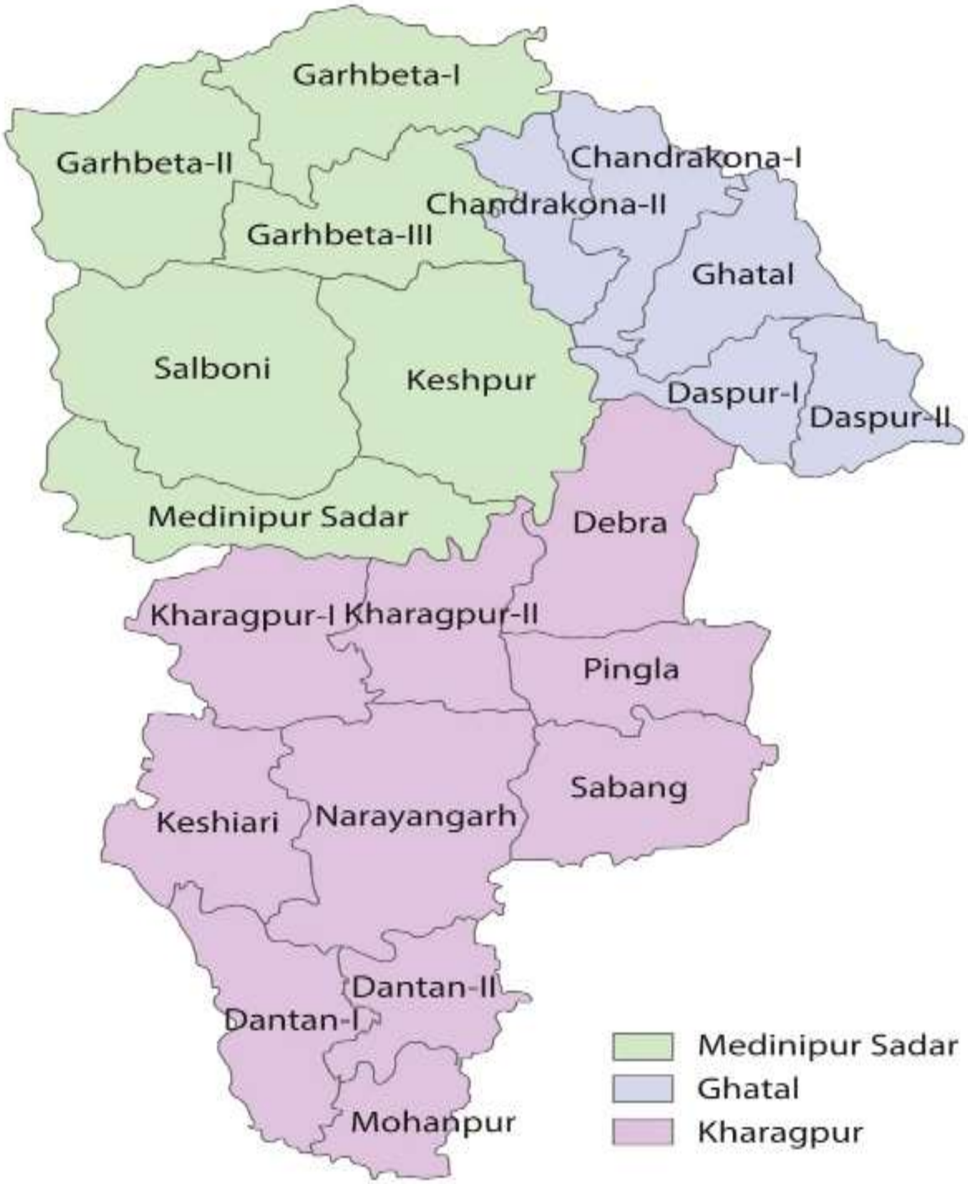

এই জেলার মোট আয়তন ৬৩০৮ বর্গকিমি (২৩৪৬ বর্গমাইল) । ২০১১ এর আদমশুমারি অনুযায়ী এই জেলার মোট লোক সংখ্যা ৪৭৭৬৯০৯ জন। প্রতি ১০০০ জন মহিলার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৯৬০ জন। এই জেলার সাক্ষরতার হার ৭৯.০৪%। এই জেলার প্রধান

ভাষা বাংলা, প্রায় ৮৬.৯০% মানুষ এই ভাষায় কথা বলে থাকেন। এই জেলায় বিখ্যাত স্বাধীনতা বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, এবং পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৪.২.২ ঝাড়গ্রাম জেলা:

ঝাড়গ্রাম জেলা হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত একটি জেলা। ২০১৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমাটি আলাদা হয়ে এই জেলাটি তৈরি হয়।

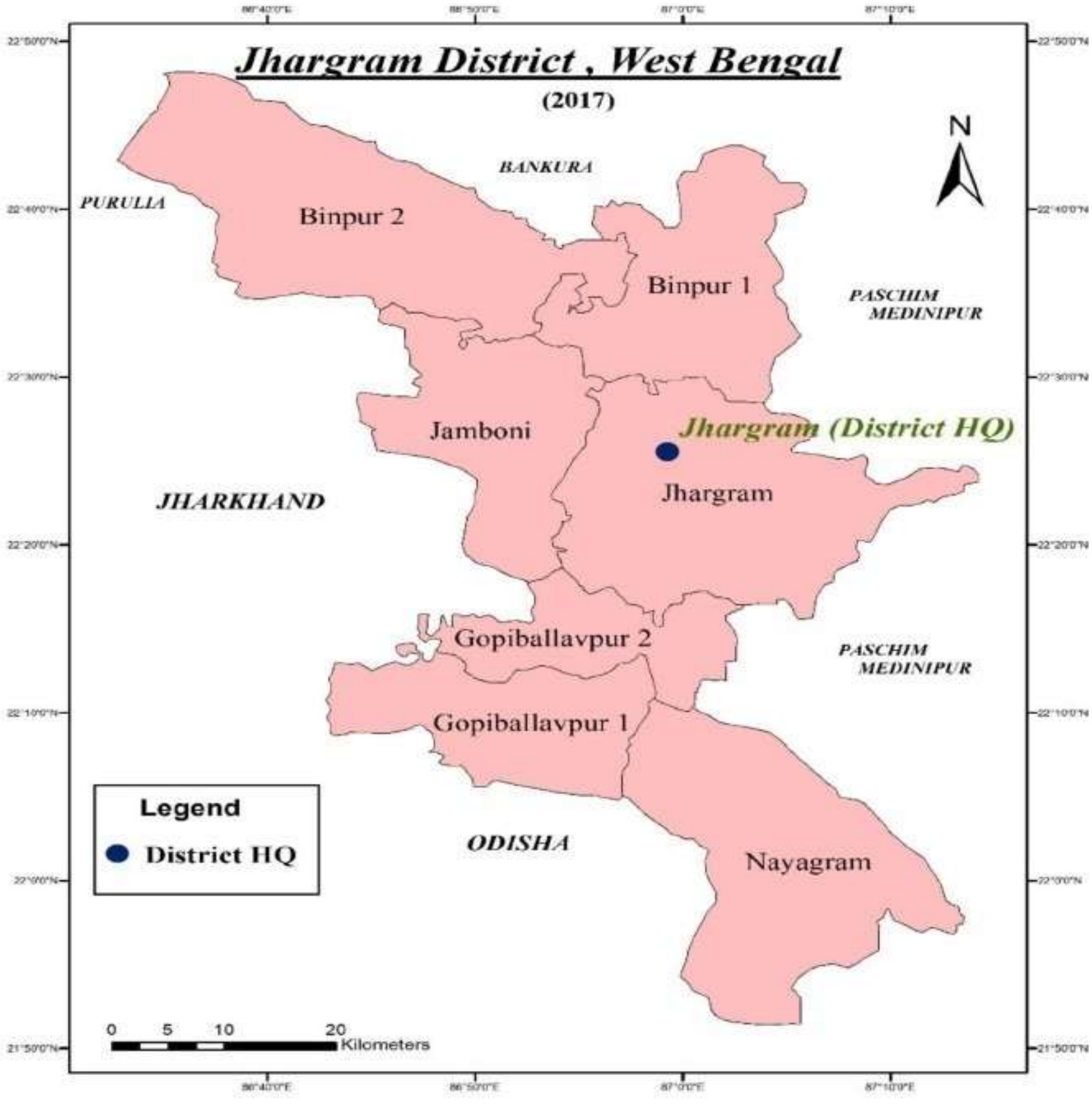

এই জেলাটি পাহাড় এবং বনভূমির জন্য বিখ্যাত। এই জেলার উত্তরে আছে কাঁকড়াঝোড় এবং দক্ষিণে আছে সুবর্ণরেখা নদী। এটি বন্যপ্রাণীদের জন্য ভালো একটি বাসস্থানের জায়গা। এই জেলার বনভূমির সৌন্দর্য এবং পাহাড় পর্যটকদের আকর্ষণ করে। ঝাড়গ্রাম জেলার জেলা সদর হলো ঝাড়গ্রাম শহর। এই জেলাটিতে একটি লোকসভা, ঝাড়গ্রাম লোকসভা। এই জেলার সমস্ত ব্লকগুলির তালিকা নিম্নে আলোচনা করা হল -

i. ঝাড়গ্রাম	v. গোপীবল্লভপুর-২
ii. বিনপুর-১	vi. জামবনি
iii. বিনপুর-২	vii. সাঁকরাইল
iv. গোপীবল্লভপুর-১	viii. নয়াগ্রাম

ঝাড়গ্রাম জেলার মোট আয়তন হল ৩০২৪.৩৮ বর্গকিমি (১১৬৭৭২ বর্গমাইল)। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ১১৩৭১৬৩ জন। এই জেলার মানুষদের স্বাক্ষরতার হার ৭০.৯২%।

৪.৩ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস:

২০০২ সালের পয়লা জানুয়ারি মেদিনীপুর জেলাটিকে পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর নামে দুটি জেলায় বিভক্ত করা হয়। বিভাজনের আগে অবিভক্ত জেলাটির লোকসংখ্যা ছিল ৯৭ লক্ষ। আয়তনের বিচারে জেলাটি ছিল ভারতের বৃহত্তম জেলা। সুইডেন সহ একাধিক দেশের লোক সংখ্যা অবিভক্ত মেদিনীপুর অপেক্ষা কম ছিল। বিভাজনের পর অবিভক্ত জেলার মেদিনীপুর সদর, খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল মহকুমাগুলিকে নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা। অবিভক্ত মেদিনীপুরের সদর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সদরে পরিণত হয়।

স্বাধীন ভারতের সরকার একাধিকবার মেদিনীপুর জেলাকে দ্বিখন্ডিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জেলা ভাগের রূপরেখা চূড়ান্ত করে বিভাজনের তারিখটি নির্দিষ্ট করে দেন। জেলা ভাগের প্রতিক্রিয়া এক এক শহরে এক এক রকম হয়েছিল। মেদিনীপুর শহরের অধিবাসীরা এই সিদ্ধান্তে হতাশ হয়েছিলেন,তাদের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল এটা ভেবে যে জেলা দ্বিখণ্ডিত হলে শহরের গুরুত্ব অনেক কমে যাবে। তবে অনেকেই এই জেলা ভাগের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তারা মনে করেছিলেন জেলা বিভক্ত হলে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা আরো সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবে। এবং চিকিৎসা ও শিক্ষা পরিষেবার মান উন্নত হবে।

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় জেলা শহর হিসাবে মেদিনীপুর শহরে গড়ে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেলা পাঠাগার। স্বাভাবিকভাবেই অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সমস্ত মানুষ তাকিয়ে থাকতেন মেদিনীপুর শহরের প্রতি। চিকিৎসার জন্য জেলার মানুষরা মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই জেলার অপরাপর মহকুমা শহর গুলিতে শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নয়ন ঘটেনি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাজ্য সরকারগুলিও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন মহকুমা শহর যেমন খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল, কাঁথি, তমলুক প্রভৃতির উন্নয়নে কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেননি। তাই স্বভাবতই মেদিনীপুর জেলাকে দ্বিখন্ডিত করায় মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীরা হতাশ হয়ে পড়েন। স্বাধীনতার সময় মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ সক্রিয় ভূমিকা নিলেও স্বাধীনতার ইতিহাসে মেদিনীপুর শহরই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে। জেলার

মানুষের মেদিনীপুর শব্দের প্রতি যে আন্তরিকতা এবং একাত্মতা তাকে মাথায় নিয়ে ২০০২ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার জেলাকে যথাক্রমে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুর এই দুই অংশে বিভক্ত করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে রয়েছে চারটি মহকুমা। যথা- মেদিনীপুর সদর, খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল মহকুমা। যদিও পরবর্তীকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কে দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় পরিণত করা হয়।

৪.৪ ঝাড়গ্রাম জেলার ইতিহাস:

২০১৭ সালে ঝাড়গ্রাম জেলা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আগে এটি ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের মহকুমা। মাওবাদী নাশকতার শক্ত ঘাঁটি হিসেবে ঝাড়গ্রাম খবরের শিরোনামে একাধিক বার উঠে এসেছে। উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে এই অঞ্চলটি পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে ভাগ হয়ে বাংলার ২২ তম জেলা হিসেবে পরিচয় পায়। ঝাড়গ্রাম শহরটি ছোট নাগপুর মালভূমির একটি অংশ। সুদীর্ঘকাল ধরে এর শাসন বজায় থাকলেও জঙ্গলমহলের আদি বাসিন্দারা তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতির মৌলিকতা সযত্নে ধরে রেখেছেন। রাজনীতি তো বটেই ইতিহাসের আঙ্গিকেও ঝাড়গ্রাম জেলা রাজ্যের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা।

ইতিহাস অনুযায়ী সম্রাট আকবর আম্বেরের রাজা মানসিংহকে দায়িত্ব দেন বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার করার। রাজা মানসিংহ জঙ্গলখন্ড নামে পরিচিত স্থানীয় উপজাতি শাসকদের পরাজিত করতে পাঠান তার সেনাবাহিনীর দুই অনুগত কর্মকর্তা সর্বেশ্বর সিং এবং তার বড় ভাইকে। সর্বেশ্বর সিং ও তার রাজপুত সেনা মিলে পরাস্ত করেন সেখানকার শাসক কে। এই

বিজয় অর্জনের জন্য প্রতি বছর মালা রাজার একটি মূর্তি তৈরি করে বিজয়া দশমীতে হত্যা করা হয়।

বাংলা জয়ের পর রাজা মানসিংহ হয়ে যান বাংলার দেওয়ান আর সর্বেশ্বর সিংহ কে ঝাড়গ্রাম এর এক বিশাল অংশ উপহার দেন। সর্বেশ্বর সিংহ এই ঝাড়খণ্ডের সূচনা করেন আর তার রাজধানীর নাম দেন ঝাড়গ্রাম। যার অর্থ অরণ্যে ভরা গ্রাম।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ঝাড়গ্রাম রাজ পরিবার বৃটিশদের কাছ থেকে তাদের স্বাধীন অবস্থান রক্ষা করার জন্য 'চৌর মুটিনি'তে অংশ নেয়। রাজা ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় তাকে। রাজস্ব প্রতিবছর মাত্র ৫০০ টাকা নির্ধারিত হওয়ার পরে ঝাড়গ্রাম ব্রিটিশদের অধীনে জমিদারি এস্টেট হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং শাসককে রাজা উপাধি দেওয়া হয়।

৪.৫ পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার অর্থনীতি:

পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলা দুটির অর্থনৈতিক অবস্থা মূলত কৃষিভিত্তিক এবং বনজ সম্পদ ভিত্তিক। দুই জেলাতেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লাল ল্যাটেরাইট মাটি রয়েছে। ফলে ওই মাটিতে শাল, সেগুন, মহুয়া, হরিতকি, আকাশমনি, বহেড়া, খেজুর, কুল ইত্যাদি গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিকাশ ও প্রজনন ভালোভাবেই ঘটে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেশিরভাগ অংশে কৃষি জমি রয়েছে। যেখানে বছরে দুইবার এমন কি তিনবারও চাষ হয়। ধান, গম, আলু চাষ ছাড়াও সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের সবজির চাষ হয়। বর্তমানে বহু সংখ্যক চাষী বিভিন্ন

ধরনের ডাল এবং সরিষার চাষ করেন। তবে ঝাড়গ্রাম জেলায় কৃষি জমির পরিমাণ অল্প হওয়ায় এবং জমিগুলি বিশেষ উর্বর না হওয়ায় এখানে বছরে একবার মাত্র ধান চাষ হয়। জলের সরবরাহ সুনিশ্চিত না থাকায় সারা বছর শস্য বা সবজি কোনটিরই চাষ সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক ভাবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তুলনায় ঝাড়গ্রাম জেলার অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রচুর পরিমাণে বনজ সম্পদ থাকলেও স্বাধীন ভারতের জঙ্গলের অধিকার নিকটবর্তী বসবাসকারী অধিবাসীদের হাত থেকে সরকারি হতে চলে যাওয়ার কারণে বনজ সম্পদ সাধারণের হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। পূর্বে জঙ্গলের কাছাকাছি থাকা সাধারণ মানুষ এবং আদিবাসী সম্প্রদায় জঙ্গলের গাছ কেটে বিক্রি করতেন এবং এর উপরে তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনেকটাই নির্ভর করত। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সমস্ত জঙ্গল সরকারের হাতে চলে যাওয়ায় কেবলমাত্র আকাঠ বা জঙ্গলের সামান্য কিছু প্রত্যক্ষ সম্পদের ব্যবহারের অধিকার সাধারণ মানুষ ভোগ করতে পারছেন।

৪.৫.১ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অর্থনীতি:

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কৃষিভিত্তিক। এছাড়াও মানুষ বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিম মেদিনীপুরের মাদুর শিল্প সমগ্র ভারতে সুপরিচিত। মাদুর শিল্প একটি কুটির শিল্প, যেখানে পরিবারের মাত্র একজন বা দুজন মিলে শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। এছাড়াও কুমোররা মাটির বাসন, হাঁড়ি তৈরি করেন।খুব প্রসিদ্ধ না হলেও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় রয়েছে তাঁতশিল্প। বিশেষত গরদের কাপড় তৈরির প্রচলন রয়েছে। ঘাটাল এবং দাসপুর ব্লকে কাঁসা ও পিতলের বাসন তৈরি হয় এবং রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে বহুল পরিমাণে বিক্রি

হয়। পিংলা ব্লকে পটুয়ারা চিত্র তৈরি করেন। যদিও এরা সংখ্যায় অনেক কম। পটচিত্র কম তৈরি হলেও এগুলোর যথেষ্ট দাম রয়েছে এবং সারাদেশে এমন কি বিদেশেও পিংলার পট শিল্পের বাজার রয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লক এ সারা বছর প্রচুর পরিমাণে জমিতে ফুলের চাষ হয়। দেশে এবং বিদেশের বাজারে চাষিরা ফুল বিক্রি করে ভালো আর্থিক উপার্জন করেন। এছাড়া গড়বেতা ব্লকের সবজি চাষ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। রেল ও সড়কপথে এখানকার সবজি নিয়মিত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এমনকি কলকাতাতে সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও নাড়াজলের লঙ্কাগড়ে প্রচুর পরিমাণে লঙ্কার চাষ হয় যা একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলের শালগাছ থেকে যে শাল পাতা তোলা হয় এবং শালপাতার দিয়ে থালা, বাটি, ঠোঙা ইত্যাদি তৈরি করা হয় তাতে কয়েক হাজার পুরুষ এবং মহিলা এখনো যুক্ত রয়েছেন, অনেকেই শালগাছের আঠা থেকে তৈরী ধুনো বিক্রি করেন অর্থাৎ শাল জঙ্গল এই সকল জঙ্গল পার্শ্ববর্তী দরিদ্র প্রান্তিক মানুষজনের অর্থকরী ক্ষেত্র। শাল জঙ্গলের মধ্যে প্রাকৃতিক ভাবে সাবুই ঘাস জন্মায়। জঙ্গল পার্শ্ববর্তী মানুষরা সাবুই ঘাস কেটে পাকিয়ে দড়ি বানান। একে বলে সাবুই ঘাসের দড়ি। এই দড়ির বাজার মূল্য যথেষ্ট রয়েছে। এছাড়াও জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে ঔষধি লতা, গুল্ম, গাছ পাওয়া যায়। প্রান্তিক দরিদ্র মানুষরা সারাদিন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঔষধি গাছ সংগ্রহ করেন এবং এগুলি বিক্রি করে তাদের সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বহু সংখ্যক নদী রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি নদী হল- দামোদর, কংসাবতী, কপালেশ্বরী, কেলেঘাই, ক্ষীরাই, দারকেশ্বর, শীলাবতী, রূপনারায়ণ, সুবর্ণরেখা ইত্যাদি। নদীগুলি সবই মধ্যগতি বা নিম্ন গতিতে থাকায় এবং সারা বছর কম বেশি

মিষ্টি জলের যোগান থাকায় নদীতে বিভিন্ন ধরনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মাছের জন্ম হয়। এর মধ্যে কেলেঘাই নদীর কালিয়া খাঁড়ি বা বড়চিংড়ি মাছ, রূপনারায়ণের ইলিশ মাছের স্বাদ এবং আকারের জন্য বিখ্যাত। স্বাভাবিকভাবে পশ্চিম মেদিনীপুরের নদীগুলির দুই দিকে বহু সংখ্যক মৎস্যজীবী জেলে পরিবার বাস করেন। বর্তমানে জেলে ছাড়াও অন্যান্য জাতির লোকেরা নদীতে নিয়মিত মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের নদীগুলি চলার পথে যে নদী খাত তৈরি করেছে সেগুলিতে স্থানীয় মানুষেরা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ঘটিয়ে, মাছ চাষ করে অর্থ উপার্জন করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে যে কাঁসাই নদী তার বালি ও গ্রাভেল ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন নির্মাণ শিল্পে এবং গ্লাস শিল্পে। তাই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষরা অনেকাংশেই এই বালি খাদান এবং গ্রাভেল কুড়ানোর কাজে নিযুক্ত। নদীর তীরে বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে ইট শিল্প। এই শিল্পের শ্রমিকের যোগান আসে মূলত পরিশ্রমী এবং সৎ বলে পরিচিত আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে। কাঁসাই নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি সবজি চাষের জন্য বিখ্যাত। নদী তীরবর্তী মানুষরা আজও নদীর মাছ ধরে সংসার নির্বাহ করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ছোটখাটো শিল্প থাকলেও বিশেষ কোনো শিল্প তৈরি হয়নি। তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানকার অর্থনীতি কৃষি, মৎস্য এবং হস্তশিল্প নির্ভর।

৪.৫.২ ঝাড়গ্রাম জেলার অর্থনীতি:

ঝাড়গ্রাম জেলার বিশেষত্ব হল রুক্ষ কাঁকর যুক্ত লাল মাটি, শুষ্ক ও চরম আবহাওয়া এবং তার দিগন্ত বিস্তৃত বনজ সম্পদ ও কিছু ছোট ছোট পাহাড় যা প্রকৃতপক্ষে ছোটনাগপুর মালভূমির শেষ অংশ বলে বিবেচিত হয়। ঘন শাল, সেগুন, মহুয়া, ইউক্যালিপটাস এবং আকাশমনির জঙ্গল, ছোট ছোট পাহাড় ও টিলা, ঝরণা এবং ঝোরা ইত্যাদি ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ঝাড়গ্রাম শহরকে কেন্দ্র করে কাঁকড়াঝোড়, বেলপাহাড়ি, গাডরাসিনি, তারাফেনী, ঘাগরা ইত্যাদি পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এই স্থানগুলিতে ছোট ছোট হোটেল এবং হোমস্টে তে সারা বছরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ঝাড়গ্রাম জেলায় জঙ্গল সাফারি সমেত হোটেল ও পর্যটন শিল্প যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে এবং এই জেলার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহযোগী হয়েছে। কাঁকড়াঝোড়ে স্লেট পাথর কেটে পাথরের থালা, বাটি, গ্লাস এবং বিভিন্ন মূর্তি তৈরি হয়। কুটির শিল্প হিসেবে যা সারা দেশের বাজারে ভালো দামে বিক্রি হয়। ঝাড়গ্রাম শহরের অদূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম লালবাজার বর্তমানে দেশ-বিদেশের ভ্রমণপিপাসু, যারা আদিবাসী সমাজের কাছে পৌঁছতে আগ্রহী তাদেরকে আকর্ষণ করছে। লালবাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এখানে প্রতিটি আদিবাসী বাড়ির চারদিকের দেওয়ালে প্রাকৃতিক রঙ দিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে। ছবিতে উঠে এসেছে জঙ্গল, জঙ্গলের পশু, পাখি, পুকুরের মাছ, আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি এবং প্রাত্যহিক জীবন চর্চা। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দেওয়ালে ছবি এঁকেছেন এলাকার আদিবাসী, এলাকার জনজাতির মানুষেরা। তারা ছবি আঁকার জন্য কোন কৃত্রিম রং ব্যবহার

করেননি। বিভিন্ন গাছের বাকল, পাতা, মাটি ইত্যাদির মিশ্রণে তৈরি হয়েছে রং। ছবিতে ফুটে উঠেছে 'আদিবাসী ঘরাণা'। তাই বর্তমানে লালবাজার তাদের দাবি উপস্থাপনা এবং জঙ্গলের শুকনো ডালপালা দিয়ে তৈরি 'কুটুম কাটুম' বিক্রি করে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে ফিরতে চেষ্টা করেছে। ঝাড়গ্রাম যেহেতু জঙ্গল ভিত্তিক স্থান তাই স্বাভাবিকভাবেই শাল গাছের পাতা এবং সাবুই ঘাস এখানকার অন্যতম অর্থকরী সম্পদ। এছাড়াও ঝর্ণা এবং পাহাড়ি নদীতে যে পাথর গড়িয়ে আসে তা সংগ্রহ করে মানুষজন অর্থ উপার্জন করে। ঝাড়গ্রাম জেলার খুব সামান্য জমি চাষযোগ্য তাই কৃষিজ সম্পদ খুব বেশি নেই। ঝাড়গ্রামকে কেন্দ্র করে বনবাংলো, রসিকানন্দের জন্ম ভিটে (রোহিনী), শ্যামানন্দর তৈরী গুপ্ত বৃন্দাবন (গোপীবল্লভপুর), তপোবন, ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান গড়ে উঠেছে। এছাড়াও সুবর্ণরেখার তীরে রামেশ্বর মন্দির, নয়াবসান, হাতিবাড়ি ও নয়াগ্রামের সুগভীর বনভূমি পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে। সুবর্ণরেখা নদীর উপত্যকা অঞ্চল নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল প্রভৃতিস্থানের আদিম মানবেরা প্রস্তর যুগে সভ্যতার পত্তন করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব দেখার জন্য প্রতিবছর বহু নৃতাত্ত্বিক গবেষক এই অঞ্চলে ভিড় জমান।

৪.৬ পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার শিক্ষার ইতিহাস:

মানব সংস্কৃতির উষালগ্ন থেকে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা হিসেবে মেদিনীপুর জেলা অবস্থিত ছিল। ২০০২ সালে মেদিনীপুর জেলা বিভাজিত হয়ে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা হয়। পরে আবার ২০১৭ সালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ভেঙে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলা তৈরি হয়। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের বহু পূর্ব থেকেই মেদিনীপুর জেলায় দেশজ শিক্ষা বা দেশজাত শিক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিল। ইংরেজিতে একেই বলা হয়েছে 'Indigenous Education'. ১৮৮৩ সালের ভারতবর্ষের শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদনে দেশজ শিক্ষা বলতে বলেছেন- "দেশজ শিক্ষালয় বলতে বোঝায় সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে যেগুলি দেশীয় লোকেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এবং দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব শিক্ষালয়গুলি শুধু উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান নয় একেবারে প্রাথমিক শিক্ষালয়" (Hunter, 1883, p56-57)। সুতরাং দেশজ শিক্ষা হলো যে শিক্ষা দেশের মাটিতে স্বাভাবিক নিয়মে বিকশিত হয়েছে। ১৮৩০ সালের পূর্ব পর্যন্ত অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় অতি উন্নত গুণমানের দেশজ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, এবং সেই শিক্ষার প্রভাব পড়েছিল জেলার মানুষজনের সমাজ-সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। ১৮৩০ সালের পূর্ব পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃত ভিত্তিক বহু সংখ্যক টোল, চতুষ্পাঠী যেমন ছিল, তেমনি মুসলমান প্রধান অঞ্চলে আরবি, ফারসি ও উর্দু শিক্ষার জন্য মক্তব, মাদ্রাসা কেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই শিক্ষা তৎকালীন মেদিনীপুর জেলার জনজীবনের গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছিল। হিন্দুদের

পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী এবং মুসলমানদের জন্য যে মক্তব, মাদ্রাসা কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, এগুলি বেশিরভাগ চলতো জনগণের নিজেদের অর্থে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে।

মেদিনীপুর জেলায় দেশজ শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ ছিল সনাতন ও প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষার মধ্যে লোকশিক্ষা ছিল অন্যতম অঙ্গ। পটপটুয়া গীত, পুতুলনাচ, যাত্রা, কীর্তন, কবিগান, তরজা গান, পীরের গান, ভারত গান, রাম রসায়ন, ভাদু, টুসু, নাটক, ব্রতকথা, নাচনি নাচের নানা হিজড়ে সংগীত, লোক ক্রীড়াবিদ্যা এবং লোক চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি ভীষণভাবে জনপ্রিয় ছিল। যা সাধারণ মানুষের প্রাণের ভাষা তথা হৃদয়ের ভাষাতে রূপান্তরিত হয়। সনাতনী ও প্রথাগত শিক্ষা গুলিকে অবলম্বন করে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত আবাল বৃদ্ধ বনিতারা বেঁচে থাকবার প্রাণ বায়ু পেয়েছিলেন।

হিন্দু দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার শুরু হতো পাঠশালা দিয়ে। পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের অধীনে শিক্ষার সূচনা হতো অক্ষর পরিচয়, লেখাশেখা প্রথার মাধ্যমে। এখানে অক্ষর পরিচয় ও লেখা শেখা কথাটির অর্থ মাতৃভাষায় লেখাপড়া আর অংক শিক্ষার কথা কে বলা হয়েছে। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীগুলিতে বহুবার হাতে খড়ি ও পাঠশালার উল্লেখ পাওয়া যায় (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩০,পৃ: ৪৮)। পাঠশালা গুলিতে হাতেখড়ি, অক্ষর পরিচয় এবং লেখা শেখার পাশাপাশি নানারূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। যেমন পুকুর কাটা বা কুঁয়ো তৈরির মাপজোক, ঘর তৈরি করার মাপ যোগ ইত্যাদি (মুন্সী, আব্দুল করিম, ১৩২০, পৃ: ৮০)। তাই স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কৃষিজীবী, কারিগর, দোকানদার বা জমিদারির সেরেস্তার কর্মচারীদের ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় লেখাপড়া করত। এর পেছনে মূল

কারণ ছিল যে পাঠশালার শিক্ষা সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সংহতিপূর্ণ এক সাধারণ দেশজ শিক্ষার ধারা। মেদিনীপুর জেলাতে এই শিক্ষা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ (শরীফ আহম্মেদ, ১৯৭৬, পৃ: ২৬৬)।

দেশজ পাঠশালার শিক্ষা সম্পর্কে উইলিয়াম অ্যাডাম ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ সালে শিক্ষা কমিশনের কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করেন, তাতে বলা হয়েছে বাংলা ও বিহারের দেড় লক্ষ গ্রামের বেশিরভাগ গ্রামে একটি করে পাঠশালা ছিল। এছাড়াও গরীব পরিবারের ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য আরও এক লক্ষ পাঠশালা ছিল। (অ্যাডাম রিপোর্ট, ১৮৬৮, পৃঃ ১৮-১৯)।

অ্যাডামের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এই সময় পাঠশালা এবং টোল দুটি সম্পূর্ণ আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা ধারা চালু হয়েছিল (অ্যাডাম উইলিয়াম, ১৮৩৮, পৃ: ৫৯)। এই সমস্ত পাঠশালা তে সমস্ত ধর্মের ও বর্ণের শিশুরাই পড়তে আসতো (আচার্য পরমেশ, ১৯৭৮)। পাঠশালা এবং টোল, চতুষ্পাঠী তে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক চিরাচরিত ঐতিহ্যের অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। পাঠশালা এবং টোল চতুষ্পাঠীতে শিক্ষকতার পেশা যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জোয়ার সেই যুগে লোকায়িত সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল (আচার্য পরমেশ, ১৯৮৯ পৃ: ১৯৮)। টোল চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, চতুর্বেদ, ছয়টি বেদাঙ্গ, সাংখ্য দর্শন, বেদান্ত দর্শন, ন্যায় দর্শন, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে জ্যোতিষ, তন্ত্র শাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেওয়া হত। কোন কোন চতুষ্পাঠীতে একাধিক গুরু মহাশয় শিক্ষাদান করতেন। পঞ্চানন রায়

তাঁর দাসপুরের ইতিহাস বইতে জানিয়েছেন যে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কোন কোন গ্রামে একাধিক চতুষ্পাঠী একই সময়ে গড়ে উঠেছিল।

মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃত চর্চার প্রসিদ্ধ স্থান গুলি হল- বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বালিচক, লোয়াদা, ভেমুয়া, পিংলা, চন্দ্রকোনা, শ্রীবরা, খড়ার, বরদা, বাসুদেবপুর, ক্ষীরপাই, বীরসিংহ, জাড়া, ইড়পালা, যদুপুর প্রভৃতি।

বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলার (অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা) লালগড়, রামগড়, গোপীবল্লভপুর, চন্দ্রী, চোর্চিতা, শালবনী ও বেলিয়াবেড়া প্রভৃতি গ্রামগুলি সংস্কৃত চর্চার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রেখেছিল। তবে বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলার বেশিরভাগ অঞ্চলই অরণ্যসংকুল এবং আদিবাসী অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ প্রচার ও প্রসার ঘটেনি।

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বহু রাজ পরিবার/জমিদার পরিবার সেই কালে দেশজ শিক্ষা এবং সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এই রাজ পরিবার/ জমিদার পরিবার গুলির মধ্যে চন্দ্রকোনা, রগড়া, ঝাড়গ্রাম, জামবনি, নাড়াজোল, সবং, নারায়ণগড় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বিক্রমপুর গ্রামের অধিবাসী পন্ডিতপ্রবর নীলকমল বিদ্যানিধি, দাসপুর থানার বাসুদেবপুর গ্রামের উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ, গৌরীকান্ত

বিদ্যালংকার, রসিকগঞ্জের ঠাকুরদাস চূড়ামণি, ঘাটাল থানার খড়ারের কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাবাগিস, কেশপুর থানার যদুপুর গ্রামের গোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ সে যুগের মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃত চর্চার অন্যতম ব্যক্তিত্ব রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় মুসলমান দেশজ শিক্ষার ধারা হিসেবে প্রাথমিক স্তরে মক্তব ও মাধ্যমিক স্তরে মাদ্রাসার সংখ্যা যথেষ্ট ছিল (বসু, অনাথনাথ, ১৯৪১, পৃ: ৫০-৫১) । মুসলমান শিশুরা মক্তবে বিসমিল্লাহ সংস্কার বা মক্তব সংস্কারের মাধ্যমে চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে মক্তবে শিক্ষা লাভ শুরু করত (হার্বলটস, ১৯২১, পৃঃ ৪৩) । বিসমিল্লার সংস্কারের পর মুসলমান ছেলেমেয়েদের কোরান মুখস্থ করা এবং নমাজ ও জুলেখা ছিল প্রাত্যহিক কাজ।

মক্তব একটি সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যেটি মসজিদ সংলগ্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল এবং সম্ভবত প্রাক ইসলামিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা (আনরওয়াল এবং বিশ্বাস, ১৯৭১, পৃঃ ৯৫) । মক্তব এবং মাদ্রাসা চলত মসজিদের সম্পত্তির আয় থেকে অথবা রাজা জমিদারদের দেওয়া লাখেরাজ জমির আয়ের উপর নির্ভর করে (বসু, অনাথনাথ, ১৯৪১, পৃ ৬-৯, ৫৯; আচার্য, পরমেশ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৫) ।

১৮৩৫ সালের পরবর্তীতে দেশজ মক্তব, মাদ্রাসা, টোল, চতুষ্পাঠী পাঠশালার বিস্তার ক্রমশ কমে যায় কারণ ইংরেজরা দেশজ শিক্ষালয় গুলিকে খানিকটা যান্ত্রিক ও প্রাণহীন করে নতুন ইংরেজি শিক্ষার আমদানি করেন। ইংরেজি শিক্ষা দেশের চিত্তস্রোতকে যেমন নাড়া দিয়েছিল তেমনি দেশের ভিতর থেকে গুণীজনেরা ভাবিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন (গোস্বামী হরিসাধন, ১৮৮৯, পৃষ্ঠা ১৭৯-১৯১)। সমগ্র বাংলাদেশে তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে

ইংরেজদের মাধ্যমে দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমান্বয়ে যে বিবর্তন ঘটেছে মেদিনীপুর জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সেই একই বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় (সিং ,অমৃক, ১৯৯০)। মেকলে মিনিট, উডের ডেসপ্যাচ, ভারতবর্ষ তথা মেদিনীপুর জেলার দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দিয়ে স্থানীয় প্রচেষ্টা ও স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারের প্রয়োগ করে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেন (গোস্বামী হরিসাধন, ১৯৮১, পৃ:৮-১০)।

ইংরেজ আমলে মেদিনীপুর জেলা ইংরেজদের প্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছিল। কারণ জনসাধারণের মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্হার সাংগঠনিক ও পরিচালনার ত্রুটির জন্য অনেকাংশে অভিভাবকদের অনাগ্রহ, পারিবারিক কাজকর্মে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত অংশগ্রহণ, শিক্ষকদের মধ্যে উদ্দীপনার অভাব, বিদ্যালয়ের গঠনগত ত্রুটি, ও বিভিন্ন প্রকার অসামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত সংগতির অভাব (গোস্বামী হরিসাধন, ১৯৮4, পৃ: ১৬৮)। ক্রমশ প্রাক্ব্রিটিশ আমলের দেশজ ব্যবহারিক শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় মেদিনীপুর জেলাতেও ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক স্কুলের প্রচার ও প্রসার ঘটে।

প্রাক্ বৃটিশ পর্বে হিন্দু এবং মুসলমানদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা, পৃথক দেশজ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা করে কোন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায় না। আদিবাসী সম্প্রদায় সম্ভবত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পরবের মধ্য দিয়ে বংশপরম্পরায় অপ্রথাগত শিক্ষার ব্যবস্থা রক্ষা করে গেছেন। বিভিন্ন পরবকালে নৃত্য, গীত ইত্যাদির মাধ্যমে লোককথা বংশপরম্পরায় নিত্য বহমান ছিল এবং আজও রয়েছে। চিরাচরিতভাবে দেশজ

পদ্ধতিতে আদিবাসীরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার শিকড়, লতা পাতা ব্যবহার করে নিজেদের রোগব্যাধির চিকিৎসা করতেন। এই লোক চিকিৎসাবিদ্যা মেদিনীপুর জেলার আদিবাসী সমাজের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল এবং এর কিছু কিছু অস্তিত্ব এখনো বর্তমান। মেদিনীপুর জেলায় লোক চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে কিছু কিছু পদ্ধতি আজও চালু রয়েছে, যেমন- ঝাড়ফুঁক, ভেষজ বা টোটকা চিকিৎসা, বানমারা, তুকতাক, ফুসমন্তর, কুনজর, বাটিচালা ইত্যাদি। লোক চিকিৎসা বিদ্যার সহায়তায় হাজার হাজার বছর ধরে আদিবাসী সমাজ নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখলেও বর্তমানে তারা সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার উপরেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। আদিবাসীদের লোকচিকিৎসা বিদ্যা লোকশিক্ষার একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল। এই পদ্ধতিতে প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রেখে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল মানুষ দীর্ঘায়ুর অধিকারী হয়েছেন।

বর্তমান সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলা যথেষ্ট উন্নত। দুটি জেলাতেই স্থাপিত হয়েছে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয়, বহুসংখ্যক ডিগ্রী কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নার্সিং ট্রেনিং কলেজ এবং একটি করে মেডিকেল কলেজ। স্বাভাবিকভাবেই আদিবাসী সমাজের মধ্যেও শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত। বিভিন্ন ধরণের সমস্যার কারণে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে এখনও অনাগ্রহী। যদিও তাদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে এবং চাকুরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ আজও বর্তমান।

৪.৭ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতি:

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ভূপ্রকৃতির মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মেদিনীপুর জেলা পূর্বে এবং পশ্চিমে বিভক্ত হয় পয়লা জানুয়ারি ২০০২ সালে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মূলত কৃষিভিত্তিক। সেখানে ধান, সবজি, পানপাতার চাষ যেমন হয় তেমনি মাছ চাষও বহুল পরিমাণে হয়। ওদিকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় রয়েছে শাল, সেগুন, মহুয়া, আকাশমনি প্রভৃতি গাছের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। বনাঞ্চলে রয়েছে লাল ল্যাটেরাইট পাথুরে মাটি যা অত্যন্ত শুষ্ক এবং রুক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই এই মাটিতে কৃষিকাজ করা সম্ভব হয় না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় জঙ্গলের গা ঘেঁসে রয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ধান এবং সবজির ক্ষেত। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সেচের সুবিধা থাকা অঞ্চলগুলিতে বছরে তিনবারই ধান চাষ হয়। আলু এবং সবজির চাষও এই অঞ্চলে মানুষের প্রধান জীবিকা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কাঁসাই, শিলাবতী, রূপনারায়ণ নদীর সঙ্গে সঙ্গে কেলেঘাই, কপালেশ্বরী ইত্যাদি কিছু ছোট নদী রয়েছে। ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি অনেকটাই নদীভিত্তিক। গরমের দিনে নদীগুলি শুকিয়ে যায়, আবার ভরা বর্ষায় তার রূপ হয় ভয়াল। নদী যেমন দুঃখ দেয়, বন্যায় সবকিছুকে ভাসিয়ে ধ্বংস করে দেয় তেমনি দ্বিগুণ ভালবাসায় নদী তীরবর্তী মানুষদের তৃপ্তি দেয়, সান্তনা দেয়। আর তাই নদীর অদূরে বহু স্থানে যেমন গড়ে উঠেছে মায়ের থান তেমনি রয়েছে আদিবাসীদের গরাম থান। কেলেঘাই নদীর উচ্চভূমিতে যেখানে মাটি লাল এবং শুকনো সেখানে প্রথম বসতি গড়েছে আদিবাসী সমাজ বিশেষত সাঁওতাল, লোধা, শবর, মুন্ডা, মাঝি, কাঁড়রা প্রমুখ আদিবাসী জনগোষ্ঠী। পরে পরে জনসমাজে এসেছে ব্যাপক জন বিন্যাস। পশ্চিম

মেদিনীপুর জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলির প্রবেশপথে গাছ তলায় থাকে গ্রাম দেবতা বড়াম বা গরামের থান। সঙ্গে থাকতে পারেন মারাংবুরু, জাহের আয়ো প্রভৃতি দেবতা। পোড়া মাটির তৈরি হাতি, ঘোড়া প্রভৃতিকে 'ছলন' রূপে দেবতার স্থানে উৎসর্গ করেন আদিবাসী মানুষরা। অনেক ক্ষেত্রে অ-আদিবাসীদেরও গরাম থানে হাতি, ঘোড়া উৎসর্গ করতে দেখা যায়। আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী নদীমাতৃক এলাকা গুলিতে টুসু পরব এবং ভাদু উৎসব চলে আসছে বহু বছর ধরে। মেলা পরবের পাশাপাশি অতি প্রাচীন দেবস্থান গুলি নদীমাতৃক অববাহিকার জনপদের ঐতিহ্যের অকাট্য প্রমাণ।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেলেঘাই নদীর তীরে নারায়ণগড়ে রাজা গান্ধর্বপাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১২৬৪ খ্রিস্টাব্দে। এর পূর্বের ইতিহাস অজ্ঞাত। রাজা গান্ধর্ব পাল এই এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন ব্রহ্মাণী দেবীর মন্দির এবং মন্দিরের সামান্য দূরে রানী মধুমঞ্জুরীর আগ্রহে ২০০ বিঘা আয়তনের জমির উপর হয় দিঘীরানী সাগর। কথিত আছে যে নারায়ণগড় রাজবংশের শুরু থেকে রাজবংশের শেষ পর্যন্ত অনির্বাণ ছিল ব্রহ্মাণী মন্দিরের ঘৃত প্রদীপ। এই বংশের রাজা পরীক্ষিত বর্গীদের আক্রমণকে প্রতিহত করেছিলেন। তার পুত্রবধূ রানী অভয়া প্রতিষ্ঠা করেন কৃষ্ণ মন্দির 'ব্রজনগর'। এই রাজবংশ ৬০০ বছর ধরে এই অঞ্চলকে শাসন করেছেন। এই বংশের শেষ রাজা পৃথ্বীবল্লভ (১৮৮৩) নারায়নপুর বা নারায়ণগড় নামকরণ করেছিলেন এই বংশের দ্বিতীয় রাজা নারায়ণ বল্লভের নামে। তিনি এখানকার রাজবাড়ি 'হান্দোলগড়' এর প্রতিষ্ঠাতা। নারায়ণগড়ে রয়েছেন ধনেশ্বর মহাদেব। শ্রী চৈতন্য যখন নীলাচলে যাত্রা করেছিলেন তখন এখানে ধনেশ্বর মহাদেব এর মন্দিরে পূজা করেন। এই

গ্রামে তাঁর দুই শিষ্য ভবানীশংকর এবং বীরেশ্বর তাঁর সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। আবার এই থানার কসবা গ্রামে শাহজাদা সুজা একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন যা এখনো রয়েছে। এই থানা অঞ্চলে বেশ কিছু বড় বড় দীঘি রয়েছে। নারায়ণগড় থানার হীরাপাড়ি গ্রামে প্রাচীন সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক বিস্ময়কর নিদর্শন আজও পাওয়া যায়। এই গ্রামে একটি প্রাচীন ক্ষীরকুল গাছের তলায় প্রায় চার ফুট দীর্ঘ এক পাথর ফলকে খোদাই করা রয়েছে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মাধারী এক চতুর্ভুজ মূর্তি। সারা বছর তাকেই চন্ডী এবং শীতলা রূপে পূজা করা হয় আবার বসন্তকালে দোলের দিনে তাঁকে কৃষ্ণ রূপে পূজা করা হয়। আদিবাসীরাও এই স্থানে শীতলা এবং চন্ডী পূজার দিন জমায়েত হন এবং ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করেন। (মেদিনীপুর, পৃঃ ১৯৬-২১১)।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য থানা হল কেশিয়াড়ি। কেশিয়াড়ি থানার দক্ষিণ দিকে সুবর্ণরেখা নদী এবং পূর্বে রয়েছে কেলেঘাই নদী। কেশিয়াড়ি বহু পূর্বে নারায়ণগড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এখানে রয়েছে বহুখ্যাত সর্বমঙ্গলার মন্দির, কালীশ্বর ও কপিলেশ্বর মহাদেব মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, কুরুমবেড়া দুর্গ এবং দুর্গের মধ্যে মসজিদ, তল কেশিয়াড়ির মসজিদ। সুতরাং হিন্দু এবং মুসলমান স্থাপত্য এই থানায় পাশাপাশি রয়েছে। এই দুর্গের মধ্যে যে মসজিদটি রয়েছে সেটি ঔরঙ্গজেবের আমলের তৈরি। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বড় বড় পুষ্করিণী রয়েছে, যেমন-বিদ্যাধর, মুকুন্দদেব প্রভৃতি। এই পুষ্করিণীগুলি এই থানার গৌরব। মুকুন্দদেব পুষ্করিণীর পাশে একটি মন্দিরও রয়েছে। এখানে পূর্বে সূক্ষ্ম তসরের কাপড় তৈরি হতো। ১৮৫২ সালে এই থানার বিবরণীতে পাওয়া যায় এখানে ৮০০ থেকে ৯০০ তাঁতীর

বসবাস ছিল। এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ আদিবাসী সমাজ, বিশেষত সাঁওতাল, লোধা এবং শবর সম্প্রদায়ের।

এদের বেশিরভাগ আজও অরণ্য নির্ভর। তাই ধর্মাচরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সামাজিক জীবনচর্চায় হিন্দু-মুসলমান এবং আদিবাসী সমাজের সম্মিলিত ছাপ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এলাকার দেবস্থানে রয়েছে যেমন বড়াম, গরাম ও জাহের থান তেমনি কামার, কুমোর, তাঁতি, তেলি, জেলে, ধোপা, নাপিত, হাড়ি প্রভৃতি নিম্ন সম্প্রদায়ের 'যুগনীতলা' ও চণ্ডী থান, শীতলার থান ইত্যাদি রয়েছে। তুলনায় বৈষ্ণবদের ঠাকুরবাড়ি, ব্রাহ্মণদের মন্দিরের সংখ্যা অনেক কম। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলে অনার্য সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রেণী প্রথা আজও বিশেষ ভাবে চালু রয়েছে। গরাম থান, বড়াম থান, যুগনিতলা, জাহের থান ও শীতলার থানে পাঁঠাবলি এবং আদিবাসীদের মুরগি বলি আজও বহুল ভাবে প্রচলিত। মন্দির নির্মাণে ইটের তুলনায় মাকড়া পাথরের মন্দির এবং পুষ্করিণীর ঘাট রয়েছে। আদিবাসীদের পূজা পার্বণের প্রধান অংশ বাহা পরব, করম পূজা, টুসু, ভাদু, চৈত্র সংক্রান্তি, ধর্ম সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। তাদের জীবন চর্যায় আজও রয়েছে মদ, মাংস এবং জঙ্গলের পশু শিকার। বহু আদিবাসী গ্রামে পাথর বাঁধানো কুঁয়ো পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় পানীয় জল মুলত সংগ্রহ করা হতো কুঁয়ো থেকে। সামান্য কৃষি কাজের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীরা খেজুর পাতার ঝাড়ু শিল্প, বেত শিল্প, শালপাতার শিল্প এবং অন্যের জমিতে মজুরের কাজ করার মাধ্যমে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। উৎসবে আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্যবাহী নাচ, গান, ধামসা, মাদলের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গ্রামেই এখন অ-আদিবাসীদের কবিগান, তরজা, বাউল, ঝুমুর, রাম রসায়ন, ষষ্ঠী মঙ্গল

ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং প্রাচীন আদিবাসী সমাজ বর্তমানে অনেকাংশে অ-আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে। এর বিপরীতটি ও একইভাবে সত্য। সুতরাং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বর্তমানে আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী সমাজের মিশ্র সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার কোলন্দা গ্রামে এবং নদীর অপর তীরে পটাশপুর থানার(পূর্ব মেদিনীপুর) গোকুলপুর গ্রামে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বিশাল আটদিন ব্যাপী মেলা বসে। এই মেলার কথা ইংরেজ আমলে ম্যালি সাহেবের রচিত গেজেটিয়ার গ্রন্থের মেদিনীপুর অংশে ৮১ নম্বর পৃষ্ঠাতে উল্লেখ রয়েছে।

বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক গোকুলানন্দ বাবাজি জন্মেছিলেন কোলন্দা গড়ের উত্তরে আনুমানিক ৭০০ খ্রিস্টাব্দে। যদিও তাঁর পিতৃভূমি গোকুলপুর গ্রাম। সংস্কৃত শিক্ষা লাভের পর গোকুলানন্দ রায় হালিশহরে বৈষ্ণবাচার্য রামানন্দ বাবাজীর কাছে এসে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সাধন ভজনে ব্রতী হন। তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে জমিদার পরমানন্দ গোকুলানন্দ কে রাজ পরিবারের পন্ডিতের পদে বরণ করেন। রাজা পরমানন্দের পুত্র বিপ্রপ্রতাপ (মতান্তরে বিপ্রপ্রসাদ) গোকুলানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুর স্থায়ী বসবাসের জন্য কোলন্দায় ভূমি দান করেন। গোকুলানন্দের মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধিস্ত করা হয় কোলন্দা এবং বকুলপুর গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া কেলেঘাই নদীর চরভূমিতে যেটি, গোকুলপুর মৌজায় তাঁর পৈতৃক ভিটা। গোকুলানন্দজির মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শিষ্য রাজা বিপ্রপ্রতাপ কে বলেছিলেন পৌষ সংক্রান্তির মধ্য রাত্রির পর যে ভক্ত নদীতে ডুব দিয়ে তিন মুঠা মাটি নিয়ে তার যোগমঞ্চে দেবে, তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। বহু ভক্ত পূজাতে এই দিনে চুনও দান করেন। তাদের বিশ্বাস বাবাজীর কৃপায় কুষ্ঠ

রোগ, চর্ম রোগ, গোদ (ফাইলেরিয়া) ইত্যাদি নিরাময় হবে। কোলন্দা এবং গোকুলপুরে আটদিনব্যাপী মেলাতে বহুদূর-দুরান্ত থেকে আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মানুষরা আসেন এবং একত্রে মিলিত হন। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কেনাকাটা করে ফিরে যান। প্রকৃতপক্ষে গোকুলপুর এবং কোলন্দার পৌষ সংক্রান্তি মেলা এলাকার আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতির মিলনস্থল।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় জৈন ধর্মের বহু নিদর্শন রয়েছে। প্রাচীন জৈন ধর্ম গ্রন্থ 'আকারাঙ্গা' সূত্র থেকে জানা যায় যে মহাবীর এবং তার ২৪ জন তীর্থঙ্কর রাঢ় বাংলা পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কংসাবতী, দামোদর, শিলাবতী ও দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে বিস্তার ঘটে জৈন ধর্মের। এই অঞ্চলে বহু জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং বিকৃত ও অবিকৃত জৈন মূর্তির 'লাঞ্ছনা চিহ্ন' থেকে প্রমাণিত হয় যে এই অঞ্চলে জৈন তীর্থঙ্কররা ভ্রমণ করেছিলেন। খড়গপুর গ্রামীণ থানার মোহনপুরের কাছে জিনশহর, লালগড়ের ডাই নটিকরী, নেপুরা, অযোধ্যা বাড়, প্রভৃতি গ্রামে জৈন মূর্তি এবং জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন বর্তমান। মেদিনীপুর শহরের পূর্বপ্রান্তে পাথরঘাটা এলাকায় এবং পশ্চিমে রেলসেতুর কাছে দুটি ভাঙা মন্দির আদিবাসী রঙ্কিণী দেবীর বলে জনসমাজে প্রচারিত থাকলেও এদুটি আদিতে ছিল জৈন মন্দির।

প্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন যেমন অস্ত্র এবং তাম্র, প্রস্তর যুগের উজ্জল লাল রং-এর ভাঙ্গা মাটির পাত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কংসাবতী নদীর তীরে আদিম সিজুয়া গ্রামে পাওয়া গেছে। এই গ্রামে বামাসিনীও বাগরুইসিনী নামে দুটি লোক দেবীর থান রয়েছে। মকর সংক্রান্তির পরের

দিন এখানে দুই দেবীর ঘটা করে পূজা হয়, মেলা বসে এবং জনসমাগম হয়। এই মেলায় আদিবাসীদের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। মনে করা হয় যে এই দুই লোক দেবী অনার্য সংস্কৃতির অংশ। এই গ্রামে একটি ভাঙ্গা বিষ্ণু মন্দির রয়েছে, উপরে রয়েছে বিষ্ণুচক্র। জনশ্রুতি এই মন্দিরের বয়স ৫০০ বছরের অধিক। সিজুয়া গ্রামে ৭০ হাজার বছর আগের আদিম মানবের চোয়াল পাওয়া গেছে। এই হাড়টি ভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম মানুষের জীবাশ্ম। সুতরাং প্রমাণিত যে এক লক্ষ হাজার বছর আগে এই গভীর অরণ্য শঙ্কুল ভূখণ্ডে আদিবাসী মানুষেরা বসবাস করতেন। যে স্থানে এই চোয়ালটি পাওয়া গেছে সেটি 'হোলোসিন' যুগের এবং আবিষ্কৃত স্থানটি 'প্লায়োস্টোসিন' যুগের শেষ পর্যায়ে লাল বালির উপরে যে তাম্রশ্মীয় স্তর তারও ৪০ ফুট নিচে এটিকে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর শহরের অদূরে গোপগড়ে রয়েছে গড় বা দুর্গ। পাহাড়ে নিচের দিকে সারি সারি খোলা মুখ প্রকোষ্ঠ ইঙ্গিত দেয় এখানে বৌদ্ধ ধর্মের সন্ন্যাসীরা থাকতেন। ১৯১১ সালের 'গেজেটিয়ার' এও গোপহাউসের নাম রয়েছে। আইন-ই-আকবরীতেও এখানে একটি দুর্গ থাকার কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই গোপগড়ে রয়েছেন গোপনন্দিনী দেবীর মন্দির। পৌষ সংক্রান্তির দিনে এখানে মেলা বসে, আদিবাসী ও অ-আদিবাসী সম্প্রদায় এখানে একত্রিত হন। ব্রিটিশ শাসনকালে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা গভীর জঙ্গল বেষ্টিত পাহাড়ের উপর গোপগড়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতেন।

মেদিনীপুর সদর ব্লকের কলাইচন্ডী খাল ও কাঁসাই নদীর সংযোগস্থলে পাথরা গ্রামে মজুমদার পরিবার বাইশটি মন্দির, কাছারি ঘর এবং সুড়ঙ্গ ঘর তৈরি করেন। বর্তমানে এখানে ১৬ টি মন্দির টিকে রয়েছে। যার বেশিরভাগই বিগ্রহ হীন। এই মন্দির গুলি হল -

১. গোলামা বুড়ি (শীতল) এটি আটচালা। এখানে নিত্য পূজা হয়।

২. ধর্মরাজের পঞ্চরত্ন।

৩. মজুমদারদের পরিত্যক্ত নবরত্ন মন্দির।

৪. আটচালা শিবালয় পাঁচটি পরিত্যক্ত।

৫. চাঁদনী শিবালয় ছয়টি পরিত্যক্ত।

৬. ত্রিরেখ দেউল রীতির তুলসী মঞ্চ (পরিত্যক্ত)।

৭. কালাচাঁদের চাঁদনী মন্দির (পরিত্যক্ত)।

৮. পঞ্চরত্ন শিবালয় পাঁচটি (পরিত্যক্ত)।

৯. মাকড়া পাথরের তৈরি ভগ্ন দুর্গা মন্ডপ (পরিত্যক্ত)।

১০. বুড়িমার (শীতলা) সপ্ত শিখর দেউল এখানে নিত্য পূজা হয়।

১১. সর্বমঙ্গলার পঞ্চরত্ন মন্দির।

১২. নয় চূড়ার রাসমঞ্চ।

১৩. ভগ্ন পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন মন্দির।

১৬ টি শিবালয়ের মধ্যে বিগ্রহ আছেন মাত্র চারটিতে।

মেদিনীপুর শহরে শ্রীচৈতন্য এবং গুরু নানকের পায়ের স্পর্শ আছে। মেদিনীপুর শহরের প্রবেশ মুখে জগন্নাথ মন্দিরের নিকট কাঁসাই নদীর তীরে ছিল জগন্নাথ ঘাট। সেই ঘাট পেরিয়ে শ্রীচৈতন্য এবং গুরুনানক নীলাচলে গিয়েছিলেন। কাঁসাই নদীর উভয় তীরে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার যে জঙ্গলমহল সেখানে তৈরি হয়েছে মুগ্ধতার রহস্য জাল। আর তারই মাঝখানে দূরের গভীর জঙ্গল পেরিয়ে কোন আদিবাসী গ্রাম থেকে ভেসে আসে ঝুমুর, টুসু, ভাদুর সুরমূর্ছনা; বাজে ধামসা মাদল। দুঃখ, বেদনা, ক্লান্তির রেশ হারিয়ে সাঁওতাল, আদিবাসী, কুড়মি, মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরে পরবের দিনগুলিতে বইতে থাকে আনন্দের জোয়ার। বনদেবীর বরাম থান বা গরাম থানে কিংবা বাঁধনা পরবে অরণ্যচারী আদিম সম্প্রদায়ের মানুষরা পাতানাচ, কাঠি নাচ ইত্যাদির ছন্দে ছন্দে দোলায়িত হন।এইভাবেই বিনোদনের পাঠ পরিক্রমায় লেগে থাকে ঐতিহ্যের আলিঙ্গন।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার নাড়াজোল দাসপুর থানার অন্তর্গত গ্রামে রয়েছে রাজার গড় বাড়ি এবং বেশ কয়েকটি চিত্তাকর্ষক মন্দির। এই মন্দিরগুলি প্রাচীন নাড়াজোল এর পুরাকীর্তির স্বীকৃতি রূপে গ্রাহ্য। নাড়াজোল রাজগড়টি পরিখা বিস্তৃত। এই গড়বাড়ির মধ্যে রয়েছে শিব মন্দির। পাশে দক্ষিণ মুখী দুর্গা দালান। এখানে বেশ কিছু টেরাকোটার মূর্তি রয়েছে, তাতে মিথুন দৃশ্য বর্তমান। দক্ষিণ দিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ঠাকুর বাড়িতে রয়েছেন জয় দুর্গা এবং গোবিন্দ জিউর 'নবরত্ন'। সীতারাম ও রাধা বল্লভ এর চাঁদনী। চাঁদনীটি তৈরি

হয়েছে ১৮১৯ সালে অযোধ্যা থেকে আনা বেলে পাথর দিয়ে। এই চাঁদনীর প্রতিষ্ঠা করেন রাজা মোহনলাল খান। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এই নবরত্ন মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল এখানে রয়েছেন ব্রহ্মা, নারদ, মহিষাসুরমর্দিণী এবং নারায়ণের দশাবতার। বিশাল স্থাপত্য শৈলের এই নাড়াজোল রাজবাড়ি ও তার অন্দরমহল বহু কক্ষ যুক্ত, কিন্তু ভগ্ন হওয়ায় বর্তমানে পরিত্যক্ত।

কাঁসাই নদীর তীরে নাড়াজোল অঞ্চলে মানুষ মূলত মৎস্যজীবী। এখানে মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করা হয় ডাবু জাল, পাছাড়ি জাল, কালি জাল, চাবি জাল, পোনা মারা জাল, জ্ঞাতি জাল, সারেং জাল প্রভৃতি। শীতকালে কাঁসাই নদীর উভয় তীরে মানুষ কৃষিকাজ এবং সবজি চাষ করেন। বর্ষায় যদিও পুরো অঞ্চল বন্যায় ভেসে যায়।

কেলেঘাই নদীর উৎস ভূমি কালুন্দির থানের সামান্য কিছু দূরে রয়েছে বিখ্যাত গুপ্তমনি মন্দির। মা গুপ্তমনি দেবী যানবাহনের দেবী রূপে অধিক পরিচিত। এখানে এখনো বলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। এখানকার এবং কালুন্দি থানের পুরোহিত হলেন লোধা সম্প্রদায়ের মানুষ। সাঁকরাইল এর পাথরায় মা জয়চন্ডীর মন্দিরে লোধারাই প্রধান পূজারী। তার কারণ হিসাবে বলা হয় যে জয়চন্ডী মন্দির, পাথরকাটি মন্দির এবং গুপ্তমনির মন্দির লোধা অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। সাঁকরাইল থানার অববাহিকায় 'পাথরা' ও 'ক্ষুদমরাই' গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচুর গ্রামীণ প্রত্ন ক্ষেত্র, সৌধের ভীত, মাকড়া পাথরের ব্লক, সুগনি পাথরের হাতি ঘোড়া ও সিংহের মূর্তি, কারুকার্য করা পাথরের পেন, পাথরের বুদ্ধমূর্তি, দুটি সাপের মিথুন মূর্তি ইত্যাদি পাওয়া গেছে এর থেকে মনে করা হয় যে এক সময়ে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার ছিল।

লালগড়ে কাঁসাই নদীর তীরে গভীর শাল জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণ বলরাম এবং জোড় বাংলা মন্দির। স্থানীয়ভাবে এর নাম রাধামোহন জিউ এর মন্দির। এই মন্দিরটি স্থাপন করেন লাল সিং। বালি দুমদুমির গভীর জঙ্গল থেকে শ্রীমতি রাধারানীকে পাওয়া যায়, এবং তাকেও এই মন্দিরে স্থাপন করা হয়। লালগড় রাজবাড়ির ৩০০ বছরের পুরনো দুর্গাপূজা, রাস উৎসব এবং দোলযাত্রা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। রাজা স্বরূপনারায়ণ সাহসরায় লালগড় রাজ পরিবারে দুর্গা পূজা প্রচলন করেন।

লালগড়ে কাঁসাই নদীর তীরে 'বুড়া বুড়াম' স্থানে টুসু পরব হয় এক মাস ধরে। এটি মূলত আদিবাসীদের পরব। লক্ষাধিক মানুষ এই মেলায় আসেন। কাঁসাই নদীর কনকাবতি গ্রামে সীতাবালা দেবীর (উচ্চারণ গত বিকৃতিতে রাজার শীতলা হয়ে যান সীতাবালা, তখন কাঁসাই নদীর নাম ছিল কৌটিল্য) পূজা হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিন গভীর বনের মধ্যে সীতাবালার মেলা বসে। এখানেও আদিবাসী ও অ-আদিবাসী এই উভয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির মহামিলন ঘটে।

ঝাড়গ্রাম জেলার কমলাশোল জঙ্গলে শাল, পলাশ, শিমুল এবং কেঁদু গাছ লক্ষ্য করা যায়। এখানে বেশিরভাগই ডাহি জমি, বৃষ্টিপাত কম। পাথুরে এলাকায় গ্রীষ্মকালে তাই চলে তাপপ্রবাহ। কমলাশোলে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ অধিক সংখ্যায় বসবাস করেন। তুলনায় সাঁওতাল এবং কুরমী সম্প্রদায়ের মানুষ কম সংখ্যায় বসবাস করেন। এখানে মুন্ডাদের সমাজের দেবী 'গরাম' থানে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তাই মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষেরা দেবীর থানে ভক্তি ভরে দান করেন পোড়ামাটির হাতি এবং ঘোড়া। পূজাতে পাঁঠা বলি এবং মোরগ বলির চল রয়েছে। পুজোর পরে মহাসমারোহে ধামসা মাদল বাজিয়ে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষরা নাচ গান করেন

সঙ্গে যোগদান করেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা। পরবের দিনে জঙ্গল মহলের বহুদূর গ্রাম থেকে অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা এখানে একত্রিত হন।

পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম এই তিনটি জেলা নিয়ে গড়ে উঠেছিল অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পলি মাটি দিয়ে তৈরি, অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম জেলায় রয়েছে লাল ল্যাটেরাইট মাটি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশ লাল ল্যাটেরাইট মাটি এবং বাকি অংশ পলিমাটি দিয়ে তৈরি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লক বন্ধুর মালভূমি এলাকা তাই স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার জনজীবনের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রনে গড়ে উঠেছে। বহিরাগত বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাই পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় নির্দিষ্ট সংস্কৃতি সবসময় পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তী অংশ যদিও এ বিষয় নিয়ে অর্থাৎ পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে তাই এই অংশে বহু মিশ্র সংস্কৃতির উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

ছৌ নৃত্য: - ভূম রাজ্যের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছো বা ছৌ নাচের উদ্ভব হয়েছিল। কোন কোন গবেষক মনে করেন যে মুখোশ পরা এই নাচ গুলি আদিম প্রকৃতির। এই নাচ একটি যৌথ নৃত্যের উদাহরণ। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই নাচের ধারা তৈরি হয়। ছৌ নৃত্য ধারায় মহিষাসুরমর্দিনী কে সব থেকে বেশি করে তুলে ধরা হয়। আদিবাসী বাদ্যযন্ত্র সহ কার যোগে বীররসের এই নাচটি তৈরি হয়েছে। ঝাড়গ্রাম, বেলপাহাড়ি, গোপীবল্লভপুর ইত্যাদি এলাকায় এই নাচের প্রচলন অধিক।

চাঙ্গু:- এটি ঝাড়গ্রাম জেলার চিল্কিগড় অঞ্চলের এক বিশেষ ধরনের নাচ। 'চাঙ্গু' একটি তাপ রক্ষক চামড়ায় ছাওয়া বাদ্যযন্ত্র। এক হাতে চাঙ্গুকে ধরে আরেক হাতে চাপড়ে তাল রাখা হয়। নর্তকের দল চাঙ্গু হাতে নিয়ে অর্ধা কারে বা বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকেন।

পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার লোকসংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান গুলির মধ্যে মিশে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের লোকের লোকশিল্পের প্রেক্ষাপট। বাঁশের তৈরি শিল্প সামগ্রী, বেতের তৈরি আসবাবপত্র, পাথরের জিনিসপত্র, শালপাতার বাসন, মাটির পাত্র ও মূর্তি সমূহ, মাদুর শিল্প, তাঁত শিল্প, কাঁথা শিল্প, দড়ি শিল্প, লোহার তৈজসপত্র, তালপাতার পাখিরা, ডোকরা শিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত সমস্ত ধরনের লোকশিল্পে আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী সম্প্রদায় সমানভাবে যুক্ত রয়েছেন। উল্লেখিত শিল্প গুলি পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার অর্থনৈতিক উন্নতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৪.৮ ঝাড়গ্রাম জেলার সংস্কৃতি:

ঝাড়গ্রাম জেলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে আদিবাসী ও অ-আদিবাসী এই উভয় গোষ্ঠীর মানুষের সম্মিলিত উপাদান লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতি অনেকাংশেই নদীর সাথে সম্পৃক্ত। বাংলার সংস্কৃতি নদীকে বাদ দিয়ে নয়। প্রতিটি নদীর কাহিনী আসলে একটি মানব সভ্যতার আখ্যান। নদী এগিয়ে চলে কলকল করে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যায় মানুষের জীবন। ঝাড়গ্রাম জেলার অন্যতম বড় নদীটি হল সুবর্ণরেখা। এটি ছোটনাগপুর মালভূমির নাগরি এবং পিসকা গ্রামের কাছে লোহারডগা পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। নদীটি ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, চান্ডিল,

জামশেদপুর, ঘাটশিলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হাতিবাড়িতে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ব্লকে প্রবেশ করেছে এবং শেষে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার তালসারীর কাছে কীর্তনীয়া বন্দরে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। ৩৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ নদী পথের মধ্যে ঝাড়গ্রাম জেলায় নদীপথ মাত্র ৬৪ কিমি। ঝাড়গ্রাম জেলায় নদীটি মধ্যগতিতে রয়েছে। সুবর্ণরেখা নদীর গতিপথের পাশেই গড়ে উঠেছিল মোগলমারি বৌদ্ধবিহার। উপত্যকা অঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমানে ঝাড়গ্রাম জেলাতে এক সময় ভাই-বোনে বিবাহ প্রথা চালু ছিল। তারই প্রমাণ জনপ্রিয় লোককথা 'করলী'র কেন্দ্রীয় মোটিফ 'ভাইবোনে বিবাহ'। যদিও সমাজের চাপে শেষ পর্যন্ত ভাই বোনে বিবাহ হয়নি এবং বোন বা নায়িকা জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। করলীর পুনর্জন্ম বা রূপান্তর ঘটে এবং ছদ্মবেশে ভাইয়ের সঙ্গে সংসার জীবন যাপন করে। সুবর্ণরেখার অববাহিকায় সুপ্রাচীন অতীতে যে অনার্য সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তারই স্মৃতি, সাংস্কৃতিক ফসিল রূপে করলী লোককথায় মোটিফ এ রূপান্তরিত হয়েছে।

সুবর্ণরেখা অববাহিকায় আরেকটি জনপ্রিয় লোককথা ‘শাহাড়া সুন্দরী’র কেন্দ্রীয় মোটিফ বৃক্ষবাসী কন্যা এবং গাছের সঙ্গে বিবাহ। আদিম মানুষেরা বিশ্বাস করতেন যে গাছের মধ্যে সুন্দরী কন্যা থাকে, তাই গাছকে বিবাহ করার প্রথা আদিবাসী সমাজে ছিল। এমনকি আজও কোন কোন আদিবাসী অঞ্চলে গাছের সঙ্গে বিবাহের রীতি চালু রয়েছে। এটি একটি সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস বা ‘Animism’ থেকে জাত্। যেহেতু গাছের মধ্যে বিশেষ গুণসম্পন্ন সুন্দরী কন্যারা বাস করে তাই গাছ কাটার আগে তাকে প্রণাম করে কাটার অনুমতি চাইতে হয়। গাছের সঙ্গে বিবাহকালে কনের বিয়ে দেওয়া হয় এবং বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় আম

গাছের। গাছের সঙ্গে বিবাহ প্রথাটি মূল বিবাহের আগে অনুষ্ঠিত হয়, সুবর্ণরেখার লোকসাহিত্যে তাই প্রাচীন সভ্যতার প্রথা প্রকরণ মোটিভ এ পরিণত হয়েছে।

সুবর্ণরেখা অঞ্চলে একদা নরমাংস ভক্ষণ চলতো। এখানে ভাইরা নিজের বোনের মাংস ভক্ষণ করত, সম্ভবত সম্পত্তি থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে অথবা ব্যক্তিগত আস্বাদনের লোভেই। ভায়েরা বোনকে কেটে মাংস ভক্ষণ করতো। যদিও বর্তমানে এই প্রথা সামাজিক স্বীকৃতি হারিয়েছে তবুও তার স্মৃতি মানুষের মন বিশেষত তার লোককথা থেকে পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি।

মহাভারতের বনপর্ব সুবর্ণরেখার অববাহিকায় ঝাড়গ্রাম জেলায় ঘটেছিল। হাতিবাড়ি বনাঞ্চল থেকে করবনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মহাভারতের পরিমণ্ডল সুবর্ণরেখা বিধৌত অঞ্চলে অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবরা বসবাস করেছিলেন। পান্ডবরা যেখানে শিবলিঙ্গের পূজা করেছিলেন তিনি পাণ্ডবেশ্বর শিব নামে বর্তমানে পুজিত হন। অজ্ঞাতবাসকালে যেখানে দ্রৌপদী ভাত রান্না করে ভাতের বিশাল হাড়ি রাখতেন সেই স্থানের বর্তমান নাম ‘ভাত হান্ডিয়া’। অজ্ঞাতবাসকালে অসুরদের দ্বারা পান্ডবরা অত্যাচারিত হয়েছিলেন, ভীম একাই শতশত অসুরকে বধ করে একস্থানে মৃতের পাহাড় তৈরি করেন।সেই টিলা পাহাড়ের নাম ‘অসুরহুড়ি’। হাতি বাড়িতে নদীর তীরে যে সমস্ত বড় বড় পাথর পড়ে আছে সেখানে অনেকগুলি গর্ত রয়েছে। কথিত আছে যে পাথরের ওপর হাটু গেড়ে ভীম ষাটি রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন আর তার ফলেই ভীমের হাঁটুর-চিহ্ন গর্তে রূপান্তরিত হয়েছে। গোপীবল্লভপুরের ছাটিদহের তীরেই ভীম হিরিম্বাকে বিয়ে করে এবং হিড়িম্বা ঘটোৎকচের জন্ম দেন। অর্থাৎ বীর ঘটোৎকচ সুবর্ণরেখা নদীর তীরে ঝাড়গ্রামের ভূমিপুত্র ছিলেন বলেই লোককথায় জানা যায়।

সুবর্ণরেখা নদীকে কেন্দ্র করে ঝাড়গ্রাম জেলায় নয়াগ্রাম থানার পশ্চিম প্রান্তে টিলার ওপরে অবস্থিত রামেশ্বর শিব মন্দির এবং তার দশ কিলোমিটার পূর্বে ঘোর অরণ্যে অবস্থিত তপোবনের মিথ রামায়ণের পরিমণ্ডল কে ঘিরে রচিত হয়েছে। কথিত আছে যে ভগবান স্বয়ং বিশ্বকর্মা কে ডেকে বাল্মিকীর তপোবনের নিকট পুরীর মন্দির নির্মাণের আদেশ দেন। ভগবান এও বলেন যে সকলের অগোচরে এই মন্দিরটি এক রাত্রের মধ্যে শেষ করতে হবে। বিশ্বকর্মা স্থানীয় মাকড়া পাথর দিয়ে মন্দির নির্মাণ শেষ করেন। তিনি যখন প্রাচীর তৈরি করছেন তখন শুনতে পান যে চিড়াকুটিরা ঢেঁকিতে চিড়া কুড়তে শুরু করেছে, বিশ্বকর্মা ভাবলেন সকাল হয়ে গেছে তাই ভয়ে মন্দিরের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে তিনি স্বর্গে ফিরে গেলেন। যদিও তখনও রাত্রি ছিল। এই মন্দিরটি দীর্ঘকাল বিগ্রহহীন অবস্থায় পড়েছিল। রামচন্দ্র বনবাসে এসে যখন বাল্মিকির তপোবনে ছিলেন তখন এই মন্দিরে তিনি দ্বাদশ শিবলিঙ্গ কে স্থাপন করেন। তাই এই শিবের নাম রামেশ্বর শিব। সীতা যখন বনবাসে দ্বিতীয়বার বিসর্জিত হলেন তখন প্রত্যহ বাল্মিকীর তপোবন থেকে রামেশ্বর শিব মন্দিরে এসে রামের মঙ্গল কামনায় পূজা করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ১৬৫৫ সালের মধ্যে রচিত শ্রী শ্রী রসিকমঙ্গল নামক জীবনীতে এর প্রমান পাই,

"রোহিনীর নিকটে বারাজীত মহাস্থান
যা'তে সীতা-রাম লক্ষ্মণ কৈলা বিশ্রাম
দুয়াদশ লিঙ্গ রামেশ্বর শম্ভুবর
রঘুবংশ কুলচন্দ্র পূজিলা বিস্তর"।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরের নাম ছিল কাশীপুর(এখানে রোহিনীর রাজা অচ্যুত পট্টনায়কের জেষ্ঠ্য পুত্র কাশীনাথের উদ্যানবাটী ছিল বলে এই স্থানের নাম কাশীপুর)। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আচার্য শ্যামানন্দ তাঁর প্রিয় শিষ্য কাশীপুর রাজার কনিষ্ঠ রাজপুত্র রসিকানন্দকে নিয়ে কাশীপুরের উদ্যান বাটিতে আসেন। চারিদিকে সবুজের আনন্ত সমারোহ এবং সম্মুখে কুলুকুলু ধ্বনিতে বয়ে যাওয়া সুবর্ণরেখাকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যেন বৃন্দাবনের তীরে যমুনা নদী। তাই এই স্থানকে তিনি বললেন গুপ্ত বৃন্দাবন। এখানেই তিনি রসিকানন্দের কুলবিগ্রহ রাধাকৃষ্ণ কে স্থাপন করেন এবং নামকরণ করেন গোপীবল্লভ। সেখান থেকেই কাশীপুরের নাম হয় গোপীবল্লভপুর। এটি বর্তমানে একটি বৈষ্ণবদের গুরুত্বপূর্ণ আখড়া এবং এই আখড়ার গাদীশ্বর মহন্ত রসিকানন্দ। এই স্থানকে কেন্দ্র করে শ্যামানন্দ এবং রসিকানন্দ সমগ্র উৎকলভূমিতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন।শ্যামানন্দ এখানে 'রানিহাটি বা রেনিটি ঘরানা' এবং রসিকানন্দ 'মান্দারনী' ঘরানার কীর্তন গানের প্রবর্তন করেন। গোপীবল্লভপুর কে কেন্দ্র করে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান ঝাড়গ্রাম,পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এবং সমগ্র উৎকল ভূমিতে বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল।

১৭৪১ সাল নাগাদ মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিত প্রায় চার হাজার অশ্বারোহী নিয়ে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার এবং উড়িষ্যার কিছু অংশ নিজের আয়ত্তে আনেন। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর এবং নয়াগ্রামে ঘাঁটি তৈরি করেন। গোপীবল্লভপুর এর পরিখা বেষ্টিত ঘাঁটির নাম বর্গীডাঙ্গা এবং দেউলবাড়ে রামেশ্বর মন্দিরের নিকট সুউচ্চটিলার

উপরে বর্গীদের আরেকটি ঘাঁটি ছিল। প্রায় একই সময়ে সুবর্ণরেখার দক্ষিণ পশ্চিম পাড়ে রোহিনী গ্রামে (মহন্ত রসিকানন্দের জন্মস্থান) ভাস্কর পন্ডিতের দল চারিদিকে গভীর পরীক্ষা বেষ্টিত রোহিণীগড় তৈরি করেন। পরবর্তীকালে ভাস্কর পন্ডিত এবং মারাঠা বর্গীরা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেলে রোহিণীগড় হাত বদল হতে হতে ষড়ঙ্গী পরিবারের হাতে এবং বর্তমানে মহাপাত্র পরিবারের হাতে রয়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে রোহিনী গড়ের অদূরে রয়েছে 'ভৈরবথান', যিনি ছিলেন মারাঠাদের আরাধ্য দেবতা। ভৈরব থানে এখনো ভোগ হিসেবে মারাঠা সংস্কৃতির রুটি এবং অড়হড়ের ডাল দেওয়া হয়। ভাস্কর পন্ডিতের মৃত্যু হয় আলিবর্দী খাঁর প্রবঞ্চনায়। সুবর্ণরেখা নদীর জলে ভাস্কর পন্ডিতকে এবং তাঁর ১২ জন দেহরক্ষী সৈন্যকে হত্যা করে যেখানে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই স্থানের এখন নাম ভাস্করঘাট বা ভসরাঘাট।

ঝাড়গ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সুবর্ণরেখা নদী বৈষ্ণব সাধকদের কাছে বৃন্দাবনের যমুনা নদী এবং তারই তীরে অবস্থিত গোপীবল্লভপুর হলো গুপ্ত বৃন্দাবন। রোহিনী গ্রামে রসিকানন্দের জন্মভিটে এবং রাধা কৃষ্ণের মন্দির বর্তমানে 'রোহিনীধাম' বলে খ্যাত। এটিও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি অন্যতম গদি বলে চিহ্নিত হয়েছে। সুবর্ণরেখা বৈষ্ণবদের কাছে যেমন যমুনা নদী তেমনি আদিবাসীদের কাছে ও এটি ঠাকুরবাড়ির গঙ্গা এবং দামোদর। চৈত্র মাসে ধামসার সাথে কাঁসি বাজিয়ে হরিবোল ধ্বনি দিতে দিতে হাজার হাজার আদিবাসী নারী-পুরুষ দূর-দূরান্তের বন জঙ্গল ভেঙ্গে এগিয়ে আসে এই ঠাকুরবাড়ির গঙ্গা এবং দামোদরে। আকাশে বাতাসে তখন ধ্বনিত হয় ঠাকুরবাড়ির গঁগা সিনান হরিবল হরিবোল। এই সময় আদিবাসীদের পরনে থাকে বিশেষ ধরনের কাপড়। মেয়েরা পরে হলুদ ছাপ দেওয়া লাল পাড় শাড়ি, তাদের

খোপায় গোঁজা থাকে পাতা সমেত বুনো ফুলের গোছা। তাদের মাথায় থাকে বাঁশ-পেটরা (বাঁশের ঢাকনা আঁটা ঝুড়ি বাক্স) তার ওপরে গামছা জড়ানো পরিষ্কার মাজা কাঁসার জামবাটি। পুরুষরা পরে পাঞ্চি ধুতি এবং সাদা গেঞ্জি। মাথায় বাঁধা থাকে গাছের ডাল বা পাখির পালক। তাদের কাঁধের লাঠিতে ঝোলানো শালপাতার সুদৃশ্য 'পটম', তাতে থাকে বাসি ভাত, একেই বলা হয় গোপীবল্লভপুরের আদিবাসী সাঁওতালদের দামোদর যাত্রা। চৈত্র মাসে মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে পিন্ডদানের জন্য আজও এই 'দামোদর' যাত্রা চালু রয়েছে। বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে সবুজ অরণ্য শোভিত এই গভীর জঙ্গলে নেই সুরধনি গঙ্গা, নেই দামোদর, আছে সুবর্ণরেখা। আজও আদিবাসীরা সুবর্ণরেখাকেই 'ঠাকুরবাড়ির গঁগা' নামে সম্মান জানায়। দাঁতনে এবং গোপীবল্লভপুর এর নিকট করবনিয়া গ্রামের কাছে চৈত্র সংক্রান্তিতে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে পূর্বপুরুষদের পিন্ডদান উপলক্ষে বালি যাত্রা মেলা হয়। আদিবাসী সাঁওতালরা পরিবারের কারোর মৃত্যু ঘটলে তার অস্থিকে মাটির হাড়ির মধ্যে রেখে এখানে নিয়ে আসেন এবং পবিত্র সুরধনি গঁগার বুকে অস্হি বিসর্জন করেন। এই বালি যাত্রা (বালির উপরে অনুষ্ঠিত যাত্রা বা মেলা) সম্পর্কে বিশ্বাস অবলম্বনে লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ সুরেশচন্দ্র সাউ লিখেছেন -

"সুবর্ণরেখার পারে বালি যাত্রা মেলা
বহু পুরাতন ইহা পান্ডবের লীলা
পবিত্র তীর্থের স্নান করে যেই জন
বৈকুন্ঠ ভূবন অন্তে মোক্ষ হয়ে যায়"

ঝাড়গ্রাম জেলার সমাজ-সংস্কৃতিতে দুটি রাজবংশের কথা জানা যায়, চিল্কিগড় রাজ পরিবার এবং ঝাড়গ্রাম রাজ পরিবার। আর এই দুটি রাজবাড়ি রয়েছে ডুলুং নদীর তীরে। ছোটনাগপুর মালভূমির ধানের ক্ষেত থেকে ডুলুং এর সৃষ্টি।ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর-২, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর-২, সাঁকরাইল ব্লক এবং জামবনি ব্লক কে ঘিরে রয়েছে ডুলুং নদী। ডুলুং এর মূল স্রোতটি শুরু হয়েছে চৌকিশোল, ঠাকুরান পাহাড় এবং ডুলুংডিহা পাহাড়ের নিচ থেকে। নিম্ন গতিতে রোহিনী গ্রামের দুই কিমি নিচের দিকে সুবর্ণরেখায় মিশেছে। নদীর একপাড়ে রয়েছে চিল্কিগড় রাজবাড়ী এবং একেবারে নদীর পাড়ে রয়েছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কনক দুর্গা মন্দির। মন্দিরের পাশে রয়েছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল যা আদিবাসীদের কাছে পবিত্র গহ্বর (Sacred Grooves)। এখানে কিছু বিরল প্রজাতির গাছ রয়েছে। যেমন- Helmin Thostachys Zeylanica, Olax Scandens, Pogolia Plicatum, Bauhinia Vahlii, Uvaria Tomentosa, Tacca Leontopetaloides, Ipomoea Paniculata (তরুলতা), Hiptage Madablata (মাধবীলতা)। চিল্কিগড়ের কাছে নদীর স্রোত জোরালো, এখানে রুটি খাল এবং পলপলা নদী ডুলুং এর সঙ্গে মিশেছে এবং ডুলুং এর জলের স্রোতকে বাড়িয়ে এক পূর্ণ নদীতে পরিণত করেছে। ডুলুং এর নিম্ন প্রবাহে ৮ কিমি দূরে দক্ষিণ দিকে যুক্ত হয়েছে দেব নদী। ডুলুং এর সঙ্গে দেব নদীর সঙ্গমস্থলে সারা বছরই জল থাকে। একেবারে শেষে দক্ষিণ পূর্ব দিকে বাঁ দিক থেকে চাঁপা নদী ডুলুং এর সঙ্গে মিশেছে। ডুলুং এর তীরবর্তী মাটি কোথাও পাথর মেশা, কোথাও বালি, কোথাও বোলডার বা মোরাম, কোথাও ল্যাটেরাইট এর অববাহিকার অনেক অংশ শাল, মহুয়া, অর্জুন,পলাশ,কেঁদ এর জঙ্গলে ঢাকা রয়েছে । ডুলুং এর। অববাহিকায় জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। এর গতিপথের নিম্নগতিতে যেমন উচ্চ ফলনশীল

ধান ও সবজির ক্ষেত রয়েছে, তেমনি উচ্চ গতিতে ঘন জঙ্গল এবং লাল মাটির উপর দিয়ে বয়ে এসেছে ডুলুং নদী।

ডুলুং এর তীরে বেলিয়াবেড়াতে একটি রাজবাড়ি ছিল। এই অঞ্চলের দুদিকে মূলত অনার্য অধ্যুষিত জঙ্গলে মূল বাসীদের প্রাধান্য। সাঁওতাল, ভূমিজ, মিস্ত্রি, চাষা, সদগোপ, লোধা, কৈবর্ত, সুবর্ণবনিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি থেকে রোহিণী অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য। ডুলুং এর বিস্তৃত ভূমিতে একটি মস্ত অংশ জুড়ে রয়েছেন মাহাতো সম্প্রদায়। ধড়সা পড়িহাটি অঞ্চলে রয়েছেন মুসলিম সম্প্রদায়। জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকায় মানুষের প্রধান জীবিকা কাঠপাতা সংগ্রহ, বনের আলু, পিঁপড়েও অনেকের খাদ্য। দারিদ্র্য ও অনুন্নয়ন এখানকার সাধারণ অবস্থা। পাথরখাদানে কিছু মানুষ কাজ করেন, এদের বেশিরভাগ ঠাকুরান পাহাড়ি গ্রামের পাথর শিল্পের মিস্ত্রি। এর গতিপথে দুটি শ্রুতি কথা রয়েছে। ১. শোলাঙ্কি রাজাকে অর্থাৎ রোহিনীর রাজা কে মারার পর অভিশাপ লেগে সাত বোনের মৃত্যু হয় তার জন্য সাতবোন রাজ্যের প্রহরায় মানুষের কল্যাণে লেগে যান। এই সাত বোন হলেন -

১. রক্ষা তারিণী (সর্ববিধ বিষয়ে রক্ষা করাই তার কাজ)।

২. দিয়াশি বুড়ি (বিপদের আভাস দেন এবং সংকেত পাঠান)।

৩. শাঁখারি বুড়ি (শাঁক বাজিয়ে বিপদের সংকেত দেন)।

৪. কাঁদুয়া বুড়ি (বিপদের আভাস পেলে তার কান্না শোনা যায়)।

৫. জাহিরা বুড়ি (জায়গা রক্ষণাবেক্ষণ করেন)

৬. সাঁপুয়া বুড়ি (রোগ এবং অভিশাপ থেকে রক্ষা করেন)।

৭. পুখুরিয়া বুড়ি (জলের রক্ষনাবেক্ষন করেন)।

ডুলুং আশ্রিত আরেকটি শ্রুতিকথা হল- শোলাঙ্কি রাজা যখন ডুলুং নদীতে স্নান করছিলেন তখন তার গায়ে লাগে প্রায় দশ হাত লম্বা একটি চুল। রাজা ওই নারীর খোঁজ করেন এবং ভ্রমরগড়ে বসবাসকারী বারুজীবি সম্প্রদায়ের সেই কন্যার খোঁজ পান। রাজা ওই কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। রাজার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় পরিবারের বিরুদ্ধে রাজার লেঠেলরা চরম অত্যাচার শুরু করে। অপমানে কন্যা নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। রাজার ক্রোধে ভ্রমরগড় সহ বারুজীবি সম্প্রদায়কে পুড়িয়ে মারে লেঠেলরা। আজও তাই ভ্রমরগড় পরিত্যক্ত।

ডুলুং নদীর উভয় তীরে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের মকর পরব সবচেয়ে বড় উৎসব। এই পরব চলে সাত দিন ধরে। এই পরবের অন্যতম উপাদান পিঠে পুলি, সঙ্গে থাকে টুসু, ভাদু, করম, বাঁধনা, গাজন, ইত্যাদি। এই উৎসব কালে কোন প্রতিকূলতায়ই মানুষকে আটকে রাখতে পারে না। জঙ্গলের বহুদূর গ্রাম থেকে শোনা যায় ধামসা মাদলের বোল। সেই ধ্বনি মানুষকে উতলা করে। এই ধ্বনিতে আদিবাসী সমাজের প্রাণে বেজে ওঠে অনন্তের আহ্বান। এই আহ্বান শোনা যায় দুটি ভিন্ন গানের পঙক্তিতে-

১. "আকাশ বছর আইলো ঝড়
উড়ায় নিল চালের খড়
খুদ কুঁড়া ঢুকে গেল ঢলরে
তবু মাস পিঠা হবেক মকরে"

২."ঝাড়গাঁর হাট টাতে

বেহাইয়ে ধইরল্য হাতে

বেহাইছো হাত

ঝুরিমাটি বিকেই সাঁধের ভাত।"

ডুলুং এর উভয়পাড়ের অন্যতম সংস্কৃতি হল সাঁওতালি সংস্কৃতি। ডুলুং তীরে রয়েছে বাঘেশ্বর পূন্যার্থীরা শিবের মন্দির। বিশেষ তিথিতে নতুনডিহি গ্রামে বাঘেশ্বর শিবের মাথায় ডুলুং এর জল ঢালে। এই মন্দিরের চারিদিক গাছ পালায় ঘেরা, অত্যন্ত শান্ত ও মনোরম। এখানে ডুলুং এর সৌন্দর্য্য কম নয়। পাশেই রয়েছে একটি শ্মশান এবং তার পাশে রয়েছে একটি কালী মন্দির। ঐতিহাসিক, গবেষক এবং পূন্যার্থীদের কাছে মন্দির একটি আকর্ষণীয় স্থান।

সুবর্ণরেখার ঐশ্বর্যে ভরপুর কাঁসাই এবং তারাফেনী গর্বে পরিপূর্ণ। কিন্তু ডুলুং যেন এলাকাবাসীর ঘরের মেয়ে। যে সারা বছরই শান্ত। শুধু প্রবল বর্ষায় হয়ে ওঠে অশান্ত ভয়ংকরী। তার তীরে তীরে রয়েছে জঙ্গল, পুরাতত্ত্ব এবং গর্ভের বালি। ডুলুং, সুবর্ণরেখা এবং কাঁসাই নদীর বালি এই অঞ্চলের অর্থনীতির উন্নতির অন্যতম হাতিয়ার।

তারাফেণী: গাডরাসিনি পাহাড়ের জমা বৃষ্টির জল ওপর থেকে নিচে নামার সময় পাথর কেটে ঘাঘরা জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে এবং সমতলে এসে এই জলধারার নাম হয়েছে তারাফেনী নদী। বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং শিক্ষক গোকুলানন্দ লাহার মতে- "এককালে এই নদীর উদ্দাম স্রোতে সৃষ্ট অজস্র ফেনা রাশি আকাশের তারার মতো ফুটে থাকতো বলেই এর নাম হয়েছিল তারাফেণী "। তারাফেনীকে নিয়ে একটি ছেলে ভুলানো ছড়া রয়েছে -

"ও নদীর জলটুকু টলমল করে

এ নদীর ধারেতে ভাই বালি ঝুরঝুর করে

চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফেটে পড়ে"।

তারাফেনী নদী ঝাড়গ্রাম জেলা অতিক্রম করে বাঁকুড়ার রায়পুর ব্লকে প্রবেশ করেছে। আবার এটি বেলপাহাড়ি অঞ্চলে বিনপুর-২ ব্লকের হাড়দা অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং শেষে দাড়িয়াডাঙার কাছে ভৈরববাঁকি নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই দুটি নদীর মিলিত রূপ লাঘাটার কাছে কাঁসাই নদীতে মিশেছে। তারাফেনী নদীর গহ্বরে পাওয়া যায় বাড়ি তৈরীর গুটি ও চুনের গুটি। তারাফেনী এবং ভৈরববাঁকি নদীর সঙ্গমস্থলে তৈরি হয়েছে তারাফেনী ব্যারেজ। তারাফেনী নদীর অববাহিকায় গভীর জঙ্গল রয়েছে, এখানে শাল, মহুয়া, পিয়াল, আকাশমনি এবং প্রচুর ভেষজ গাছ দেখা যায়। জঙ্গলে রয়েছে চিতাবাঘ, ভালুক, হায়না, শেয়াল, হরিণ, শূকর, হাতি, খরগোশ ইত্যাদি। তারাফেনীর গতিপথে রয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর ১ এবং ২ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম।

তারাফেনী নদীর অববাহিকায় প্রাচীন বসতি, শিল্প ও সংস্কৃতির উদ্ভব বহু আগেই হয়েছিল। এই নদীর অববাহিকায় আবিষ্কৃত বস্তুগুলি পরীক্ষা করে এর প্রমাণ মিলেছে। এই অববাহিকায় মানব সংস্কৃতির উত্তরণ ঘটেছে পর্যায়ক্রমে। এখানে ধুলিয়াপুরে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে এবং প্রাচীন শিকারজীবী মানুষের সন্ধান মিলেছে, আদিম মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এই নদীর বুক থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তারাফেনী নদীর অববাহিকায় মূলত আদি অস্ট্রোলয়েড অর্থাৎ নিষাদ

জাতির বাস। এদেরই বংশধর হলেন সাঁওতাল, লোধা, শবর, কোড়া প্রভৃতি জাতি। সাঁওতাল লোক পুরাণ অনুযায়ী 'সাওন্তভূম' অর্থাৎ সাঁওতাল ভূমি হল ঝাড়গ্রাম জেলার শিলদা পরগণা। তাই এখানকার সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানে আদিম মানুষের সংস্কৃতির ছাপ দেখা যায়। বিশিষ্ট গবেষক বিনয় ঘোষের মতে এই অঞ্চলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন মূলত সাঁওতালরাই। তারাফেনী নদীতে এখনো সোনার কণিকা পাওয়া যায়। এই নদীর অববাহিকায় পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেলেও এখানে তামার অস্ত্রের সন্ধান মিলেছে। এখানে তাম্র চুল্লি এবং পাথরের অস্ত্র তৈরির ছোটখাটো কারখানা তৈরি হয়েছিল। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ কৃষিজীবি এবং অত্যন্ত দরিদ্র। এছাড়াও মাছ ধরা, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ এবং তারাফেনী নদী থেকে পাথর সংগ্রহ এই অববাহিকা অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা। এই অববাহিকা লোকসংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। জঙ্গলজাত দ্রব্য সংগ্রহের পূর্বে সাঁওতালরা ফাল্গুন থেকে চৈত্র মাসে 'সারহুল' পুজো করেন। এরপর হয় বাহা পরব। বর্ষাকালে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে এখানকার পুরুষরা শিকার উৎসবে অংশগ্রহণ করতে যান। শিকার উৎসবে না গেলে কোন মেয়ে কোন যুবককে বিয়ে করবে না। টুসু পরব এই অঞ্চলের জাতীয় উৎসব।

বেঁচে থাকার তাগিদে কৃষি কাজ, মাছ ধরা ছাড়া এখানে কুটির শিল্পের প্রচলন রয়েছে। যেমন কেন্দা গ্রামের কুমোরেরা সরা, হাঁড়ি তৈরি করেন। বহু লোক বাড়ির রং করার কাজ করেন। মাটির কিংবা কাঠের পুতুল তৈরি করেন এবং আদিবাসীরা খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি করেন 'চাটাই'। বাবুই ঘাসের দড়ির শিল্প তারাফেনী অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা। বেলপাহাড়ির কুড়চিবনী গ্রামে বসবাসকারী মুচিরা ধামসা, মাদল, ঢাক,

ঢোল ইত্যাদি তৈরি করেন। এই বাদ্যযন্ত্রগুলি সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

৪.৯ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উৎসব সমূহ: - পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এই উৎসবগুলোর বেশিরভাগই মন্দির ভিত্তিক কিংবা তিথি ভিত্তিক। যেমন -

- **চন্দ্রকোনা ব্লক:** - চন্দ্রকোনা ব্লকে রয়েছে দত্ত বংশের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির ও লক্ষ্মী জনার্দনের রাসমঞ্চ। শারদীয়া দুর্গাপূজার সময়ে ভুবনেশ্বরীর বার্ষিকী পূজার অনুষ্ঠান হয় এবং পৌষসংক্রান্তিতে হয় দেবীর অন্নভোগ। এই উপলক্ষ্যে এলাকায় তৈরী হয় উৎসবের মেজাজ এবং এই সময়ে ভুবনেশ্বরী দেবীকে নৈবেদ্য দানের জন্য চাঁদশাহী খাজা তৈরি করা হয়। সমগ্র এলাকা বাৎসরিক এই পূজা অনুষ্ঠানকে ঘিরে উৎসবের মেজাজে মেতে ওঠে। এছাড়াও কার্তিক মাসে রাসমঞ্চ লক্ষ্মীজনার্দনের রাসলীলা উপলক্ষ্যে বিশাল রাস উৎসব হয় এবং রাস উৎসবকে ঘিরে বিশাল মেলা বসে। এলাকার মানুষরা দত্ত বংশের শুরু করা ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজা এবং জনার্দনের রাস উৎসবকে নিজেদের উৎসব বলেই গ্রহণ করেছেন।
- **সবং ব্লক:** - এই ব্লকে প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তির সময়ে কেলেঘাই নদীর তীরে কোলন্দা গ্রামে বিশাল মেলা বসে। কোলন্দা গ্রামের এই মেলার উপাস্য দেবতা রাধাকৃষ্ণ। প্রায় এক মাস ধরে এই মেলা চলতে থাকে। সবং, পটাশপুর দুটি ব্লক তো বটেই পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর

জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এই মেলাতে আসেন বিভিন্ন কেনাকাটার জন্য। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে এটি এই অঞ্চলের সব থেকে বড় উৎসব।

- **কেশিয়াড়ি ব্লক:** - কেশিয়াড়ি ব্লকের ঝড়েশ্বরপুর মৌজায় কুসমী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে বাসুলি মায়ের থান। এখানে নিত্য পূজা হয়। তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের হরিপদ দোলাই চার পুরুষ ধরে এই বাসুলি মায়ের থানে পূজা করছেন। আনুমানিক কত বছর আগে এই মায়ের থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বলা সম্ভব নয়। বাসুলিমা অতি জাগ্রত দেবী। প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তির দিন এখানে মায়ের বিশেষ পূজা হয়। এই পূজায় পাঁঠাবলি, মোরগ বলি, ঝুরি (মদ) ভোগ দেওয়া হয় প্রসাদ হিসাবে। এই দিন এখানে বড় মেলা বসে, হাজার হাজার মানুষ বাসুলী মায়ের থানে এই দিন মিলিত হন। মকর সংক্রান্তিতে সকাল বেলায় বৈগা-মাহাতো সম্প্রদায়ের মায়েরা টুসু ঠাকুর হাতে নিয়ে কুসমী নদীর স্বচ্ছ শীতল জলে ভাসাতে যান। তখন তারা দলবদ্ধ হয়ে গান ধরেন-

> "কুশমি খালের ধারে ধারে কাশি ফুলের ওড়না।
>
> ওগো কাশি ফুলের ওড়না।
>
> কাড়া বাগাল বাজায় বাঁশি গো।
>
> পিরিত করার ছলনায়।
>
> ভাদর মাসে ভাদর টানে কুসুমী নদী মলকিছে।
>
> টুসু যাবেন মকর স্নানে গো-ডুঁবু পিঠা বলকিছে"।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কেঠিয়া নদীর বাম তীরে কাশিগঞ্জ গ্রামে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ফরাসীরা এখানে বসবাস ও ব্যবসা শুরু করেন এবং ইংরেজরা পরবর্তী সময়ে নীল চাষ ও নীল উৎপাদন করতেন। ১৮৩৫-১৮৬৮ সালে এখানে দুটি ফরাসি মাধ্যম বিদ্যালয় ছিল। এখানে রয়েছে বিখ্যাত ভান্ডার চন্ডীর মন্দির। এই দেবীর দাঁতগুলি ছিল হীরে দ্বারা নির্মিত। পরবর্তীকালে দস্যুরা হীরক খচিত দন্তগুলিকে চুরি করেন। ভান্ডার চন্ডী মন্দিরে বলি দেওয়ার এক বিশেষ রীতি রয়েছে। এখানে খোলা অবস্থায় ছাগ কে বলি দেওয়া হয়। যূপকাষ্ঠে বা স্তম্ভে তাকে বাঁধা হয় না। বলির পূর্বে ছাগকে পূজার প্রসাদী আতপ চাল, ফলমূল ও দেবীর প্রসাদী বেলপাতা খেতে দেওয়া হয়। বলির ছাগটি খেতে শুরু করলে ঘাতক খড়্গাঘাতে বলি পর্ব সমাধা করেন। এই গ্রামের মেয়ে বউরা নিয়মিত ভান্ডার চন্ডীর মন্দিরে সন্ধ্যা দ্বীপ জ্বালেন।

কেঠিয়া নদীর তীরে জাড়া গ্রামের নাম 'কবি কঙ্কন চন্ডীতে' উল্লেখ রয়েছে। এই গ্রামের কালু রায় ধর্ম ঠাকুরের নাম 'দিক বন্দনা' অংশে দেখা যায় যেমন-

"জাড়া গ্রামে বন্দিলাম

ঠাকুর কালু রায়"।

জাড়ার রায় বাবুদের শীতলা পূজা উপলক্ষে ১৮৬৯ সালে যে কবি গানের আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা আজও কিংবদন্তি। এই গানে অংশ নিয়েছিলেন সেই সময়ের দুজন প্রখ্যাত কবিয়াল চন্দ্রকোনার যজ্ঞেশ্বর সিংহ ওরফে জগা ধোপা এবং ঘাটালের হরিবোল দাস। কবি গানে সেদিন জগা ধোপা প্রথম জাড়ার প্রশংসা করে গাইলেন-

"জাড়া গোলক বৃন্দাবন

জাড়ার পরব্রহ্ম বাবুগণ

যেমন গোলক হতে গোকূলেতে অবতীর্ণ গোবর্ধন"।

এর উত্তরে হরিবোল দাস গাইলেন-

"কি করে বললি জগা জাড়া গোলক বৃন্দাবন।

যেথায় বামুন রাজা, চাষী প্রজা চারিদিকে তার বাঁশের বন"।

আজও জাড়ার রায়বাবুদের শীতলা পূজা উপলক্ষ্যে কবি গানের আসর বসে। শীতলা পূজা এই এলাকার একটি মহামিলনের তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে। শীতলা মায়ের পূজা দিতে, ভোগ পেতে এবং কবি গানের আসরের আমোদ টুকুকে শুষে নিতে এখানে হাজার হাজার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এবং সাধারণ মানুষ একত্রিত হন।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপগড় এর সুখ্যাতি এখানকার কলেজের জন্য। কংসাবতী নদীর তীরে গোপগড়ে রয়েছেন গোপনন্দিনী দেবী। স্থানীয়দের কাছে তিনি শীতলা মাতা নামে পরিচিত। গোপ নন্দিনী দেবীর মন্দিরেও সংক্রান্তির দিনে বিশেষ মেলা উৎসব হয়। মেদিনীপুর, লাগুয়া কংসাবতীর তীরে ধেড়ুয়ায় অচেনা প্রকৃতির জঙ্গলমহলের এলাকা গুলি থেকে মানুষরা এখানে একত্রিত হন এবং এই মেলা উৎসবে মেতে উঠেন। গোপ নিয়ে তাই বলা হয়েছে-

"পাহাড় দুর্গ

কোন এক রাজা

স্রোতস্বিনী কংসাবতী

জিজ্ঞাসা হাজ”।

কুবাই নদীর তীরে কেশপুর ব্লকের ঐতিহাসিক গ্রাম গড়সেনাপত্যা তে রাজা ত্রিলোচন দেবের আমল থেকে দেবী অষ্টাদশভূজা দুর্গাপূজার প্রচলন এবং উৎসব শুরু হয়। এখনো অষ্টাদশভূজা দূর্গাপূজার চল এখানে রয়েছে। এই পূজাকে কেন্দ্র করে মেলা ও যাত্রা উৎসব হয়।

৪.১০ ঝাড়গ্রাম জেলার উৎসব সমূহ:

ঝাড়গ্রাম জেলার লোধাশুলির নিকট চাঁদপাড়া মৌজাতে কুয়াড়ি নদীর পাড়ে গরাম বুড়ির থানে মাহাতো, মুন্ডা এবং সাঁওতালরা নিয়মিত ভক্তি ভরে পুজো করেন। গরাম বুড়ির থানকে কেন্দ্র করে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে এখানে মেলা বসে। এছাড়াও মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে ঘাটে মকর সংক্রান্তির সকালে টুসু ভাসানোর সাড়া পড়ে যায়। এলাকার বাগদি, মাহাতো, মুন্ডা, সাঁওতাল এবং ক্ষত্রিয় জাতের মানুষরা টুসু পরবে গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন সমাজের কথা, প্রেমের কথা, প্রকৃতির কথা, নদীর কথা। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সূচিত হয় ঝুমুর লোকগান। যেমন

"কুয়াড়ির দুই ধারে।

আমরা চাষ করি গো সকলে।

সোনার ফসল তুলি সবার ঘরে।

ও চাষ বাঁচাই কুয়াড়ির-ই জলে"।

কুবাই নদীর তীরে দরখোলা বা দ্বারখোলা গ্রামের দক্ষিণ পূর্বে কচ্ছপের পিঠের মতো আকৃতির এক বিশাল পাথুরে এলাকার টিলার ওপর বিশাল বট গাছের নীচে রয়েছেন দেবী চামুণ্ডা। যিনি 'মোদমদমা' নামে পরিচিত। এইখানে সধবারা তেল সিঁদুর দিয়ে দেবীকে বরণ করেন। শয়ন একাদশীর দিন এখানে 'জাতাল ভোগ' দেওয়া হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে গ্রামের মানুষরা একত্রিত হয়ে উৎসব পালন করেন। পয়লা মাঘ এখানে ভক্তরা মাটির হাতি ঘোড়া প্রভৃতি দিয়ে পূজা দেন। কালীপূজা উপলক্ষে এখানে আগে মহিষ বলি হত। এখনো কালী পূজার দিন এখানে বড় মেলা বসে এবং জঙ্গলমহলের দূর দুরান্ত থেকে অ-আদিবাসী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা একত্রিত হন।

ঝাড়গ্রাম জেলায় ডুলুং নদীর তীরে কালেশ্বর মন্দিরে প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয় মঙ্গলবারে খুব বড় মেলা বসে। এটি গাজনের মেলা বা উড়া মেলা নামে পরিচিত। এই ব্যতিক্রমী গাজন উৎসবটি জঙ্গলমহলের বিরল সংস্কৃতির বাহক। এই শিবের মাহাত্ম্য বলেই স্থানীয় আদিবাসী ভক্তরা 'কালবুঁদি' নামক দুটি লোহার কাটা দিয়ে পিঠে ফুটো করে গাজনের গাছে উড়তে থাকে। ঝাড়গ্রাম জেলার কেলেঘাই নদীর অববাহিকায় কালুন্দির থানের সামান্য দূরে বিখ্যাত গুপ্তমনি মন্দির, গ্রামের নাম পাথরবাটি। গুপ্তমনি মন্দিরে রয়েছেন মা জয়চন্ডী। তিনি হাতির

উপরে বসেছেন আর দুপাশে রয়েছেন লক্ষ্মী ও গণেশ। বিগ্রহের দুদিকে সিন্দুর মাখানো পোড়া মাটির বিরাট হাতি। এখানে লোধারাই মন্দিরের মুখ্য পূজারী। এই মন্দিরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে উৎসব হয়। এখানে প্রচুর বলি দেওয়া হয়। মা জয়চন্ডীর মন্দিরে দুটি হাড়িকাঠ আছে একটি ছাগ বলি ও অন্যটি মহিষ বলির জন্য। দুর্গাপূজায় মা জয়চন্ডী মন্দির এর উৎসবে সর্ব ধর্মের মানুষ এমনকি মুসলমানরাও এখানে পূজা দেন।

ঝাড়গ্রাম জেলার কাঁসাই নদীর তীরে সিজুয়া গ্রামে সতীশ চ্যাটার্জির শুরু করা কালী পূজা এখন ১৫০ বছর অতিক্রান্ত। এখানেই রয়েছে বামাসিনি ও বাগরাইসিনি নামের ২ টি লোকদেবীর থান। এছাড়াও রয়েছে ৫০০ বছরের অধিক বিষ্ণুচক্র বিশিষ্ট একটি ভাঙ্গা মন্দির। কালীপূজা উপলক্ষে এখানে বিশাল মেলা বসে। বছরে দুবার এখানে কালীপূজা উৎসব এবং মকর সংক্রান্তির পরের দিন লোকদেবীর থানে জমজমাট মেলা। বহু দূর-দূরান্ত থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা তাদের উৎসবের পোশাকে সজ্জিত হয়ে ধামসা মাদল বাজিয়ে মেলা প্রাঙ্গনে আসেন এবং নাচ, গান করেন। সিজুয়া গ্রামটি বিনপুর-১ নম্বর ব্লকে রয়েছে। সিজুয়া সম্পর্কে প্রাচীনতম গানটি হলো-

"আদিম সে পুরাভূমে।
মানব মানবী।
সাক্ষী কেবল কংসাবতী।
তাহাদের জীবনযাপন" ।

কংসাবতী নদীর তীরে লালগড় বিভিন্ন কারণে বিখ্যাত। লালগড়ের রাজবাড়ির দুর্গাপূজা ৩০০ বছরের অধিক পুরানো। রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণ বলরাম, রাধামোহন এবং শ্রীমতি রাধারাণীর রাস উৎসব। এই অনুষ্ঠানগুলি উপলক্ষ্যে লালগড় রাজবাড়ির মন্দির গুলিতে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। লালগড়ের আরেকটি সামাজিক উৎসব হলো কাঁসাই নদীর তীরে টুসু পরব। এবং এই উপলক্ষ্যে বুড়াবুড়াম থানের মেলা। এই মেলাতে অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা উৎসবের মেজাজে ভিড় করলেও মূল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা বহুদূর থেকে পরবের পোশাক পরে এখানে একত্রিত হন এবং নাচ গান করেন। বিনপুর-১ ব্লকে অবস্থিত লালগড় সম্পর্কে প্রচলিত গানটি হল-

"রাঙামাটিতে লাগে রাজগরিমা জঙ্গল বদলায় জনপদ।

মন্দিরে বাজে ঘন্টা কাঁসর।

পাড় ভাঙ্গে কংসাবতী"।

৪.১১ পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট সাঁওতালি লেখক-

❖ **সুরেন্দ্রনাথ হেমব্রম** - ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসের ১৮ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত শালবনি গ্রামে সুরেন্দ্রনাথ হেমব্রম এর জন্ম হয়। তার পিতার নাম সনাতন হেমব্রম, মাতা রাইমনি হেমব্রম। বর্তমান বাসস্থান বেলদার কাছে নেকুড়সেণী গ্রামে।

নেকুড়সেণী বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন থেকে মাধ্যমিক পাস করে আর পড়াশোনা করেননি, চাষবাস কে নিজের পেশা হিসেবে বেছে নেন।

৯০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কবিতা ছাড়াও গল্প, প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন। ২১ শতকের কবি পরিচিতি পান এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন সাঁওতালি খবর কাগজে সাংবাদিকতার কাজ করেন।

❖ **বিজয় কুমার টুডু - ১৯৬৫** সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার অন্তর্গত ডুকি ডাকঘরের অধীন আটাবাঁদা গ্রামে কাব্য চর্চায়রত বিজয় কুমার টুডু র জন্ম। পিতার নাম লক্ষণ টুডু, মাতা খান্দিমনি। বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ায় থাকেন। রেলওয়ের কর্মী ছিলেন।

৯০ এর দশকে সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ২১ শতকের কবি পরিচিতি লাভ করেন। বিজয় কুমার টুডু কবিতা, গান, নাটক লিখতেন এবং তা বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ গুলির মধ্যে অন্যতম হল 'সেবেল joj' 'খেরওয়াল আরসি' এবং ২০০৩ সালে 'চিরগৌল চির' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

❖ **বৈদ্যনাথ হাঁসদা** - পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পড়িহাটি ডাকঘরের অধীন মামুরদা গ্রামে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৈদ্যনাথের জন্ম।পিতার নাম মদন হাঁসদা, মাতার নাম লক্ষীমণি। ছাত্রজীবন থেকে সাহিত্য চর্চার সাথে যুক্ত ছিলেন। হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তিনি। কবিতা ছাড়া প্রবন্ধ রচনা করতেন এবং তা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত। সামাজিক উন্নয়ন এবং বিদ্রোহ মূলক কবিতা ছিল তাঁর লেখার মূল বিষয়বস্তু।

❖ **কালিদাস সরেন - ১৯৭২** সালের মার্চ মাসের ২২ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ি থানার অন্তর্গত সন্দাপাড়া ডাকঘর এর অধীন ঝাটিয়াড়া গ্রামে কালিদাস সরেনের জন্ম হয়। পিতা শ্যামচাঁদ সরেন, মাতা হলেন রায়মনি সরেন।

সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করে দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানাতে কাজ করেন। ছাত্র জীবন থেকে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখলেও একবিংশ শতাব্দীতে পরিচিতি লাভ করেন।

❖ **শৈলজানন্দ হাঁসদা - ১৯৪২** সালের আগস্ট মাসের ২৪ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিনপুর থানার অন্তর্গত জানুমঘুটু গ্রামে শৈলজানন্দ হাঁসদা র জন্ম হয়েছিল। পিতা সুবল হাঁসদা নাট্যকার ছিলেন। মাতার নাম ছিল দুখনী I

১৯৬৬ সালে বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজ থেকে বি.এ পাস করে চাকরিতে জয়েন করেন। পরে আদিবাসী এবং তপশিলি কল্যাণ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী নিযুক্ত হন। ২০০২ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। 'সাগেন সাঁওতা' সাহিত্য পত্রিকা এবং ‘কেওঝারি বাহা' তে ২০০৪ সালে কবিতা প্রকাশ করেন।

❖ **পঞ্চানন হাঁসদা** - লেপা হাঁসদা এবং শালগী হাঁসদার পুত্র **১৯৪৬** সালের মে মাসের ২০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চিলাগোড়া গ্রামে পঞ্চানন হালদার এর জন্ম হয়।

ছাত্র জীবন থেকে সাহিত্যের সাথে যুক্ত হয়ে বহু কবিতা গল্প বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পঞ্চানন হাঁসদা মেদিনীপুর কেডি কমার্স কলেজ থেকে বি কম পাস করার পর সরকারি

চাকরিতে যোগ দেন ১৯৬৯ সালে। 'মার্শাল তারাশ' খবর কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল।

❖ **নরেন্দ্রনাথ হাঁসদা** - ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরপুর অঞ্চলের বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন। গল্পকার প্রাবন্ধিক বেতার নাট্যকার নরেন্দ্রনাথ হাঁসদা তিনি গ্র্যাজুয়েট। শারীরিক কারণে সাহিত্য চর্চা থেকে সরে আসলেও তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বেতার নাটকগুলো হল 'উইহৌর', 'হিলি দুলৌড়', 'হৌরয়ৌড় দিশম'। 'মার্শাল গাঁওতা' প্রকাশিত পত্রিকার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি রোমান্টিক গল্প, সমাজের বাস্তব সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা, মানবিক আবেগ অনুভূতি ও সম্পর্ক নিয়ে নাটক লিখেছে।

❖ **রামেশ্বর মুরমু** - গোবর্ধন মুর্মু এবং ফুলমণি মুর্মুর পুত্র পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জামবনী থানার অন্তর্গত ডাক গ্রামারিয়া গ্রামে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কুড়ি তারিখে রামেশ্বর মুর্মুর জন্ম হয়।

প্রি–ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পড়াশোনা করে কলকাতাতে জীবন বীমা নিগমের কর্মী ছিলেন। আর বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

'আদিম সান্তাড়' ছদ্মনামে প্রবন্ধ ও নাটক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ৯০ দশকের কবি পরিচিতি লাভ করেন। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করতেন। হুগলি জেলায় হোড়োয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী রামেশ্বর মূর্মু কে AISWA–এর পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয় লেখক হিসাবে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুলি হল–

১) "পূর্বপুরুষদের কথিত বাণী"(হাপড়াম ক লৌহ ইট আকাত)

২) পূজার স্তোত্র (বঙ্গা বাঁখেড়)

৩) জাহের পূজা (জাহির বঙ্গা সন্তারক)

তাঁর লেখা অন্যতম নাটক “কাসতাও আড়াং” আকাশবাণী কলকাতায় সাঁওতালি অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়।

❖ **বাসুদেব সরেন** - সামাজিক যাত্রাপালা থেকে সরে এসে নতুন ঢঙের যাত্রাপালাকার বাসুদেব সরেন এর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি ব্লকের কুবাই গ্রামে। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা গুলি হল– ১) ইড়িঁজ মে সারা সেঁগেল (চিতার আগুন নিভিয়ে দাও)

২) খের ওয়াল আরসি

৩) লাড় সাকাম ধুড়ি সিঁদুর

৪) ডাহার চাঙায়েনা দ বাটি রে।

❖ **যদুনাথ মুর্মু-** পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সন্দাপাড়া ডাকঘরের অধীন গাওয়ার গ্রামে নাট্যকার যদুনাথ মুর্মুর জন্ম হয়। সামাজিক সমস্যার সঙ্গে মানবিক আবেদনকে সংযুক্ত করে তিনি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা নাটক গুলি আকাশবাণী কলকাতায় সাঁওতালি অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়।। মূলত ছাত্র জীবন থেকেই একাঙ্ক নাটক রচনার প্রতি এবং যাত্রাপালার

প্রতি তাঁর গভীর আসক্তি ছিল। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বেতার নাটক গুলি হল নাচা,মাঘবংগা ,সারি দুলৌড়,ডৌন ,বয়হা মায়াম,সাগুন সিঁদুর (পবিত্র সিঁদুর, ১৯৯৮), সনেগড় শিকড়ী (সোনার শৃঙ্খল, ১৯৯৯)।

❖ **তারা সিং বাস্কে** - টি.সি. বাস্কে নামে পরিচিত হলেও তাঁর আসল নাম টুরয়ৌ চাঁদ বাস্কে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বনপুকুরিয়া ডাকঘরের অধীন পাকুড়িয়া গ্রামে ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক তারাসিং বাস্কে এর জন্ম হয়। পিতার নাম পানু বাস্কে এবং মাতার নাম শীতল মনি বাস্কে।

পাকুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন এবং বনপুকুরিয়া আদিবাসী জুনিয়র হাই স্কুলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েন। রামগড় মোক্ষদা সুন্দরী হাইস্কুল থেকে ১৯৮৪ সালে মাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৮৬ সালে নয়াবসত পার্বতীময়ী শিক্ষানিকেতন থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেন। এক বছর ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে পড়ার পর নব্বই সালে বি.এ পাস করেন শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ থেকে।

১৯৯০ সালে রেলের চাকরিতে যোগ দেন। রেলের চাকরি ছেড়ে ১৯৯৫ সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার কাছে বাবুপুর এ জি হাই স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। ৭০ এর দশকের সময় রামগড় মোক্ষদা সুন্দরী হাই স্কুলে পড়াকালীন রাজশাহীতে সম্পাদক দাখিন মুর্মুর সংস্পর্শে আসেন এবং লেখার অনুপ্রেরণা পান। স্কুল জীবন থেকেই স্কুলের ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতা নির্বাচিত হয়। 'রিমিল' পত্রিকার মাধ্যমে সাঁওতালি সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সাঁওতালি পত্রপত্রিকায় তার লেখা বহু কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প নিয়মিতভাবে প্রকাশিত

হতো। তাঁর কবিতায় মননশীল চেতনার এবং প্রগতিশীলতার আভাস পাওয়া যায়। আবেগ নয় বাস্তবের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যন্ত্রনা অনুভূত হতো তাঁর কবিতায়। তিনি “তীরন্দাজ” এবং ১৯৯৯ সালে দ্বি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা “জিউয়ি” সম্পাদনা করেন। তাঁর প্রকাশিত বই গুলির মধ্যে অন্যতম হলো–

১) "জ্বালা" কাব্যগ্রন্থ। ১৯৯৩ সালে প্রথম খন্ড ১৯৯৯ সালে দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়।

২) আতু: মেরে টাটিঝারি (বহে চলে টাটিঝারি। ১৯৯৭ সালে প্রথম খন্ড প্রকাশিত হলেও দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশের সন জানা যায়নি) ।

৩) মিত ধাও কয়গ মে (একবার দেখ), ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৪) গেলবার আটাল (দ্বাদশ নাচের দল), ১৯৯৯ সালে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়।

৫) দুলৌড় মায়া (প্রেমের ছলনা) ।

৬) দুক দুলৌড় তালা (দু:খ প্রেমের মাঝে), ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৭) মিৎ ডালিচ বাহা (এক স্তবক ফুল), ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়।

৪.১২ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রতিটি ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থান:

পিংলা ব্লক: - পিংলা ব্লকের মোট আয়তন ২২৮.৪৮ কিলোমিটার। ২০১১ সালে ভারতের আদমশুমারি অনুযায়ী পিংলা ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৫৪,৮০৯ জন। যার মধ্যে পুরুষের

সংখ্যা ছিল ৯৯,৯৮৮ (৫১%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৯৪,৮২১ (৪৯%) জন। এই ব্লকের সব মানুষই গ্রামে বসবাস করতেন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পিংলা ব্লকে মোট শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১,৪৩,৮৮২ জন যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৭৯,৬৫৭ (৯০.২২%) এবং মহিলার সংখ্যা ৬৪,১৬৫ (৭৬.৫৭%) স্বাক্ষরতার হারে লিঙ্গ ব্যবধান ছিল (১৩.৬৫%)

- **সবং ব্লক:** - সবং ব্লকের আয়তন ৩০৫ কিমি। এই ব্লক সবং থানার অধীনে অবস্থিত এবং এর সদর দপ্তর সবং।

২০১১ সালের ভারতের আদমশুমারি অনুযায়ী সবং ব্লকে মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৭০,৪৯২ জন। এরমধ্যে ১,৩৮,৯২৪ (৫১%) জন পুরুষ এবং ১,৩১,৫৬৮ (৪৯%) জন মহিলা ছিলেন। এই ব্লকে তপশিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ৩৬,০৬৪ (১৩.৩৩%) এবং তপশিলি উপজাতির মানুষের সংখ্যা ১৬,৮১৮ (৬.২২%) জন। এই ব্লকের সব মানুষই গ্রামে বসবাস করেন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সবং ব্লকের শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল ২,০৭,৩৭০ জন, যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ১,১৪,৩০৪ (৯৩.১৬%) জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৯৩,০৬৬ (৮০.১৫%) জন। স্বাক্ষরতার হারে লিঙ্গ ব্যবধান ছিল (১৩.০১%) ।

➢ **ডেবরা ব্লক:** - ডেবরা ব্লকের ক্ষেত্রফল ৩৪২.৪১ কিলোমিটার। এই ব্লকটি ডেবরা থানার অধীনে রয়েছে এবং এর সদর দপ্তর বালিচক। এই ব্লকে বনভূমির পরিমাণ ছিল ৫৪০ হেক্টর।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ডেবরা ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৮৮,৬১৯ জন যার মধ্যে ২,৭৪,৮৩৫ জন গ্রামে এবং ১৩,৭৮৪ জন শহরে বসবাস করতেন। মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২,৪৫,৫৫৯ (৫০%) জন পুরুষ ছিলেন এবং ১,৪৩,০৬০ (৫০%) জন মহিলা ছিলেন।

এই ব্লকে তপশিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ৩৭,৫০৩ (১২.৯৯%) জন এবং তপশিলি উপজাতি মানুষের সংখ্যা ৫৯,১২২ (২০.৪৮%) জন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ডেবরা ব্লকে মোট স্বাক্ষর মানুষের সংখ্যা ২,১০,৬১৮ জন। যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ১,১৪,৯৯২ (৮২.০৩%) এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৯৫,৬২৬ (৭৫.১৬%) স্বাক্ষরতার হারে লিঙ্গ ব্যবধান ছিল (১৩.৬২%) ।

- **মেদিনীপুর ব্লক:** - মেদিনীপুর ব্লকের আয়তন ৩২৩.৬৪ কিলোমিটার। এই ব্লকটি মেদিনীপুর থানার অধীনে অবস্থিত এবং এই ব্লকের সদর দপ্তর বড়পাথর সেনানিবাসে। এই ব্লকে ৫৯৪০ হেক্টর বনভূমি ছিল।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মেদিনীপুর ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৯১,৭০৫ জন। মোট জনসংখ্যার ৯৭,৪৯০ (৫১%) জন পুরুষ এবং ৯৪,২১৫ (৪৯%) জন মহিলা ছিলেন। এই ব্লকে তপশিলি জাতের মানুষের সংখ্যা ৩৭,৪৪৫ (১৯.৫৩%) জন এবং তপশিলি উপজাতির মানুষের সংখ্যা ৩৩,৮৬৯ (১৭.৬৭%) জন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মেদিনীপুর ব্লক এ মোট শিক্ষিত ব্যক্তির পরিমাণ ছিল ১,১৬,৮৩৭ জন যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৬৬,১৪৫ (৭৮.৪৩%) মহিলার সংখ্যা ৫০,৭০২ (৬২.২৪%) স্বাক্ষরতার হারে লিঙ্গ পার্থক্য ছিল (১৬.১৯%) ।

- **গড়বেতা ব্লক-১:** - গড়বেতা- ১ ব্লকের মোট আয়তন ৩৬১.৮৭ কিলোমিটার। এই ব্লকের বনভূমির পরিমাণ ছিল ৭৪৬০ হেক্টর। এই ব্লকটি গোয়ালতোড় এবং গড়বেতা থানার অন্তর্গত। এই ব্লকের সদর দপ্তর গড়বেতায় অবস্থিত।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী গড়বেতা-১ ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ২,২৮,৫১৩ জন ২,১৮,২৩৯ গ্রামে এবং ১০,২৭৪ জন শহরে বসবাস করতেন। মোট জনসংখ্যার ১,১৬,৬২০ (৫১%) জন পুরুষ এবং ১,১১,৮৯৩ (৪৯%) জন মহিলা ছিলেন। তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ৫৫,১৩৩ (২৪.১৩%) জন এবং তপশিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ১৮,১৩৪ (৭.৯৩%) জন।

➢ **গড়বেতা ব্লক-২:** - গড়বেতা-২ ব্লকের মোট আয়তন ৩৯২.৫৫ কিলোমিটার। এটি গোয়ালতোড় এবং গড়বেতা থানার অন্তর্গত। এই ব্লকের সদর দপ্তর গোয়ালতোড়ে। এই ব্লকে ৭৪৬০ হেক্টর বনভূমি ছিল।

ভারতে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী গড়বেতা ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৪৮,৪১০ জন। যার মধ্যে সবাই গ্রামে বসবাস করতেন। মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৭৫,১৬৫ জন পুরুষ এবং ৭৩,২৪৫ জন মহিলা ছিলেন। তপশিলি জাতির সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৯,৩০১ (২৬.৪৮%) এবং তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ২৯,৬৬৯ (১৯.৯৯%) জন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই ব্লকের মোট শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৯৯,৬২১ যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৫৫,৮৭৭ (৮৪.১৪%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৪৩,৭৪৪ (৬৭.৪১%) জন। এক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলার সাক্ষরতার হারে লিঙ্গ ব্যবধান ছিল (১৬.৭৩%)।

- **গড়বেতা ব্লক-৩:** - গড়বেতা-৩ ব্লকের মোট ক্ষেত্রফল ৩১২.১২ কিলোমিটার। এই ব্লকটি গড়বেতা এবং গোয়ালতোড় থানার অন্তর্ভুক্ত। এই ব্লকের সদর দপ্তর সাতবাঁকুড়ায় অবস্থিত। এই ব্লকের মোট বনভূমির পরিমাণ ছিল ৬,২৪২ হেক্টর।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী গড়বেতা-৩ ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৬৯,৫২৮ জন। যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৮৬,০২৩ (৫১%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৮৩,৫০৫ (৪৯%) জন। এর মধ্যে তপশিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ২৬,০০৪ (১৫.৩৪%) এবং তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ২৩,৯৫৫ (১৪.১৩%) জন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী গড়বেতা-৩ ব্লকে এর জন সংখ্যা ছিল ১,০৮,৮৮৫ জন যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৬০,২৪৩ (৭৯.৮৯%) এবং মহিলার সংখ্যা ৪৮,৬৪২ (৬৬.৭২%)। সাক্ষরতার হারে লিঙ্গ ব্যবধান ছিল (১৩.১৮%) ।

কেশপুর ব্লক: - কেশপুর ব্লকের মোট আয়তন ৪৮৩.১৫ কিলোমিটার। ব্লকটি কেশপুর এবং আনন্দপুর থানার অন্তর্গত এবং এই ব্লকের সদর দপ্তর কেশপুরে। এই ব্লকে ২০৭০ হেক্টর বনভূমি ছিল।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে কেশপুর ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩,৩৯,২৪৮ জন। যার মধ্যে ১,৭৩,৫০৪ (৫১%) জন পুরুষ এবং ১,৬৫,৭৪৪ (৪৯%) জন মহিলা ছিল। তপশিলি জাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৮৯,৭২৬ (২৬.৪৫%) জন এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ১৯৬১৬ (৫.৭৮%) ।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কেশপুর ব্লকের মোট শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল ২৯,২১৮ জন। যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ১,২৮,৩৪৫ (৮৫.২৪%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ১,০০,৮৭৩ (৭০.৮১%) জন। শিক্ষিতের হারে লিঙ্গগত ব্যবধান ছিল (১৫.০৬%) ।

- **শালবনি ব্লক:** - এই ব্লকের মোট আয়তন ৫৫৩.৩৯ কিলোমিটার। এই ব্লকের সদর দপ্তর শালবনি এবং এটি শালবনি থানার অন্তর্গত। শালবনি ব্লকে ১৮ হাজার ৬৮৮ হেক্টর বনভূমি ছিল।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী শালবনি ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৮৮ ৬৫৩ জন এরমধ্যে ৯৫,১৯৫ (৫০.৪৬%) পুরুষ এবং ৯৩,৪৫৮ (৪৯.৫৪%) জন মহিলা ছিল। তপশিলি জাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ ছিলেন ৩৫,০৯৫ (১৮.৬১%) এবং তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ ছিলেন ৩২,৭৭১ (১৭.৩৮%) জন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী শালবনি ব্লকে মোট স্বাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১২৩৯৭৪ জন। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৬৯,২৯৯ (৮২.৮৯%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৫৪,৬৭৫ (৬৬.৭০%) । স্বাক্ষরতার হারে লিঙ্গগত ব্যবধান ছিল (১৬.১৯%) ।

➢ **চন্দ্রকোনা ব্লক-১:** - চন্দ্রকোনা ব্লকের মোট আয়তন হল ১৯৩.৫৪ কিলোমিটার। ব্লকটি চন্দ্রকোনা থানার অধীনে অবস্থিত এবং এই ব্লকের সদর দপ্তর বামারিয়া,ক্ষীরপাই।

ভারতে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৩৬,০০৬ জন। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৬৯,৮২০ (৫১%) জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৬৬,১৮৬ (৪৯%)। তপশিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ৪৬,৭৫৯ (৩৪.৩৮%) জন এবং তপশিলি উপজাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ৭,৫১৬ (৫.৫৩%) জন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী চন্দ্রকোনা ব্লকে মোট স্বাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৯৫,৪৫২ (৭৮.৯৩%) জন। যার মধ্যে পুরুষের সাক্ষরতার হার ছিল ৫২,৭৭৭ (৮৫%) এবং মহিলাদের

স্বাক্ষরতার হার ছিল ৪২,৬৭৫ (৭২.৫৩%) জন। স্বাক্ষরতার হারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের লিঙ্গ ব্যবধান ছিল ১২.৪৮%।

- **চন্দ্রকোনা ব্লক-২:** - চন্দ্রকোনা-২ ব্লকের মোট আয়তন হল ১৫০.৪৪ কিলোমিটার। ব্লকটি চন্দ্রকোনা থানার অধীনে অবস্থিত এবং এর সদর দপ্তর চন্দ্রকোনায়। এই ব্লকের বনভূমি ছিল ১০৫০ হেক্টর।

ভারতে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে চন্দ্রকোনা-২ ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,২৩,২৬৯ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৬৩,১৮০ (৫১%) জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৬০,০৮৯ (৪৯%) জন। তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৭,৩৩০ (৩০.২৮%) এবং তপশিলি উপজাতির মানুষের সংখ্যা ৬,৮৪১ (৫.৫৫%) জন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই ব্লকের মোট শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল ৮৩,১৪৫ জন। যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪৬,০৮৬ (৮৩.০৩%) জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৩৭,০৫৯ (৭০.৪৯%) । স্বাক্ষরতার হারে এই ব্লকে লিঙ্গগত পার্থক্য ছিল ১২.৬০%।

- **দাসপুর ব্লক-২:** - দাসপুর -২ ব্লকের মোট আয়তন হল ১৬৫.৪৫ কিলোমিটার। ব্লকটি দাসপুর থানার অধীনে অবস্থিত এবং এর সদর দপ্তর হল সোনাখালি।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দাসপুর ব্লক এ মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৩৮,৫২৯ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ১,২১,৭৪২ (৫১%) জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ১,১৬,৭৮৭ (৪৯%) জন। এই ব্লকে তপশিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ২৯,৯২২ (১২.৫৪%) জন এবং তপশিলি উপজাতির সংখ্যা ৫৮৫ (০.২৫%) জন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দাসপুর ব্লকে স্বাক্ষর মানুষের সংখ্যা ছিল ১,৮২,৩৭৮ (৮৫.৬২%) । যাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৯৯,৪৭২ (৯১.৫৯%) জন এবং এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৮২,৯০৬ (৭৯.৪১%) জন।

- **কেশিয়াড়ি ব্লক:** - কেশিয়াড়ি ব্লকের মোট আয়তন ২৯২. ০৯ কিলোমিটার। এই ব্লকের সদর দপ্তর কেশিয়াড়িতে। ২০০৫-২০০৬ সালে কেশিয়াড়ি ব্লকের বনভূমির পরিমাণ ছিল ২৩১৪ হেক্টর।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কেশিয়াড়ি ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৪৯,২৬০ জন। এই ব্লকের মোট পুরুষের সংখ্যা ৭৫,৬০১ জন এবং মহিলার সংখ্যা ৭৩,৬৫৯ জন। তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ৩৪২৬০ (২২.৯৫%) জন এবং তপশিলি উপজাতির মানুষের সংখ্যা ৫১,১২৮ (৩৪.২৫%) জন। এই ব্লকের সমস্ত মানুষ গ্রামেই বসবাস করতেন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কেশিয়াড়ি ব্লকে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল ১,০১,৫৫৭ জন। যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৫৬,৪৬৭ (৮৪.৩৯%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৪৫,০৯০ (৬৮.৯৮%) জন। স্বাক্ষরতার হারে মহিলা এবং পুরুষের মধ্যে ব্যবধান ছিল ১৫.৪০%।

➢ **ঘাটাল ব্লক:** - ঘাটাল ব্লকের মোট আয়তন ২১৬.০৫ কিলোমিটার।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঘাটাল ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ২,১৯,৫৫৫ জন। যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ১,১৩,১৯৯ (৫২%) জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ১,০৬,৩৫৬ (৪৮%) জন। তপশিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ৭২,২৪৩ (৩২.৯০%) জন এবং তপশিলি উপজাতির সংখ্যা ছিল ৩,৬৮১ (১.৭৬%) জন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঘাটাল ব্লকে স্বাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১৫৭৩০১ (৮১.০৮%) যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৮৮,৪৮১ (৮৩.৩৪%) জন এবং মহিলার সংখ্যা ৬৮,৮২০ (৭৩.৩৩%) জন। স্বাক্ষরতার হারে লিঙ্গ ব্যবধান ছিল ১৫.০১%।

৪.১৩ ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি ব্লকের ভৌগলিক অবস্থান:

- **গোপীবল্লভপুর ব্লক-২:** - এটি ঝাড়গ্রাম জেলার একটি ব্লক। এই ব্লকটি প্রায় ১৯২.১৭ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এই ব্লকে ১ টি পঞ্চায়েত সমিতি, ৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত,৭৮ টি গ্রাম সংসদ, ১৯২ টি মৌজা এবং ১৭৫ টি জনবসতিপূর্ণ গ্রাম রয়েছে।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১০,৪৯৯৬ জন। যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৫৩,৪৫৯ (৫১%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৫১,৫৩৭ (৪৯%) জন। তফসিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ৩২,৫৫৩ (৩১%) এবং তফসিলি উপজাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ২৪,৫৬২ (২৩.৩৯%) ।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই ব্লকে সাক্ষরতার হার ছিল ৭১.৪০% (৬৬৫০৩ জন) যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৩৮,০৯২ (৮০.৪৫%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ২৮,৪১১ (৬২.০৫%) জন। স্বাক্ষরতার হারের ক্ষেত্রে এই ব্লকে লিঙ্গ পার্থক্য ছিল ১৮.৪১%।

- **ঝাড়গ্রাম ব্লক:** - ঝাড়গ্রাম ব্লকের মোট আয়তন ৫১৫.১১ কিমি। এই ব্লকে মোট বনভূমি ছিল ১৫,৪০০ হেক্টর।

২০১১ সালের ভারতের আদমশুমারি অনুযায়ী ঝাড়গ্রাম ব্লকে মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৭০,০৯৭ জন। যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৮৫,৯৭০ (৫১%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৮৪,১২৭ (৪৯%) । তফসিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ২৫,২২০ (১৪.৮৩%) এবং তফসিলি উপজাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৮,৬২৭ (২২.৭১%) ।

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ঝাড়গ্রাম ব্লকে মোট শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল ১,০৮,১৭৯ (৭২.২৩%) জন। যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৬০,৯৭৪ (৮০.৫৫%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৪৭,২০৬ (৬৩.৭%) । স্বাক্ষরতার হারের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ব্যবধান ছিল ১৬.৮২%।

- **সাঁকরাইল ব্লক:** - সাঁকরাইল ব্লকের মোট ক্ষেত্রফল ২৭৮.৮০ কিলোমিটার এবং এখানে বনভূমির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৬২০ হেক্টর। এই ব্লকের সদর দপ্তর রোহিনী তে।

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী সাঁকরাইল ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,১৫,৪১৮ জন। যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৫৮,২৪০ (৫০%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৫৭,১৭৮ (৫০%)। তপশিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ২১,০০৪ (১৮.২০%) এবং তপশিলি উপজাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ২৮,৮২৫ (২৪.৯৭%) ।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সাঁকরাইল ব্লকের শিক্ষিতের হার ছিল ৭৫,০২৮ (৭৩.৩৫%) । যার মধ্যে পুরুষের সাক্ষরতার সংখ্যা ছিল ৪১,৭৯৩ (৮১.০১%) এবং মহিলাদের স্বাক্ষরতার হার ছিল ৩৩,২৩৫ (৬৫.৫৫%)

➢ **বিনপুর ব্লক-১:** - ব্লকের মোট আয়তন হলো ৩৫৭.৬২ কিমি। এই ব্লকের মোট বনভূমির পরিমাণ ৮২৪০ হেক্টর। এই ব্লকের সদর দপ্তর লালগড়।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বিনপুর ১ ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৫৬,১৫৩ যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৭৮,৯২৩৯ (৫১%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৭৭,২২৪ (৪৯%) । তপশিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৯,০৬৪ (২৫.০২%) এবং উপজাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ৪৩,৯৬২ (২৮.১৫%) ।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বিনপুর ১ ব্লকের শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মোট ৯৫,৭৫৩ যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৫৫,২২৮ (৭৯.৭২%) এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৪০,৫২৫ (৫৯.৫৮%) । স্বাক্ষরতার হারে লিঙ্গ পার্থক্য ছিল (২০.১৪%) ।

- **বিনপুর ব্লক-২:** - বিনপুর ২ ব্লকের মোট আয়তন ৫৮৩.৫০ কিলোমিটার। এই ব্লকটির সদর দপ্তর বেলপাহাড়িতে অবস্থিত। ব্লকটি বেলপাহাড়ি ও বিনপুর থানার মধ্যে অবস্থিত।

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই ব্লকের জনসংখ্যা ছিল ১,৬৪,৫২২ জন। যার মধ্যে গ্রামে বসবাস করতেন ১৫,৭৯৮ জন এবং শহরে বসবাস করতেন ৫,৭২৪ জন। মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৮২,৬৫৪ (৫০%) জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল

৮১,৮৬৮ (৫০%) জন। এদের মধ্যে তপশিলি জাতিভুক্ত সম্প্রদায় মানুষের সংখ্যা ২৫,৯৪৭ (১৫.৭৭%) জন এবং তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ৬৫,৭২২ (৩৯.৯৫%) জন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বিনপুর ২ ব্লকে মোট সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১,০২,২৮৫ (৭০.৮৬%) । যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৫৮,৮০৪ (৮০.৭৯%) জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৪৩,৪৮১ (৬০.০৭%) জন। স্বাক্ষরতার হারে লিঙ্গ ব্যবধান ছিল (২০.৭২%) ।

- **জামবনি ব্লক:** - জামবনি ব্লকের মোট আয়তন হলো ৩১৮.৮৩ কিলোমিটার। এই ব্লক জামবনি থানার অন্তর্গত এবং এই ব্লকের সদর দপ্তর গিধনিতে অবস্থিত। এই ব্লকে জঙ্গলের পরিমাণ ৭,৬৪০ হেক্টর।

২০১১ সালে ভারতের আদমশুমারি অনুযায়ী জামবনি ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,১৩,১৯৭ জন। এই ব্লকের সব মানুষই গ্রামে বসবাস করতেন। মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৫৭,৬০৭ (৫১%) জন ছিলেন পুরুষ এবং ৫৫,৫৯০ (৪৯%) জন ছিলেন মহিলা। তপশিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ২০,৪৮৪ (১৮.১০%) জন এবং তফশিলি উপজাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ৩২,৩৬৯ (২৮.৬০) জন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জামবনি ব্লকে মোট স্বাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৭২,৩৪৮ যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪১,৫৭৪ (৮২.০৪%) জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৩০,৭৭৪ (৬২.৮৮%) জন। স্বাক্ষরতার হারে লিঙ্গ ব্যবধান ছিল (১৯.১৫%) ।

- **নয়াগ্রাম ব্লক:** - নয়াগ্রাম ব্লকের মোট আয়তন ৫০১.৪৪ কিলোমিটার। এই ব্লকটি নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত এবং এ ব্লকের সদর দপ্তর বালিগেড়িয়াতে অবস্থিত।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী নয়া গ্রাম ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৪২, ১১৯ জন। যার মধ্যে সব মানুষই গ্রামে বসবাস করতেন। মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৭১,৫৩৭ (৫০%) জন পুরুষ এবং ৭০,৬৬২ (৫০%) জন মহিলা ছিলেন। তপশিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ২৮,৮৯৯ (২০.৩২%) এবং তপশিলি উপজাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ৫৬,৮৮৭ (৪০.০১%) ।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী নয়াগ্রাম ব্লকে মোট স্বাক্ষর ব্যক্তির পরিমাণ ছিল ৭৯,৩৬৯ জন। যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪৬,৪৩০ (৭৪.০৬%) জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৩৩,০২৯ (৫৩.২৫৫%) জন। স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে লিঙ্গ পার্থক্য ছিল (২০.৮১%) ।

৪.১৪ Sample বা নমুনা:

জনসমষ্টির একটি ক্ষুদ্র অংশ হল নমুনা। জনসমষ্টির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে তা ছোট দলের মধ্যে যথাযথভাবে প্রতিভাত হলে তবেই ছোট দলটিকে জনসমষ্টির নমুনা বলা হবে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বহু মানুষের মধ্যে গবেষণার প্রয়োজনে গবেষিকা পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং ঝাড়গ্রাম জেলার মোট ২০ টি ব্লকের মধ্য থেকে ২০ টি সাঁওতাল গ্রাম বা পাড়ার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষকে গবেষণার নমুনা হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষিকা উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনা চয়ন (purposive sampling) প্রণালী গ্রহণ করেছেন। এই পদ্ধতিতে যে সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে গবেষিকা তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়েছেন তাঁরা দুটি জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রতিভূ। এই পদ্ধতিতে গবেষিকার পক্ষে তথ্য সংগ্রহের কাজ সহজ হয় অথচ গবেষণার উদ্দেশ্য কোনভাবেই বিঘ্নিত হয় না।

৪.১৫ গবেষণার নকশা:

এথনোগ্রাফি পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রণালী ব্যবহার করা যায় তথ্য সংগ্রহের জন্য। গবেষিকা লক্ষ্য করেছেন যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উপর যে সকল গবেষণা সন্দর্ভ এবং গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির প্রায় সবগুলিতেই সার্ভে বা সমীক্ষা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। সামান্য কয়েকটি গবেষণাতে কেস স্টাডি মেথড ব্যবহৃত হয়েছে। যে সকল গবেষণাতে এথনোগ্রাফি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে বলে স্বীকার করা হয়েছে তার কোনোটিতেই নির্দিষ্ট করে কিছু সংগ্রহ

প্রণালী ব্যবহার করা হয়নি। তাই বর্তমান গবেষিকা তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক এবং এই ধরনের গবেষণায় দক্ষ কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এর সঙ্গে কথা বলে তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ, Participatory Rural Apprisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এথনোগ্রাফি পদ্ধতিতে আদিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য PRA এবং FGD একটি আধুনিক এবং গবেষণা উপযোগী কৌশল (Technic) বলে স্বীকৃত।

বর্তমান গবেষণাটি সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত প্রেক্ষিত বিষয়ে আলোচনা হওয়ায় গবেষিকা গবেষণার নকশা হিসেবে Ethnography পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন। এই পদ্ধতি গৃহীত হওয়ায় গবেষিকা বিভিন্ন সাঁওতাল গ্রাম বা পাড়ায় যেখানে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে কিছুদিন করে বসবাস করেছেন, মানুষ জনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলাপ আলোচনা করে কাটিয়েছেন এবং খুব কাছ থেকে তাদের সংস্কৃতিকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন এবং এরদ্বারা কথোপকথন কালে তারা কি বলছে এবং বাস্তবে তারা কি করছে এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করার চেষ্টা করেছেন (Berjar, p-146)।

আদিবাসীদের বা যেকোনো জনজাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে গভীরভাবে বুঝতে হলে কেবলমাত্র কিছু তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা দান, চিহ্নিতকরণ বা পূর্বতন রেকর্ডগুলিকে স্টাডি করা মাত্র বোঝায় না: তাদের সঙ্গে থেকে, তাদের হাতে হাত রেখে, তাদের জুতোতে নিজের পা গলিয়ে তাদেরকে অনুধাবন করা বোঝায়। সুতরাং Ethnography পদ্ধতিতে গবেষিকা প্রত্যক্ষভাবে সাঁওতালদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে গবেষিকা স্বয়ং

সাঁওতাল উপজাতিভুক্ত হওয়ায় তাদের সঙ্গে গভীরভাবে মেশা, কথা বলা এবং তাদের সংস্কৃতিকে একান্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

Herold Garfinkel 'Ethnography' পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন - "The Ethnography seek to treat practical activities, practical circumstances, and practical sociological, reasoning as topics of empirical study, and by paying to the most common place. Activities of daily life the attention usually accorded extra-ordinary events, seek to learn. About them as phenomenon in their own right". (Quoted from, Winner and Dominick, 2006, P-121).

Ethnography পদ্ধতিতে গবেষণার জন্য গবেষিকা এই পদ্ধতির চারটি বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ ভাবে মেনে চলেছেন-

১. গবেষিকা গবেষণার মধ্যে গভীরভাবে ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, যাতে তিনি বিষয়নিষ্ঠভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

২. গবেষণাতে যারা তথ্য দান করেছেন তাদের দৃষ্টিকোন থেকে বর্তমান সমস্যাটিকে অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন।

৩. গবেষিকা তাঁর গবেষণায় অনেকখানি সময় তথ্য সংগ্রহে ব্যায় করেছেন এবং ওতোপ্রোতভাবে তাদের সঙ্গে মিশেছেন।

৪. গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি বিভিন্ন টেকনিক ব্যবহার করেছেন, যেমন- পর্যবেক্ষণ, PRA, FDG, ডাইরি লিখন, পূর্বতন দলিল সমূহকে গভীরভাবে পঠন ও তার বিশ্লেষণ, ছবি সংগ্রহ, রেকর্ডিং ইত্যাদি।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুচারু ভাবে মেনে চলতে গিয়ে গবেষিকা বুঝতে পেরেছেন এথনোগ্রাফি রিসার্চ এবং অন্যান্য গুণগতমান ভিত্তিক গবেষণার মধ্যেকার পার্থক্যকে। পর্যবেক্ষণের দ্বারাই গবেষিকা বুঝেছেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সামাজিক জীবনের অন্তর্নিহিত সুরটিকে এবং যে পদ্ধতিতে তারা এতকাল নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করেছেন তার সুগন্ধিটিকে।

তথ্য সংগ্রহকালে গবেষিকা যে সকল সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ এবং তাঁদের সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে মিশেছেন তাঁরাই এই গবেষণার অন্যতম কুশীলব। এ সম্পর্কে Fettermen (2010) এর অন্যতম পর্যবেক্ষণ হলো -"Some people are more articulate and culturally sensitive than others. These individual makes excellent key actors or informants. In the social group under study this individual is one of many actors and many not be a central or even an indispensable community member. Yet this individual becomes a key factor in the theatre of ethnographic research and plays pivotal role linking the field worker and the community "(p.50)

এথনোগ্রাফিক পদ্ধতিতে গবেষণা করতে গিয়ে গবেষিকাকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে যে তথ্যদানকারীরা তাদের প্রাচীন ইতিহাসকে কতটুকু জানে এবং কতটুকুকে নিরন্তর অনুশীলন করে চলেছে। এছাড়াও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে পূর্বতন সংস্কৃতি এবং জ্ঞানকে অনুশীলন

করতে গিয়ে কি কি ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আধুনিক ভাবনার সঙ্গে তাদের চিরাচরিত সাঁওতালি ভাবনার দ্বন্দ্বের স্বরূপটি কেমন এবং সেই দ্বন্দ্বের নিরসনে তারা কি ধরনের ভূমিকা নিচ্ছে তা জানাও এই পদ্ধতির একটি অন্যতম দিক।

এ সম্পর্কে Fettermen (2010) এর পর্যবেক্ষণ হলো -"The ethnographer must take the time to search out and spend time with these articulate individuals (key informents). They must establish long term relationship with key actors who continually provide reliable and insightful information. Key actors can be extremely effective and efficient sources in data and analysis ". (P.52).

Ethnography পদ্ধতিতে গবেষিকাকে কারা প্রকৃত তথ্য প্রদান করছে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হয়েছে, এবং তাদের কোন কোন আচরণ কখন এবং কোথায় পর্যবেক্ষণ যোগ্য তাও স্থির করতে হয়েছে। তথ্যসংগ্রহের জন্য গবেষিকাকে কখনও কখনও একক কোন তথ্য প্রদানকারীর সঙ্গে পৃথকভাবেও কথা বলতে হয়েছে। অন্যথায় এথনোগ্রাফি পদ্ধতিতে সুচারু ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবে গবেষিকা স্বয়ং সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তাঁর পক্ষে তথ্যদানকারীদের সঙ্গে মিলে মিশে যাওয়া এবং তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হয়েছে।

৪.১৫.১ পর্যবেক্ষণ:

সাধারণভাবে সমাজবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের গবেষকরা প্রশ্নগুচ্ছ ব্যবহার করে উত্তরদাতার চিন্তা এবং কর্মধারাকে লিখিত আকারে সংগ্রহ করেন। এখানে কথোপকথনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহীতা সাক্ষাৎকার দাতার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সাথে সাথে সাক্ষাৎকার দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ই

দুপক্ষকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তাই গবেষণা পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণকে নমুনা দলের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রত্যক্ষ কৌশল বলে স্বীকার করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে তথ্যদাতা লিখিত আকারে বা কথোপকথন কালে নিজস্ব মতামতকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেনা, সেসব ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ কৌশল-এর ব্যবহার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য দাতার যথাযথ আচরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যদিও পর্যবেক্ষণ কৌশল ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে গবেষকের দীর্ঘ প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে পর্যবেক্ষণ কৌশলকে বিজ্ঞান ভিত্তিক কৌশল বলেও স্বীকার করা হয় কারণ জীববিজ্ঞান এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানে গবেষণায় পর্যবেক্ষণ কৌশল এর ব্যবহার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জীববিজ্ঞান এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন চলরাশি এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে কার্যকারণ সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা হয়। সে ক্ষেত্রে সমাজ বিজ্ঞানে অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কার্যকারণ সম্পর্ককে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করতে হয়। তাই আধুনিক ধারণায় পর্যবেক্ষণের সহায়তায় অনেক বেশি সঠিক, যথাযথ, প্রতিক্রিয়া যুক্ত এবং উপযোগী তথ্য পাওয়া সম্ভব।

পর্যবেক্ষণ যদি সুপরিকল্পিত এবং ধারাবাহিক হয় তবে এই কৌশল ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট, নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ তথ্য লাভ করা যায়। পর্যবেক্ষক সর্বদাই ধারাবাহিক, স্বতন্ত্র্য, নৈব্যক্তিক, সংখ্যামান ভিত্তিক এবং যাচাইযোগ্য। এছাড়াও পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য তাৎক্ষণিক নথিভুক্ত করতে হয়।

বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা সুসংগঠিত এবং অসংগঠিত এই উভয় প্রকারেরই তথ্য গ্রহণ কালে তথ্য দাতাদের পর্যবেক্ষণ করেছেন, প্রাপ্ত তথ্য এবং অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। তথ্যের বিশ্লেষণ এবং তার ব্যাখ্যা দানের চেষ্টাও করেছেন।

৪.১৫.২ PRA (Participatory Rural Appraisal):

সমাজবিজ্ঞানে বিশেষত নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় Participatory Rural Appraisal (PRA বা অংশগ্রহণভিত্তিক গ্রামীণ সম্পদের মূল্যায়ন) পদ্ধতির ব্যবহার হয়। এটি একটি গবেষণা পদ্ধতি হিসাবে প্রথম উঠে আসে ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে Institute of Development Studies এর একটি সিম্পোজিয়ামে। এই সময়ে এটি পরিচিত ছিল Rapid Rural Appraisal (RRA) হিসাবে। গ্রামীণ এলাকায় খুব দ্রুত এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহের একটি নতুন পদ্ধতি হিসেবে RRA এর উদ্ভব ঘটে। RRA পদ্ধতিতে গ্রামীণ এলাকার সমাজসম্পদ, প্রাণিসম্পদ এবং মানুষ সম্পর্কে অত্যন্ত সুগভীর এবং মিথস্ক্রিয় পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ ঘটে। ১৯৮০ সাল নাগাদ গবেষণার এই পদ্ধতিটি জন সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৮০ এর মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা স্বীকৃত হয়। গ্রামীণ এলাকার মানুষের অবস্থার সঙ্গে চিরাচরিত ধ্যানধারণা, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাষার সংমিশ্রণ এই পদ্ধতিতে ধরা পড়ে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষকরা এই পদ্ধতিকে বহুল ব্যবহার করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে এখানে বাইরে থেকে আগত তথ্য-গ্রহিতা কেবলমাত্র প্রশ্নের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন বয়সের উত্তর দাতাদের কাছ থেকে প্রশ্নমালা ব্যবহার করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন মাত্র। সুতরাং সংগৃহীত তথ্যের একত্রিতকরণ, বিশ্লেষণ

এবং ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ উত্তরদাতাদের কোন ভূমিকাই থাকে না, তাই উত্তর গ্রহীতা বা প্রশ্ন কর্তা এখানে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। পক্ষান্তরে উত্তর দাতারা সমগ্র কার্যক্রমের একটি অংশ রূপে পরিগণিত হন।

Robert Chambers এর নেতৃত্বে একদল গবেষক RRA পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে PRA পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। যেখানে Rapid শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে Participatory শব্দের প্রচলন ঘটানো হয়।

PRA পদ্ধতিতে গ্রামীণ এলাকার মানুষজন প্রত্যক্ষভাবে এবং সক্রিয়ভাবে গবেষণায় অংশগ্রহণ করে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রামীণ এলাকা, সমাজ এবং মানুষজনের উন্নতি ঘটানো সম্ভব। সুতরাং এই পদ্ধতিতে গ্রামীণ এলাকার মানুষজন এবং বহিরাগত মানবসম্পদ পারস্পরিক আলোচনায় স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কিভাবে ওই এলাকার সম্পদকে সমহারে পুনর্বন্টন করা যাবে এবং সকলের উন্নতি ঘটানো সম্ভব হবে। PRA পদ্ধতিতে আলোচনা হয় খোলা আকাশের নিচে গ্রাম/পাড়ার কোন কেন্দ্রীয় স্থানে যেখানে এলাকার সমস্ত অধিবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে এলাকাবাসী কোন মানুষ চাইলেও তার ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বকে নিজের বা পরিবারের দিকে সম্পদকে সঞ্চালিত করার সুযোগ পায় না।

এই পদ্ধতিতে গ্রামীণ বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করা এবং সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার সম্ভাব্য সমাধান সূত্র খুঁজে বার করা হয়। যেখানে সকলের সমবেত এবং সমান অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকে। PRA এর অন্যতম কেন্দ্রীয় নীতিটি হল এলাকাবাসী মানুষকে জানতে হবে ও

তাদের কে বুঝতে হবে, তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে বিশেষত শিক্ষা এবং পুনর্বাসন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে বলা হয় Community Based Rehabilitation/community Based Participation. PRA পদ্ধতিতে গ্রামীণ এলাকার মানুষরা মানসিক জড়তা কাটিয়ে সকলের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে নিজের মত প্রকাশের জন্য মানসিক শক্তি লাভ করে, নিজেদের সমস্যাগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং সমস্যাগুলোর সমাধানে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাগুলি তৈরি করে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ সাধারণ মানুষ এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গবেষক দলের মধ্যের বাধাগুলি অপসারিত হয় এবং সকলে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হয় যাতে এলাকার সমস্ত মানুষের সমস্যাকে দ্রুত সমাধান করা যায়।

সুতরাং PRA পদ্ধতির কতকগুলি মান্য মৌলিক নীতি হল-

১. স্থানীয় মানুষজনের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা কে সম্মান দিতে হবে।

২. স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে ক্ষমতায়ন ঘটাতে হবে।

৩. একটি নির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করে PRA দল আলোচনা সভায় বসবেন যেখানে সবার লক্ষ্য হবে আলোচনায় একটি গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া।

৪. গৃহীত সিদ্ধান্তকে যাতে সকলে মিলে কার্যকরী করে তোলা যায় তার জন্য প্রচেষ্টা।

- **PRA পদ্ধতির কিছু শক্তিশালী দিক হলো** -

১. গ্রামীণ মানুষেরা এই পদ্ধতির ব্যবহারে বুঝতে পারেন যে এলাকার উন্নয়নে তাদেরও ভূমিকা রয়েছে। তারা সজ্ঞান প্রচেষ্টায় এলাকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন এবং দলবদ্ধভাবে ওই উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এখন তারা দায়বদ্ধ।

২. তারা একেবারে তৃণমূল স্তরের সমস্যার চিহ্নিতকরণ এবং তার সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৩. এই পদ্ধতিতে জাতি ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ক্ষমতা, অক্ষমতা বা আদিবাসী বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে সকলে সমান দায়িত্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

৪. একটি সাধারণ আলোচনা সভায় যেখানে গ্রামীণ মানুষ এবং দক্ষ মানব সম্পদ একত্রিত হন, নিজেদের মূল্যবান দূরদৃষ্টিকে ব্যবহার করেন এবং সমবেত প্রচেষ্টায় ভবিষ্যৎ কর্মের একটি নকশা প্রস্তুত করেন।

৫. গ্রামীণ মানুষেরা নিজেরাই কাগজের উপর গ্রামীণ সম্পদ কোথায় কি অবস্থায় আছে তার চিত্ররূপ তৈরি করেন এবং সকলে সে সম্পর্কে অবহিত হন।

৬. এই পদ্ধতির প্রয়োগ বুঝিয়ে দেয় যে নিজেদের সম্পর্কে নিজেদেরই জানতে বুঝতে হবে এবং এলাকার নিজস্ব সম্পদকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে হবে। বাকি অংশকে সুরক্ষিত করতে হবে এবং নতুন সম্পদ উৎপাদনে সকলকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭. এই পদ্ধতির অন্যতম আরেকটি শক্তিশালী দিক হল সকলের লক্ষ্য হবে জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার।

৮. এই পদ্ধতির ব্যবহার কালে কার কার মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মের প্রয়োজনে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা রয়েছে তাদের চিহ্নিত করা যায়।

৯. PRA স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে স্থানীয় এলাকার উন্নয়নে ভবিষ্যৎ নেতাকে খুঁজে নিতে এবং স্থানীয় সম্পদের সঞ্চালনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

১০. এই পদ্ধতির শেষে স্থির করা হয় গ্রহণ করা ব্যক্তিদের মধ্যে কার হাতে কি ধরনের দায়িত্ব আরোপ করা হবে এবং বনজ ও স্থায়ী সম্পদকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়।

PRA পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহকালে গ্রামীণ মানুষেরা সমবেতভাবে আর্ট পেপারের উপর বিভিন্ন বর্ণের কলম ব্যবহার করে সামাজিক মানচিত্র এবং গ্রামীণ সম্পদের মানচিত্র অঙ্কন করেন। গ্রামীণ সম্পদের মানচিত্রে এলাকার রাস্তা, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনগোষ্ঠীর ব্যবহার্য সাধারণ স্হায়ী পুকুর, পানীয় জলের ট্যাঙ্ক,চাষযোগ্য জমি, নলকূপ, কুঁয়ো, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আদিবাসীদের ধর্মীয় স্থান ইত্যাদি কে চিহ্নিত করা হয়। যে পরিবারে পুরুষ নেই বা নারী পরিবারের প্রধান এবং যে পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র সেগুলি কেও এখানে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়। Self Help Group Member দের বাড়ি মানচিত্রে পৃথক বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।

এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ কালে গবেষিকা নিম্নলিখিত বস্তুগুলির ব্যবহার করেছেন - আর্ট পেপার, পেন্সিল, ইরেজার, পেন্সিল কাটার, বিভিন্ন বর্ণের পেপার, পেপার ওয়েট ইত্যাদি।

সাধারণভাবে একটি আদিবাসী গ্রামীণ এলাকায় PRA পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের জন্য এক একটি সেশানে তিন থেকে চার ঘণ্টার প্রয়োজন হয়।

- **PRA পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ :-** গবেষিকা প্রথম নির্দিষ্ট গ্রাম/পাড়ার মাঝখানে একটি সাধারণের ব্যবহৃত স্থানে সকলকে জড়ো করেন এবং মাদুর/শতরঞ্জি/চাটাই পেতে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসেন। তিনি তার আসার কারণ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন এবং সবাইকে (মহিলা,পুরুষ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কাজে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানান। এই পর্যায়ে গবেষিকা তার গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলেন এবং কারুর কোন প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। গবেষিকা এবার সাদা রংয়ের আর্ট পেপার মেলে ধরেন এবং কম বয়সী যুবক যুবতীদের হাতে একটি করে পেন্সিল ও রঙ্গিন স্কেচ পেন ধরিয়ে দেন। এবার সবাইকে বলেন প্রথম গ্রামের সীমানা নির্ধারণ করতে এবং গ্রামের সীমানার বাইরে কোন দিকে কি আছে তা স্পষ্ট করে লিখতে। এরপর গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রধান রাস্তা, শাখা রাস্তা ও উপশাখা রাস্তা গুলিকে আঁকতে বলেন। এখন রাস্তার কোন দিকে কটি করে বাড়ি, কুঁয়ো, নলকূপ, পুকুর, ধর্মস্থান আছে ইত্যাদি গুলিকে অংকন ও চিহ্নিত করতে বলেন। এখন স্বীকার সাধারণের শিক্ষার স্থান, সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্যদের বাড়ি, দরিদ্রতম পরিবার এবং পুরুষ বিহীন মহিলা নির্ভর বাড়ি গুলি কে চিহ্নিত করতে বলেন। এরপর বনজ সম্পদের স্থান, কৃষি জমি, পাড়ার দোকান ঘর, নদী, খাল, কুটির শিল্পের স্থান ইত্যাদি গুলিকে চিহ্নিত ও অঙ্কন

করতে বলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্কেচপেন ব্যবহার করতে অঙ্কন কারীদের উদ্বুদ্ধ করেন।

এরপর গবেষিকা গ্রামবাসীর সঙ্গে আলোচনায় বসেন তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবার গুলির আর্থিক উপার্জনের উৎস, জমির উৎপাদন চিত্র, যুবক যুবতীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান থেকে অকালে ঝরে পড়ার প্রবণতা, উচ্চ শিক্ষিত পুরুষ নারীর সংখ্যা, শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা, উচ্চশিক্ষা লাভের সমস্যা, শিক্ষার্থীদের সমস্যা, দারিদ্র দূরীকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি, দারিদ্র দূরীকরণে কোন কোন ব্যবস্থা গৃহীত হলে তা এই এলাকায় কার্যকর হবে, পানীয় জলের সমস্যা, পয়ঃ প্রণালীগত ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা ও তার গুণগতমান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় বসেন। এই পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ও কোন কোন গ্রামবাসীর মধ্যে নেতৃত্ব দানের গুণাবলী রয়েছে, সম্পদ পরিমাপনের চিত্র অংকনে কারা অধিক আগ্রহী, এবং সক্রিয় তা বোঝার চেষ্টা করেন। সমস্যার সমাধান বিষয়ে আলোচনা কালে কোন কোন গ্রামবাসী নমনীয়তার সঙ্গে বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছেন, কাদের ভাবনার মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে এবং কারা দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে আগ্রহী অর্থাৎ সৃজনশীলতার গুণাবলী কাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে স্পষ্ট তাও গবেষিকা জানার চেষ্টা করেছেন।

ম্যাপ অংকন এবং আলোচনা শেষ হলে গবেষিকা সম্পূর্ণ কাজ এবং আলোচনাটিকে সংক্ষেপে সবার কাছে তুলে ধরেন এবং এর থেকে কোন কোন ধরনের তথ্য বেরিয়ে এলো তাও তিনি

বিশদে আলোচনা করেন। এরপর উপস্থিত সবার স্বাক্ষর বা টিপসই গ্রহণ করেন। তারপর গবেষিকা আর্ট পেপার এবং অন্যান্য উপাদান গুলি কে সংগ্রহ করে সবার আন্তরিক সহযোগিতা কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

৪.১৫.৩ ফোকাস দল আলোচনা বা Focus Group Discussion :-

শিক্ষা বিজ্ঞানের গবেষণায় আধুনিককালে ফোকাস দল আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। PRA এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল FGD। এই দলের বৈশিষ্ট্য গুলি হল -

১. দলের আলোচনা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে আবর্তিত হয়।

২. এই দলে গড়ে ৬ থেকে ২০ জনকে নিয়ে আলোচনা করা হয়, যদিও এই সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে।

৩. এই আলোচনায় সদস্যরা একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যস্থতায় আলোচনা করেন।

৪. নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমধর্মী মানুষরা এই আলোচনা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

৫. এই ধরনের আলোচনায় সকলের মতামতের প্রাধান্য কে লক্ষ্য করা যায়।

৬. এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর ব্যক্তিরা নিজস্ব মতামত জানাতে পারেন।

৭. গবেষিকা এই আলোচনাতে তাঁর গবেষণার সুবিধার জন্য অংশগ্রহণকারী দলের সমস্ত সদস্যকে আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে উদ্ভূত করতে পারেন।

যেহেতু সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক এবং শিক্ষাগত প্রেক্ষিত এখানে মূল আলোচ্য বিষয় তাই গবেষিকা যে কুড়িটি গ্রামে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেখানে উপস্থিত সমস্ত সাঁওতাল পুরুষ মহিলাকে প্রথমেই তার গবেষণার লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে গবেষিকার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কৌশল এবং পূর্বতন প্রশিক্ষণ কে ব্যবহার করে আলোচনাটিকে পরিচালিত হতে দিয়েছেন। এখানে গবেষিকা পূর্বেই একটি খসড়া দিক-নির্দেশনায় তৈরি করে দিয়েছেন,অন্যথায় গবেষণা কর্ম কার্যকর করতে তার অসুবিধা হত। আলোচনার অধিবেশন পরিচালনায় গবেষিকা প্রথমেই উপস্থিত আলোচকদের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাদের সকলকে সাদরে এই আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করেছিলেন। প্রথমে হালকা বিষয় দিয়ে আলোচনা শুরু করে ক্রমশ আরও গভীরে আলোচনাটিকে ধীরে ধীরে গবেষিকা এগিয়ে নিয়ে যান এবং আলোচকদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে তথ্য উপস্থাপন করতে সহায়তা করেন।

আলোচনায় যে সকল তথ্য উঠে আসে গবেষিকা তার কিছু তথ্যকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেন। যথাযথ মূল্যায়নের পর গবেষিকা প্রক্রিয়াজাত তথ্যগুলিকে আলোচকদের সামনে উপস্থাপন করেন, এবং তার যথার্থতা স্বীকৃত হলে অবশেষে আলোচনার চূড়ান্ত রূপ তৈরি করেন।

৪.১৫.৪ সাক্ষাৎকার:

সাক্ষাৎকার একটি কথোপকথনের পদ্ধতি, যেখানে কথাবার্তার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তার মূল্যায়ন করা যায়। সাক্ষাৎকার বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার, পরামর্শদানের জন্য সাক্ষাৎকার, চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার, মনোচিকিৎসার জন্য সাক্ষাৎকার প্রভৃতি। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় সাক্ষাৎকারক সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে সুন্দর এবং বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে এমন সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারে যা সাক্ষাৎকার দানকারীর পক্ষে লিখিতভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সাক্ষাৎকার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। সাক্ষাৎকার যখন একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয় তখন তাকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বলা যায়। দলগতভাবে সাক্ষাৎকার হলে তাকে দলগত সাক্ষাৎকার বলা যায়। সংগঠিত সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে বিকল্প প্রশ্নের সংখ্যা খুব কমই থাকে এবং পূর্বপরিকল্পিতভাবে তা নিয়ন্ত্রিত হয়। অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারী সাক্ষাৎদানকারীর মনের গভীরে প্রবেশ করে অনেক অপ্রত্যাশিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

অনির্দেশিত সাক্ষাৎকার অভ্যন্তরীণ প্রেষণা, ভয়, দ্বন্দ্ব, আশা প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। সেখানে কেন্দ্রীভূত সাক্ষাৎকার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করার জন্য সাক্ষাৎকার উচ্চস্তরের দক্ষতার প্রয়োজন হয়। একটি উত্তম সাক্ষাৎকারের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও উচ্চ মাত্রায় তাত্ত্বিক পশ্চাৎপট। সাক্ষাৎকারক মানবিক সম্পর্ক তৈরি করতে দক্ষ হবেন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সাক্ষাৎকার

গ্রহণ করতে যাবেন। সাক্ষাৎকারকের চেহারা, পোশাক, কথাবার্তা আকর্ষণীয় হতে হয় যাতে তিনি সাক্ষাৎকারীর আস্থা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতা অর্জন করতে পারেন। তিনি সাক্ষাৎকারীর আগ্রহের বিষয়ের উপর বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন যাতে তাঁদের মধ্যে দূরত্ব দূর হয়ে পরস্পর কাছে আসতে পারেন। সাক্ষাৎকারককে ধৈর্য সম্পন্ন এবং মনোযোগী হতে হবে,তিনি মন দিয়ে সাক্ষাৎকারীর সমস্ত কথা শুনবেন, উত্তরের নির্ভরযোগ্যতার জন্য নানা ভাবে তিনি একই প্রশ্ন করতে পারেন, উত্তরগুলি যদি অস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী এড়িয়ে যাওয়া বা মিথ্যাশ্রয়ী হয় শুধুমাত্র তখনই তিনি নির্দেশ দেবেন। সাক্ষাৎকার চলাকালীন বা তার অব্যবহিত পরেই সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা উচিত, প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার রেকর্ডও করতে পারেন। উত্তর দাতার সম্মতি নিয়ে টেপ বা বৈদ্যুতিন যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। সাক্ষাৎকারী ক্লান্ত হওয়ার পূর্বেই সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী অবশ্যই তাঁকে বা তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাবেন।

বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা দলগতভাবে সংগঠিত এবং অসংগঠিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ কালে তিনি সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন,এবং সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে গ্রামের মানুষদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেন। তাদের নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করেন সরাসরি তথ্য গ্রহণের জন্য এবং অসংগঠিত সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় এমনও কিছু প্রশ্ন করেন যাতে সাক্ষাতদানকারীরা বুঝতে পারেন যে তাদের কাছ থেকে তথ্য গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪.১৬ গবেষণার কলাকৌশল:

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষকরা বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে থাকেন। গবেষণায় কৌশলের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু বর্তমান গবেষণাটি Ethnography পদ্ধতিতে করা হয়েছে তাই গবেষিকা তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসাবে পর্যবেক্ষণ, PRA, সাক্ষাৎকার, FGD ইত্যাদি কৌশলকে ব্যবহার করেছেন।

৪.১৬.১ তথ্য সংগ্রহের কৌশল:

Ethnography পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা একটি কঠিন এবং জটিলতম কাজ। এই পদ্ধতিতে গবেষিকাকে সর্বদাই বস্তুনিষ্ঠ, মনোযোগী ও নির্ভুল হতে হবে। এখানে গবেষিকা নিজে সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ায় নিজের পরিচিতিকে ব্যবহার করেছেন। অন্যথায় বহিরাগত হলে তাকে নিজস্ব পরিস্থিতিকে সরিয়ে রেখে তথ্যদানকারীদের মধ্যে একাত্ম হতে হতো। কারণ পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্বাস এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান না হলে সাফল্যের সাথেও মসৃণ ভাবে তথ্য সংগ্রহ অসম্ভব। তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষিকাকে দীর্ঘ সময় তথ্যদানকারীদের সঙ্গে থাকতে হয়েছে, তাদেরকে সময় দিতে হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করতে হয়েছে। বিভিন্ন সময় কালে গবেষিকা ছোট ছোট শিশুদের জন্য বিস্কুট প্যাকেট, মিষ্টি এবং অন্যান্য খাবার ও মহিলাদের জন্য তাদের সাজসজ্জার জিনিস সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এই সমস্ত কাজের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সঙ্গে গবেষিকার সম্পর্ক রচনার কাজ সহজ হয়েছে, ফলে গবেষিকা খুব সহজেই তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

তথ্যসূত্র (Reference):

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Binpur_I

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Binpur_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gopiballavpur_I

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gopiballavpur_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jamboni_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nayagram_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Garhbeta_I

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Garhbeta_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Garhbeta_III

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Keshpur-(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Salboni_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Debra_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Keshiari

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kharagpur_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pingla_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sabang_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chandrakona_I

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chandrakona_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Daspur_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ghatal_(community_development_block)

https://www.Banglalecturesheet.xyz/2022/06/Methodology-Focus-Group.html

ঘোষ, ফটিকচাঁদ (২০১৯)। ‘ডুলুং’। মাইতি, তাপস (সম্পাদনা), পৃঃ ১৭০-১৮৩।

মাইতি, চন্দ্র (১৪১০)। ‘মেদিনীপুর জেলার প্রস্তর যুগের নিদর্শন: একটি আলোচনা’। পশ্চিমবঙ্গ, মেদিনীপুর জেলার সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বড়পন্ডা, কুমার (২০১৯)। তারাফেনী, মেদিনীপুরের নদ-নদী কথা। মাইতি, তাপস (সম্পাদনা)।

দে, মধুপ, (২০১৯)। 'সুবর্ণরেখা'। মাইতি, তাপস। (সম্পাদনা)। মেদিনীপুরের নদ -নদী কথা। (পৃ: ৪৪৫-৪৬০)।

পঞ্চম-অধ্যায়

সংগৃীত তথ্যের বিশ্লেষণ

৫.১ তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যের বিশ্লেষণ

৫.২ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জন্মকালীন আচার-অনুষ্ঠান

৫.৩ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিবাহ

৫.৪ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মৃত্যুর পর আচার-অনুষ্ঠান

পঞ্চম-অধ্যায়

সংগৃীত তথ্যের বিশ্লেষণ

৫.১ তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যের বিশ্লেষণ:

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যের বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে কোন গবেষণায় গবেষক/গবেষিকাকে যথেষ্ট শ্রম সহকারে এবং দীর্ঘ সময় দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। Ethnography পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা যথেষ্ট জটিল এবং একটি সময় সাপেক্ষ কাজ। কারণ এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহকালে গবেষিকাকে গভীর জঙ্গলে বা কখনো লোকালয়ে তাদের মধ্যে থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে গভীরভাবে মিশতে না পারলে তাদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। তাই PRA, FGD এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গবেষিকা সাঁওতাল উপজাতি ভুক্ত গ্রাম গুলিতে তাদের পরিবারে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। তাদের সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং প্রথাগত ও অপ্রথাগত শিক্ষাকে কাছ থেকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে গবেষিকা তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সংগৃহীত তথ্যকে গুণগত মান ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করেছেন।

নিম্নে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার যে কুড়িটি আদিবাসী সাঁওতাল গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেই তথ্যগুলিকে পর্যায়ক্রমে গ্রাম ভিত্তিক নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে –

❖ আসমানচক, শালবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর:

- **সংস্কৃতি:** - সংস্কৃতির সাথে গ্রামের সবাই যুক্ত। নতুন প্রজন্ম সংস্কৃতি রক্ষায় আগ্রহী। ছেলেরা সবাই চিরাচরিত সাংস্কৃতিক বাজনা বাজাতে পারে। চিরাচরিত সাংস্কৃতিক গান পুরানো মহিলারা করতে পারেন। নাচতে সবাই পারে। ডাইনী প্রথা প্রচলিত আছে। ইন্টারকাস্ট

ম্যারেজ একজনের হয়েছে। কিন্তু নতুন প্রজন্ম ইন্টারকাস্ট ম্যারেজে আগ্রহী নয়। হিন্দুদের যে সমস্ত বড় ধর্মীয় পুজো সেগুলিতে এঁরা অংশগ্রহণ করেননা কিন্তু মূর্তি পূজায় আগ্রহী, যেমন মনসা পূজো। রাত জুড়ে যে প্রোগ্রামগুলো হয় সেগুলোতে যায়। সাধারণত ১৮ বছর বয়সের আগে মেয়েদের বাড়ি থেকে বিয়ে দেওয়া হয় না। ২১ বছরের আগে ছেলেদেরও বিয়ে হয় না। ছেলেমেয়েরা অনেক সময় কম বয়সে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে।

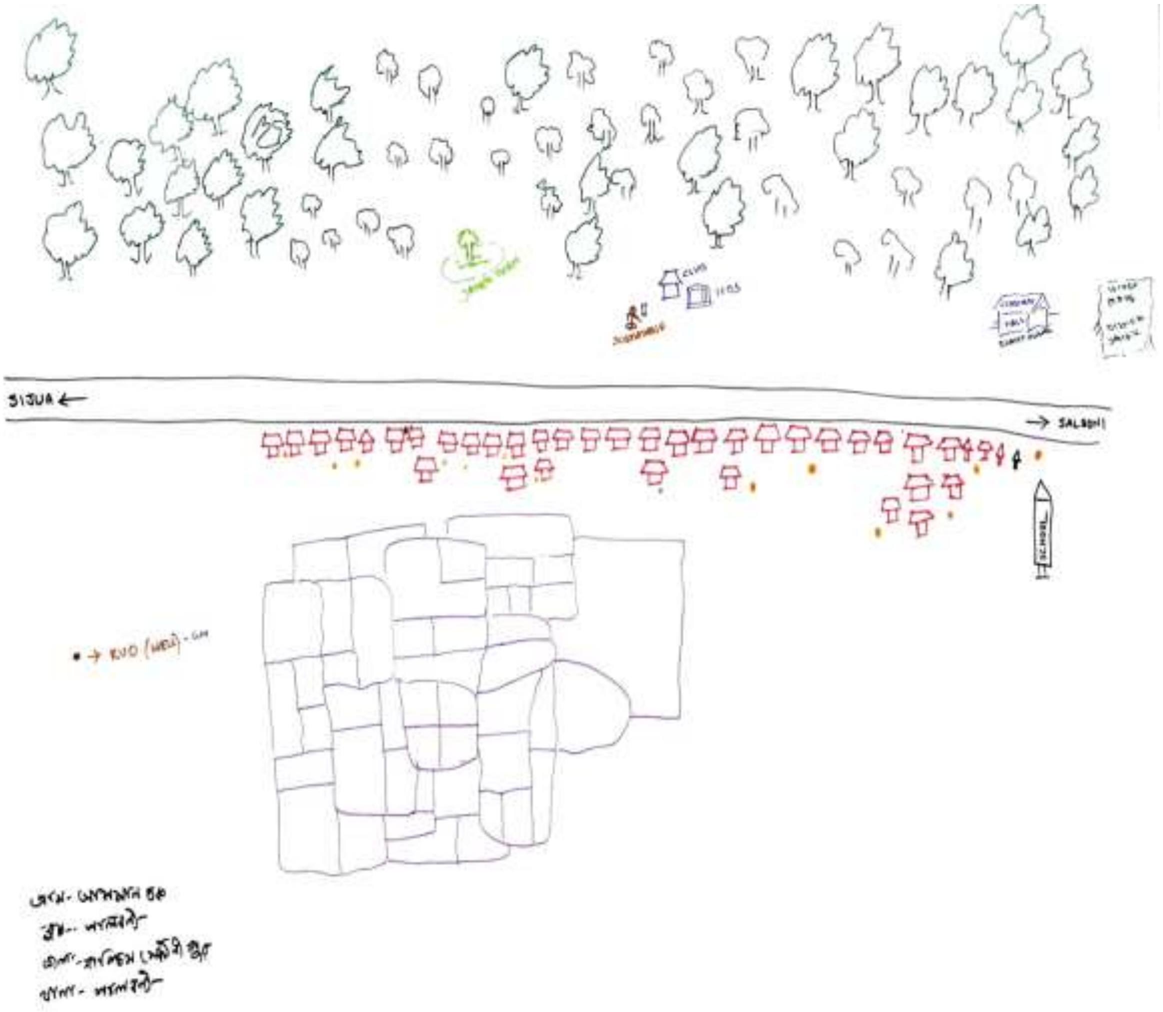

- **শিক্ষা:** - বেশিরভাগ ছেলেরাই মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর পড়াশোনা করেনি, সচেতনতার অভাব এবং দূরদর্শিতার অভাবে। স্কুলে যে সমস্ত বাচ্চারা যায় তারা অনলাইন গেমে আসক্ত। শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশি আগ্রহী, ১৪ জন চাকরি করছে। তাদের মধ্যে একজন পশুর দপ্তরে, একজন কলেজে পার্ট টাইম, তিনজন প্রাথমিক শিক্ষক, একজন রেল ইঞ্জিনিয়ার, দুজন হাই স্কুল শিক্ষক, একজন শিক্ষা দপ্তর, একজন আইসিডিএস, একজন স্টেশন মাস্টার, একজন ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট, একজন হসপিটাল, একজন পোস্ট অফিস প্রভৃতি পেশার সাথে যুক্ত। চারজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীও আছেন এই গ্রামে। বর্তমানে চাকরির অবস্থা ভালো নয় বলে ছেলেমেয়েরা শিক্ষায় আগ্রহ হারাচ্ছে। ৪ জন ছেলে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে।
- **অর্থনৈতিক:** - বেশিরভাগ পরিবার চাকরি করে, প্রায় সবারই কম বেশি জমি আছে। বছরে একবার ধান চাষ হয়, সবজি চাষ হয় না। গ্রামের মানুষ দিনমজুরের কাজ করতে পছন্দ করে। সঞ্চয়ের মনোভাবের অভাব আছে গ্রামের মানুষের মধ্যে। আগে শালপাতা বিক্রি হত, সরকার গাছ কেটে দেওয়ার পর পাতা বিক্রি হয় না। প্রয়োজনীয় জ্বালানি জঙ্গল থেকে নিয়ে আসে। গ্রামের মানুষ শিকারে যায়, গোসাপ, খরগোশ, ইঁদুর, পাখি, শূকর, কাঠবেড়ালি, ডাকপাখি শিকার করে নিয়ে আসে। জঙ্গল থেকে কেঁদ, মহুল, কাজুবাদাম, কুল, কুসুম, জাম, চাপতি, তাল, খেজুর, আঠাবেল, কতবেল প্রভৃতি সংগ্রহ করে। ৩ জনের ছোট দোকান আছে। একজন বড় ব্যাবসা করতে চায়, অন্যরা সামর্থ্য না থাকার কারন ছোট ব্যাবসা করতে চায়। ২ জন ইন্দিরা আবাস পেয়েছে। সরকারি বাথরুম পায়নি। অনেকের নিজেদের বাথরুম নেই,

এবং বানানোর মানসিকতাও নেই। হাতির তান্ডবে ক্ষতি হয় কিন্তু সরকারি সাহায্য পাওয়া যায় না। বন বাঁচাও কমিটি আছে, জঙ্গলকে সবাই ভালোবাসে। নতুন প্রজন্ম নেশাগ্রস্ত, ২ জন মারা গেছে। অসুখ হলে ওঝার বাড়ি যায়। রেশন ঠিকঠাক পায়, সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে অনেকেই জানে না। সরকার থেকে জলের সুবিধা পাচ্ছে।

❖ কালিপুর, গড়বেতা-১, পশ্চিম মেদিনীপুর:

- **সংস্কৃতি:** - গ্রামে ধামসা মাদল আছে এবং সবাই চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ নাচতে জানে। নতুন প্রজন্মের মেয়েরা চিরাচরিত সাংস্কৃতিক গান গাইতে জানে না কিন্তু নতুন প্রজন্মের ছেলেরা ধামসা মাদল বাজাতে শিখছে। অনুষ্ঠান ছাড়া সাংস্কৃতিক পোশাক পরে না। অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহ হয়নি এই গ্রামের কোন ছেলে মেয়ের। অ-আদিবাসী মানুষদের সাথে বিবাহে বাধ্যবাধকতা আছে সমাজকে বাঁচানোর জন্য। রাত জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় যে পরব হয় সেইখানে ছেলেরা পরব দেখতে যায়। খেলাধুলায় সময় দেয় বেশি।অন্য রাজ্যের মেয়েদের বিবাহ করে নিয়ে এলে এই গ্রামে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয় না। গ্রামের মানুষ ডাইনি প্রথায় বিশ্বাস করে।
- **শিক্ষা:** - প্রাথমিক শিক্ষা সব শিশুরাই শেষ করে। ২০-২৫ জন স্কুল ড্রপ আউট। কলেজের ড্রপ আউট তিনজন। এই গ্রামে কেউ কলেজের পড়া শেষ করেননি। প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সামনে। মিড ডে মিল ভালো চলে। বাড়ির কাজ করবে তাই ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায় না অভিভাবকরা।

- **অর্থনীতি:** - বেশিরভাগ লোকের নিজস্ব চাষের জমি আছে। ১ জন চাকরি করে, বাকিরা সবাই দিনমজুরের কাজ করে। বিভিন্ন সিজিনে এরা অন্যান্য জেলাতেও কাজ করতে যায়। অনেকেরই সঞ্চয়ের মনোভাব আছে আবার অনেকের নেই। একজন ইন্দিরা আবাস পেয়েছে, গ্রামে তিনটে পাকা বাড়ি,বাথরুম দেওয়া হয়েছে সরকার থেকে। জঙ্গল থেকে পাতা সংগ্রহ করে বিক্রি করে, জঙ্গল থেকে প্রয়োজনীয় রান্নার কাঠ সংগ্রহ করে, বন রক্ষা কমিটি আছে। খরগোশ, বনশূকর, গোসাপ, কাঠবেড়ালি, বনবিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি তারা জঙ্গল থেকে শিকার করে আনে। বহেড়া, কেঁদ আমলকি, শাল, সেগুন, পটাশ প্রভৃতি গাছ আছে জঙ্গলে। ওষুধ খেয়ে কোন রোগ না সারলে ওঝার বাড়ি যায়। ওঝা বাঙালিও হতে পারে আবার সাঁওতালও হতে পারে। সবাই ঠিকঠাক রেশন পায়, প্রকল্পের ভাতা সবাই পায়, সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে এদের। বয়স্করা সবাই হাঁড়িয়া মদ খায়, নতুন প্রজন্ম লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খায়। গ্রামে হাঁড়িয়া, মদ সবার বাড়িতেই তৈরি করা হয়। দাসায় নাচ করতে যায় বাজারে। ছেলে মেয়েরা নিজেরা বিয়ে করছে বিভিন্ন পরবে দেখা হয়ে বা স্কুল কলেজে পড়তে গিয়ে। মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এই নিজেরা বিয়ে করার কারণে। অপুষ্টি কোন বাচ্চার নেই। এরা মাছ, মাংস, গেঁড়ি ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। সবার বাড়িতেই ফোন আছে এবং তাদের মতে আগের থেকে তারা তুলনামূলক অনেক ভালো অবস্থাতে আছে।

❖ নলবনা, গড়বেতা-৩:

- **সংস্কৃতি:** - এই গ্রামে চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ সবাই করতে পারে। সব ছেলেরাই ধামসা মাদল বাজাতে পারে। সব মেয়েরাই চিরাচরিত সাংস্কৃতিক গান করতে পারে, নতুন প্রজন্ম

গান শেখার এবং করার চেষ্টা করে। বেশিরভাগ ছেলেরা দূরে মেলা দেখতে যায় রাতে। এই মেলাতে গিয়ে পছন্দের মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে এসে বিয়ে করার রীতি আছে। সাঁওতালদের যতরকম পুজো আছে সব পুজো এই গ্রামের জাহের থানে হয়। এই গ্রামে অ-আদিবাসীদের সাথে ছেলেমেয়েদের বিবাহের ঘটনা নেই এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহ করার আগ্রহও নেই। অন্যান্য জাতিদের পুজো পার্বণে এরা অংশগ্রহণ করে।

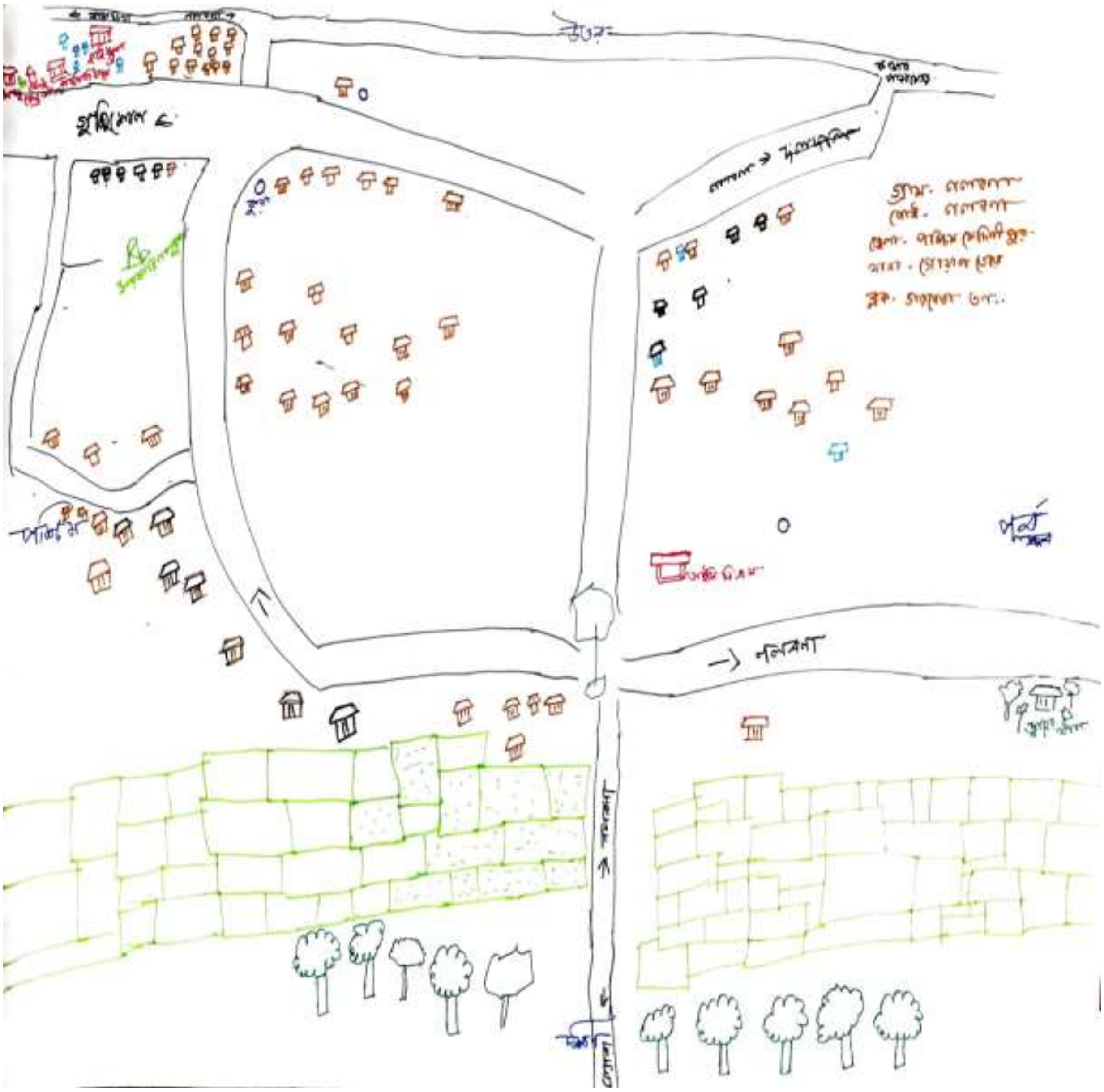

- **শিক্ষা:** - এই গ্রামে প্রায় ১৫ জন মতো স্কুল ছুট হয়েছে হাইস্কুলে, এবং প্রতিটি স্কুলছুটের ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যাই মূল কারণ হিসাবে লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে একটি মেয়ে কলেজে পড়ে। ছেলেদের থেকে মেয়েদের পড়াশোনা করার আগ্রহ বেশি। বর্তমানে তিনটি ছেলে হোস্টেলে পড়াশোনা করছে। অঙ্গনওয়াড়ি গ্রামের কাছে হলেও প্রাইমারি এবং হাই স্কুল একটু দূরে।
- **অর্থনীতি:** - এই গ্রামে দুজন চাকরি করে। একজন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আর একজন সেনাবাহিনীতে। গ্রামের প্রায় সবারই চাষের জমি আছে। বৃষ্টি না হলে ধান বা সবজি চাষ হয় না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি অনেকে পায়নি। গ্রামের মানুষের প্রধান কাজ হল জ্বালানি কাঠ,পাতা বিক্রি করা। বেশির ভাগ মানুষ দিনমজুরির কাজ করেন। কাঠবেড়ালী, খরগোশ, ইঁদুর, গোসাপ, পভৃতি তারা খাদ্য হিসাবে জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে থাকে। জঙ্গলে যে গাছগুলো পড়ে যায় এবং বাঁকা সেই গাছগুলোই গ্রামের মানুষ কাটে। প্রায় অধিকাংশ যুবকরা নেশাগ্রস্ত। জঙ্গলে শাল, মহুল, কেঁদ, পিয়াল, হরিতকী, চাপাতি, কুল, খেজুর, কুসুম গাছ আছে। জঙ্গল বাঁচাও কমিটি আছে। জঙ্গলকে সবাই রক্ষা করতে চায়। রেশন সবাই ঠিকঠাক পাচ্ছে। অধিকাংশ মানুষই সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জানে না। সরকার থেকে দেওয়া জলের সুবিধা পায়। গ্রামের মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত।

❖ বুলান পুর (মোড়ল পাড়া), গড়বেতা-২:

- **সংস্কৃতি:** – এই গ্রামের সবাই চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ নাচতে পারলেও নতুন প্রজন্ম চিরাচরিত সাংস্কৃতিক গান করতে পারে না। গ্রামে ধামসা মাদল থাকায় সবাই ধামসা মাদল

বাজাতে জানে। জাহের থানে সাঁওতালদের সবরকমের পুজো হয়। তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় ডিজে বাজিয়ে নাচ, গানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পুজোর সময় এবং অন্য সময় দূরে মেলা দেখতে গিয়ে বিয়ে করার রীতি আছে। বর্তমানে ৪ টি পরিবার খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। খিষ্ট্রান সাঁওতালরা খিষ্টানদের সাথে বিয়ে করছে। অন্য জাতির পুজো পার্বণে এই গ্রামের মানুষ অংশগ্রহণ করেনা।

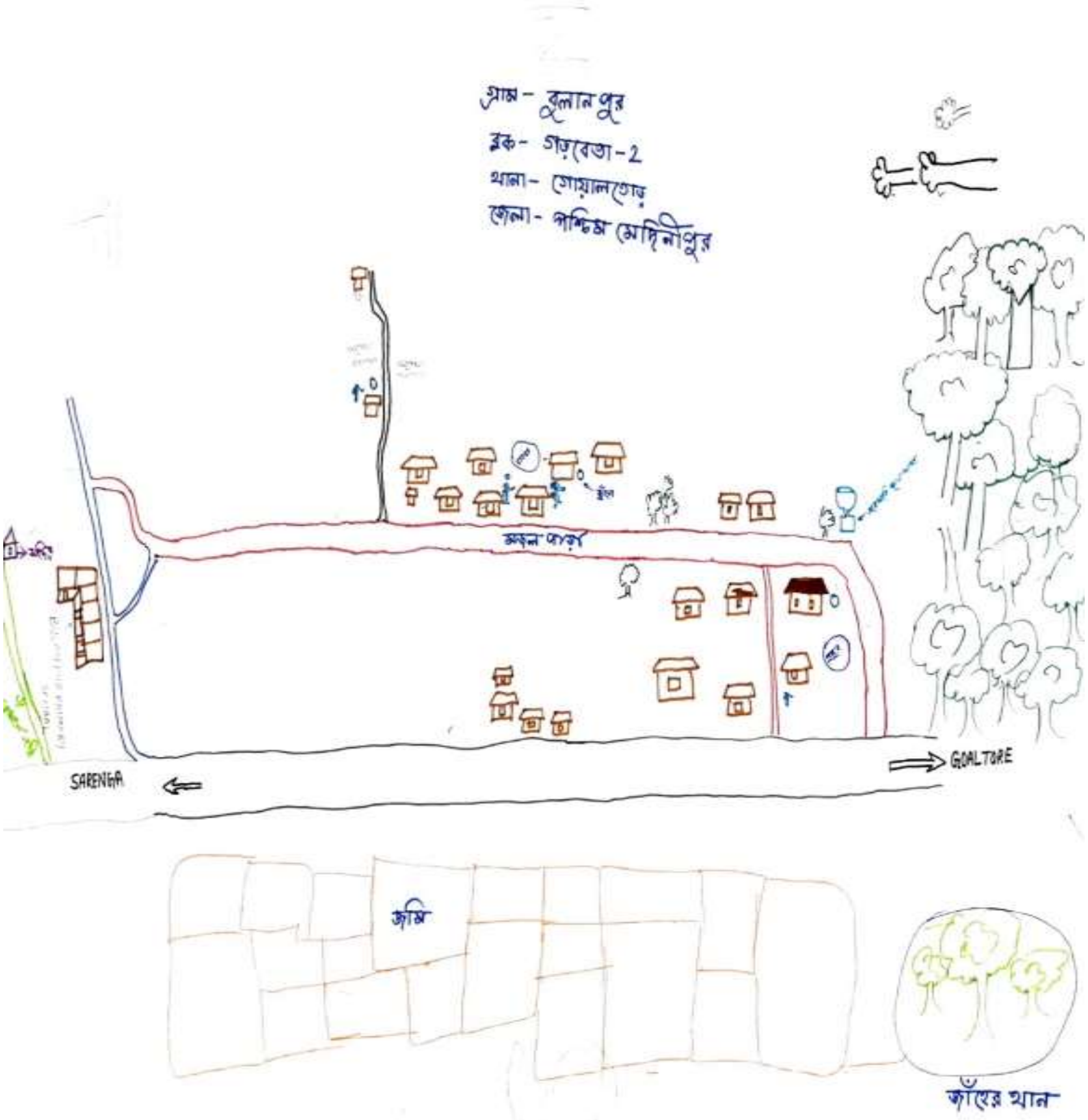

- **শিক্ষা: –** নতুন জেনারেশনের সব ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে, সবাই কলেজ পাশ করেছে, তবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার হার বেশি। একজন ডাক্তারি পড়ছে।

- **অর্থনীতি: -** প্রায় সবারই চাষের জমি আছে। পাম্পের জল এবং কংসাবতী ড্যাম থাকায় বছরে ২ বার চাষ হয়। এছাড়াও আলু, সরিষা, তিল,সবজি চাষ হয়। পুরানো জেনারেশনে ৪ জন শিক্ষক ছিলেন ইতিপূর্বেই তাঁরা মারা গেছেন। নতুন প্রজন্মের ২ জন মহিলা উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষিকা, ১ জন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা, ২ জন শিক্ষক, ১ জন প্রফেসর, ১ জন ডাক্তার, ১ জন এ ডি ও, ৩ জন সি আর পি এফ, ২ জন পুলিশ, ১ জন ক্লার্ক, ১ জন রেলকর্মী, ৩ জন রেলের প্রাক্তন অফিসার, ২ জন রেশন সরবরাহের কাজ করে। জঙ্গল থেকে মাশরুম, শালপাতা, খামালু সংগ্রহ করে। খরগোশ, বনবিড়াল, বন শুকর, গোসাপ প্রভৃতি জঙ্গল থেকে শিকার করে নিয়ে আসে। ৫ জন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি পেয়েছে।

❖ কামারবান্ধি, ঝাঁকড়া, চন্দ্রকোনা-২

- **সংস্কৃতি :-** গ্রামের সবপুজোতেই সবাই অংশগ্রহণ করে। সবাই চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ করতে পারে। পুরনো প্রজন্ম সাংস্কৃতিক গান জানলেও বর্তমান প্রজন্ম সাংস্কৃতিক গান শেখেনি। গ্রামে ধামসা মাদল থাকার কারণে সবাই বাজাতে শিখেছে। এই গ্রামে অন্য জাতিতে বিবাহ নেই, অন্য জাতিতে বিয়ে না করার জন্য গ্রাম থেকে কড়া নিয়ম করা হয়েছে। তবে অন্য জাতিতে বিয়ে করার ব্যাপারে ধীরে ধীরে মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। ছেলেরা প্রচুর পরিমাণে পাতা পরবে ঘোরে। এই গ্রামের ছেলেরা প্রেম করে বিয়ে করেছে কিন্তু মেয়েরা

প্রেম করে বিয়ে করেনি। যারা প্রেম করে বিয়ে করেছে তারা অল্প বয়সে বিয়ে করে ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অপুষ্ট বাচ্চার জন্ম হয়।

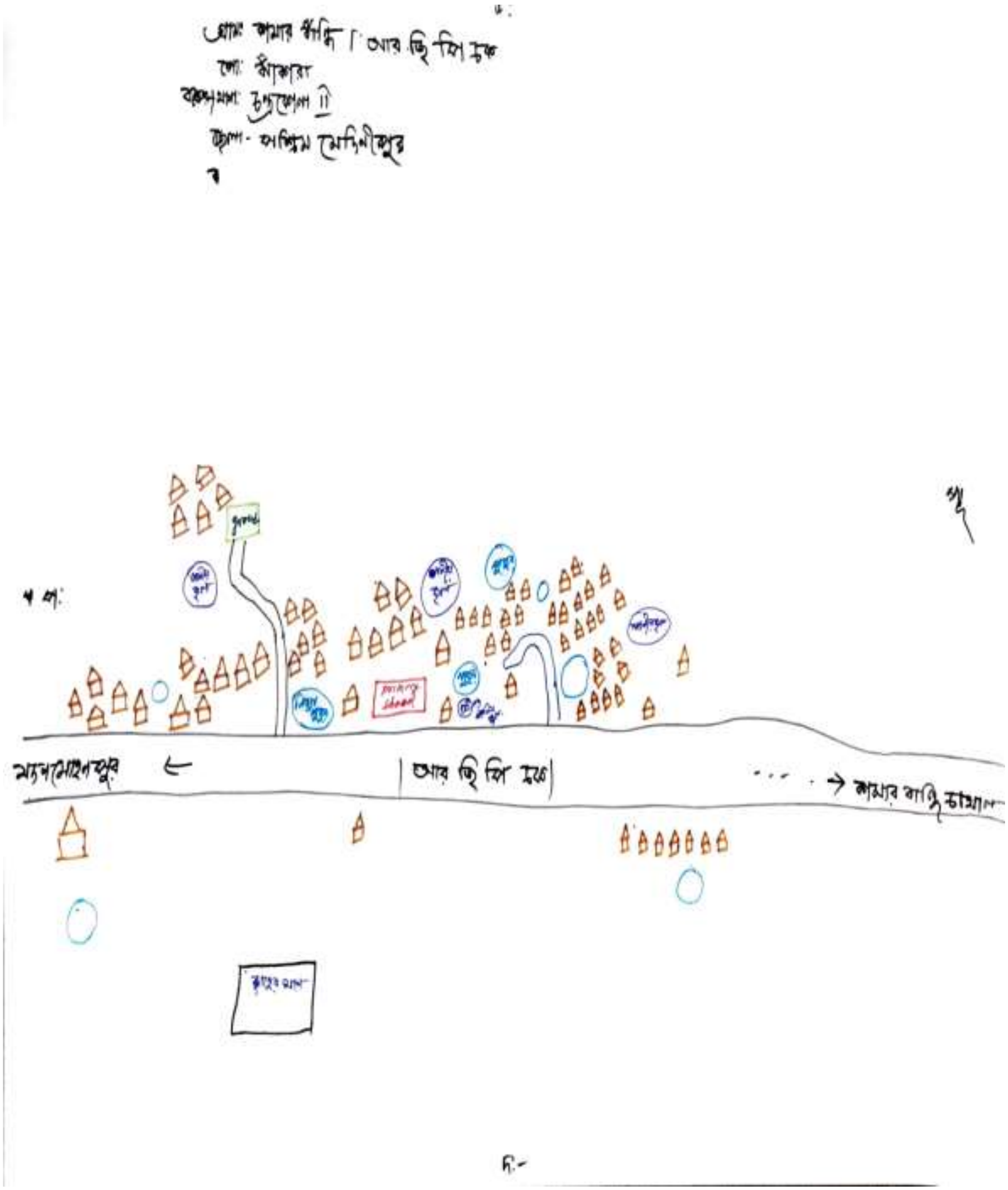

- **শিক্ষা: -** এই গ্রামে শিক্ষার হার খুবই কম। প্রায় ৬৮ জন স্কুলছুট আছে। স্কুল ছুট হওয়ার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক সমস্যা এবং খেলাধুলার জন্য পড়াশোনা হয় না বলেই গ্রামের মানুষের ধারণা। এই গ্রামে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে স্নাতক স্তরের পড়া সম্পূর্ণ করতে পেরেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মিড ডে মিলের সমস্যা আছে, খাবার মান ভালো নয়। বর্তমানে চাকরির অবস্থা বেহাল বলে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় আগ্রহ পাচ্ছে না। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার হার বেশি।
- **অর্থনীতি: -** এই গ্রামের সবারই কমবেশি চাষের জমি আছে, এই জমিগুলোতে ধান এবং আলু চাষ হয়। অসুখ-বিসুখ হলে এরা ডাক্তার দেখায় এবং প্রাচীন পদ্ধতিও অবলম্বন করে। যে কোন অনুষ্ঠানে বাড়িতে হাঁড়িয়া এবং মদ তৈরি করা হয়। বয়স্করা মদ, হাঁড়িয়া খায় এবং তার সাথে নতুন প্রজন্মও খাওয়া শুরু করেছে। ১৫ টি পরিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছে। সবাই রেশন ঠিকঠাক পায়, কেউ পুরোহিত ভাতা পায়না। বেশিরভাগ মানুষ দিনমজুরের কাজ করে। গ্রামে একজনের ভূষিমাল দোকান এবং একজনের পান দোকান আছে। বর্তমানে এই গ্রামের বেশিরভাগ পরিবারেরই সঞ্চয়ী মনোভাব আছে।

❖ মোহনপুর (টলিপাড়া) চন্দ্রকোনা ১:

- **সংস্কৃতি :-** পুরনো প্রজন্মের সাথে নতুন প্রজন্মের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের অভাবের জন্য নতুন প্রজন্ম নাচ গান জানেনা। এই গ্রামে কোন ছেলেমেয়েদের অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহ হয়নি বলে মেনে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। পাড়ার মা:মড়ে না হলে অন্য সংস্কৃতির পুজাতে অংশগ্রহণ করে না। নিজস্ব কোন পুজো হলেই তারা সাংস্কৃতিক পোশাক পরে।

পরবে গিয়ে বা নিজের মতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার প্রবণতা বেশি।নতুন প্রজন্ম ও পুরনো প্রজন্ম সবাই কম বেশি মদ বা হাঁড়িয়ার নেশায় আসক্ত। অসুস্থ হলে গ্রামের লোক আগে ডাক্তার খানা যায় তারপরও অনেক দিন ধরে সুস্থ না হলে ওঝার বাড়ি যায়।

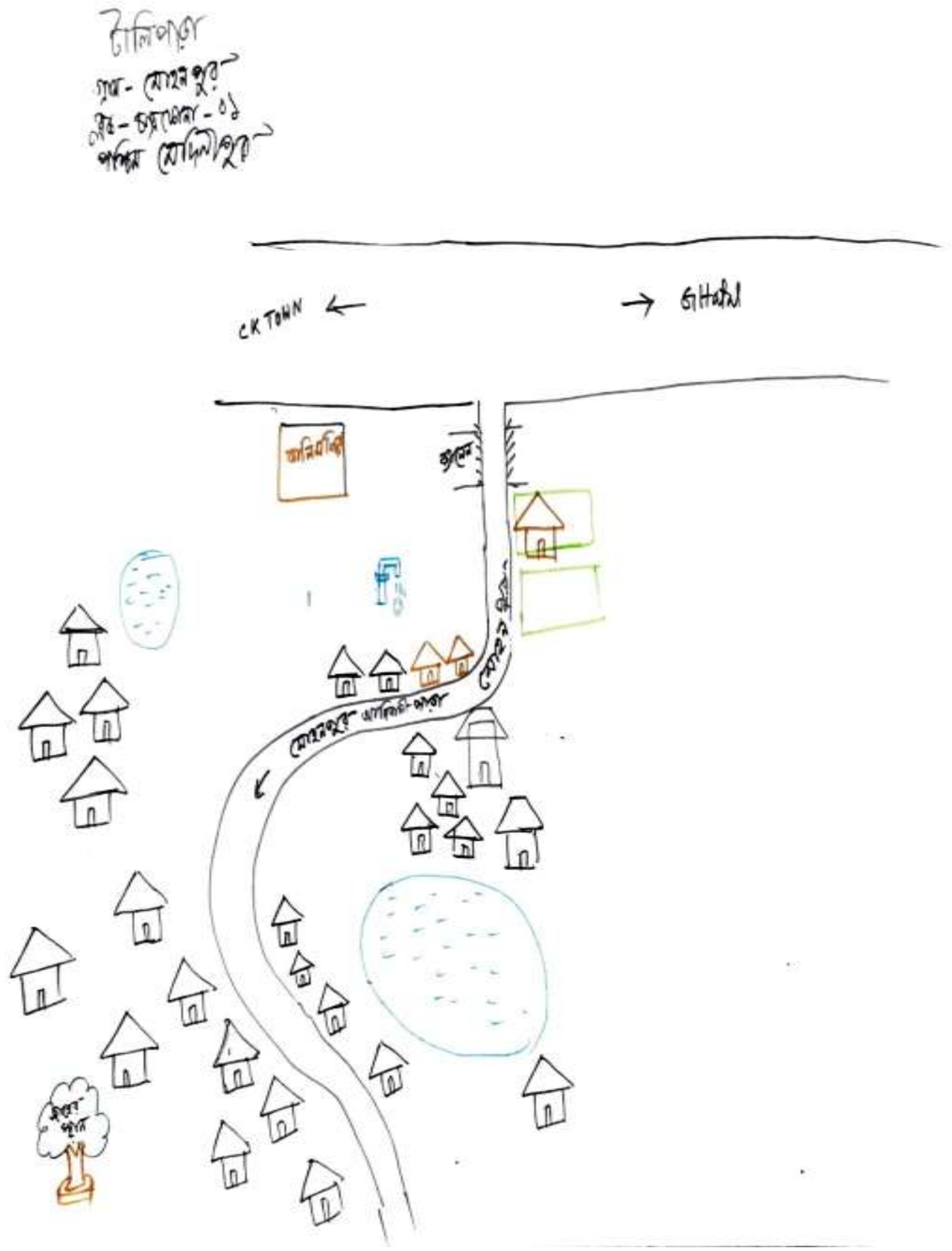

- **শিক্ষা:** - হাই স্কুল ও প্রাইমারি স্কুল অনেক দূরে তা সত্ত্বেও নতুন প্রজন্ম সবাই পড়াশোনা করছে, ৩ জন মাধ্যমিক পাশ করেছে, অলচিকি মাধ্যমে কেউ পড়াশুনা করে না। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত নেই। স্কুলে ভাষাগত বা জাতিগত ভেদাভেদের কোন সমস্যা নেই।
- **অর্থনীতি:** - গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের জমি নেই, তাই দিনমজুর করে সংসার চলে। ৬ জন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছে, সবাই রেশন পায়, বার্ধক্যভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায়। আগের তুলনায় এখন অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। গ্রামে পঞ্চায়েত প্রধানরা এসে খবর নেয়।

❖ সবং (উচিৎপুর):

- **সংস্কৃতি:-** সরকার থেকে ধামসা মাদল দিয়েছে তাই সবাই ধামসা মাদল বাজাতে জানে, নাচ গান করার সুবিধা হয়েছে এবং সবাই করতে পারে। একজন মেয়ে অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে বিয়ে করেছিল, তার পরিবারকে একঘরে করা হয়েছে। তারপর থেকে অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে বিবাহে কেউ আগ্রহী কিনা বোঝা যাচ্ছে না। অন্য জাতির মানুষের সাথে মেলামেশাতে জাতিগত কোনও সমস্যা নেই। সবাই পরবে যায়। নতুন প্রজন্ম গান শিখতে আগ্রহী। এই গ্রামে পরব থেকে বেশি বিয়ে করে নিয়ে আসে, বা কমবয়সে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করছে। ডিজে বাজিয়ে নাচ গান করে। পুজোতে সাংস্কৃতিক পোশাক পরে। ডাইনি প্রথা আছে। অসুস্থ হলে সবাই হাসপাতালে যায়।
- **শিক্ষা:** - অঙ্গনওয়াড়ি, প্রাথমিক, হাইস্কুল, গার্লস স্কুল সব ৫০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে। স্কুলে ভাষাগত সমস্যা বা জাতিভেদ প্রথা নেই। কন্যাশ্রী, মিড-ডে মিল পায়, সেজন্য সব বাচ্চা

স্কুলে যায়। কয়েকজন নিজের ইচ্ছাতেই স্কুলে যায়নি। ১ জন কলেজে স্নাতক স্তরের কোর্স পাশ করেছে, ৩ জন কলেজের পড়া শেষ করেনি।

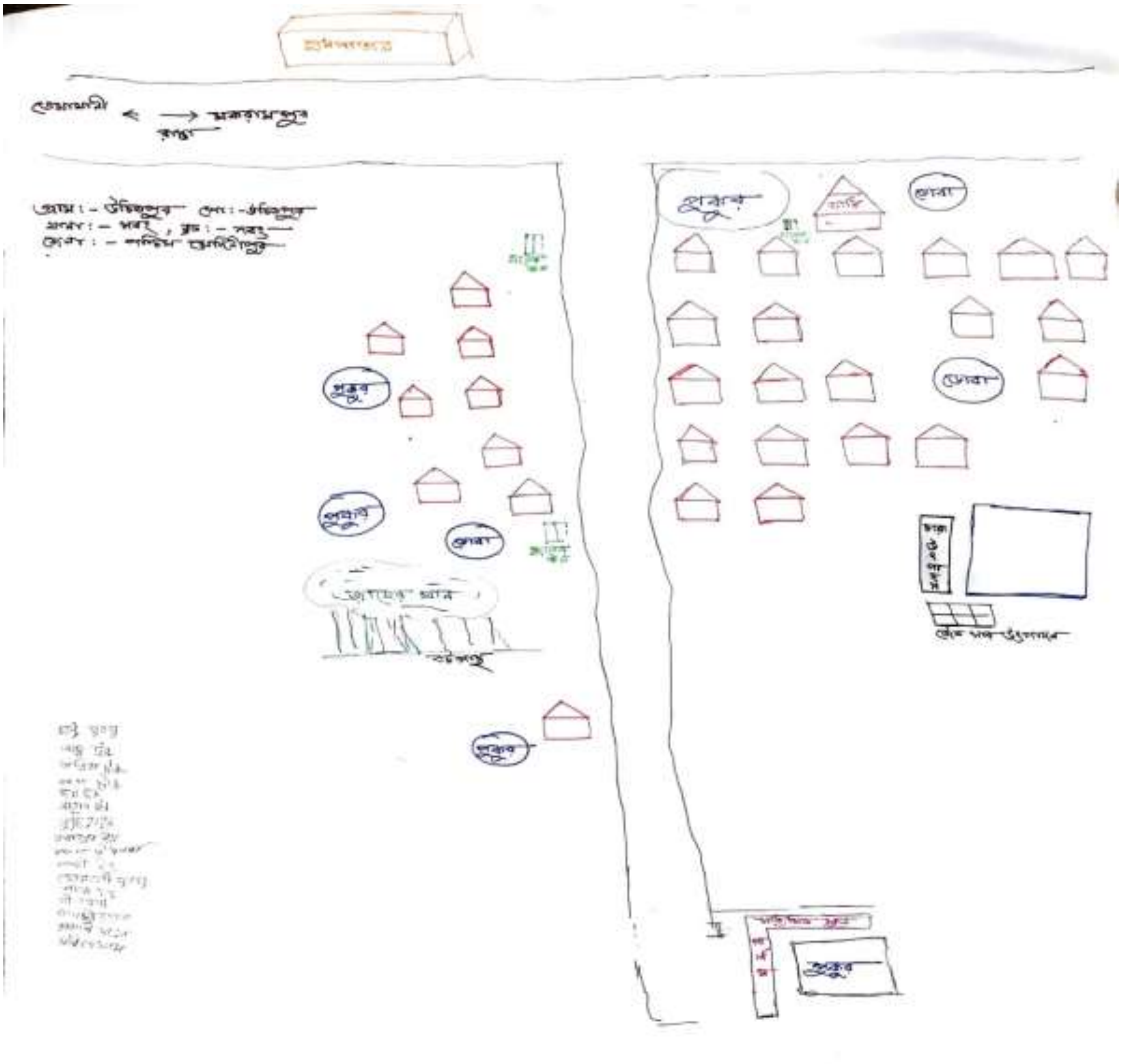

- **অর্থনীতি:** - এই গ্রামের কেউ চাকরি করে না, গ্রামের সবার জমি থাকলেও সবাই দিনমজুরের কাজ করে। বছরে দুবার চাষ হয়। পুরুষরা লেবারের কাজ করে। ১২ জন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি পেয়েছে। সবার বাথরুম আছে। মেয়েরা সবাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায়। চাষের

জল কিনতে হয়। তবে খাওয়ার জলের ব্যাবস্থা আছে। যাদের নিজস্ব জমি আছে তারা ক্ষতিপূরণ পায়।

❖ পলাশী (ডেবরা):

- **শিক্ষা:** – প্রাথমিক, হাইস্কুল সামনে হওয়ার দরুন সবাই স্কুলে যায়। তবে অভাবের কারণে ২৫-৩০ জন মাঝপথে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। ১২ জন কলেজ পাশ করেছে। ৫ জন কলেজ যাচ্ছে। স্কুলে বা কলেজে জাতিভেদ প্রথা নেই।

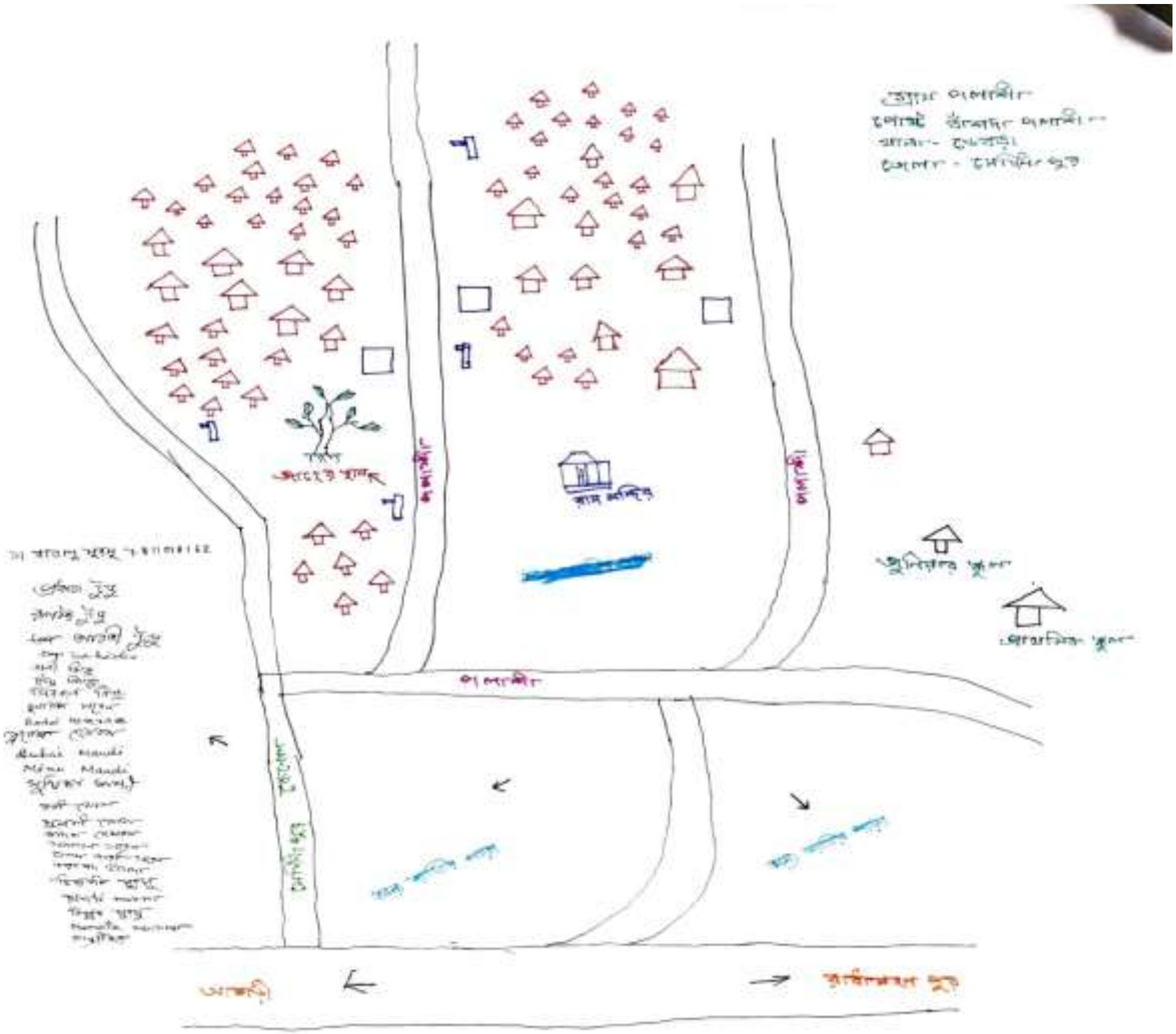

- **অর্থনীতি:** – ২ জন চাকরি করে, ১ জন হাইস্কুলের চাকরি করে, ১ জন প্রাথমিকে চাকরি করে। ১ জনের নিজস্ব পাকা বাড়ি আছে। ৪০ জন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি পেয়েছে ও সবার বাথরুম আছে। সরকারি পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। ২ বার ধান চাষ হয় এবং সব্জি চাষও হয়। অনেকেই দিনমজুরের কাজ করে। ১৪ টি হাড়িয়া ও মদের ভাটি থাকায় অনেকেই লুকিয়ে মদ পান করে তাই কিছুজনের সঞ্চয়ী মনোভাব নেই।
- **সংস্কৃতি:** – গ্রামে ধামসা মাদল নেই, পুরনো প্রজন্ম ধামসা মাদল বাজাতে বা গান করতে জানলেও নতুন প্রজন্ম জানে না। তাদের মধ্যে ডিজে বাজানোর প্রবণতা বেশি। মাঝি পরগনা মহলের সাথে কথা বলে সংস্কৃতি রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। গ্রামের সমস্ত পুজো জাহের থানেই হয়। পুজো বা কোনো অনুষ্ঠানে নিজস্ব সংস্কৃতির পোষাক পরে। অন্য জাতির মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং অন্যজাতির পুজোতে অংশগ্রহণ করে। ১ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ের অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে বিয়ে হয়েছে। এনিয়ে গ্রামের লোকের কোনো সমস্যা নেই।

❖ কেঠিয়া, বেনাপুর, খড়গপুর:

- **সংস্কৃতি:** - সবপুজো জাহের থানে হয়। নতুন প্রজন্ম গান, ধামসা, মাদল বাজাতে জানে না কিন্তু শিখছে। তবে ডিজে বাজানোর প্রবণতাই বেশি। নিজস্ব সংস্কৃতির পোষাক শুধুমাত্র পুজো বা অনুষ্ঠানেই পরা হয়। ছেলেরা পরব দেখতে যায় কিন্তু পরব থেকে বিয়ে করে নিয়ে আসেনি। অন্যজাতির মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের পুজোতে অংশগ্রহণ করে। কম বয়সে বিয়ে করেছে অনেকেই এবং অন্য জাতিতে বিয়ে হয়নি। অন্য জাতিতে বিয়ে

করলেও একঘরে করার ব্যাপার নেই বলেই নতুন প্রজন্মের মতামত। পালিয়ে বিয়ে করার ঘটনা আছে।

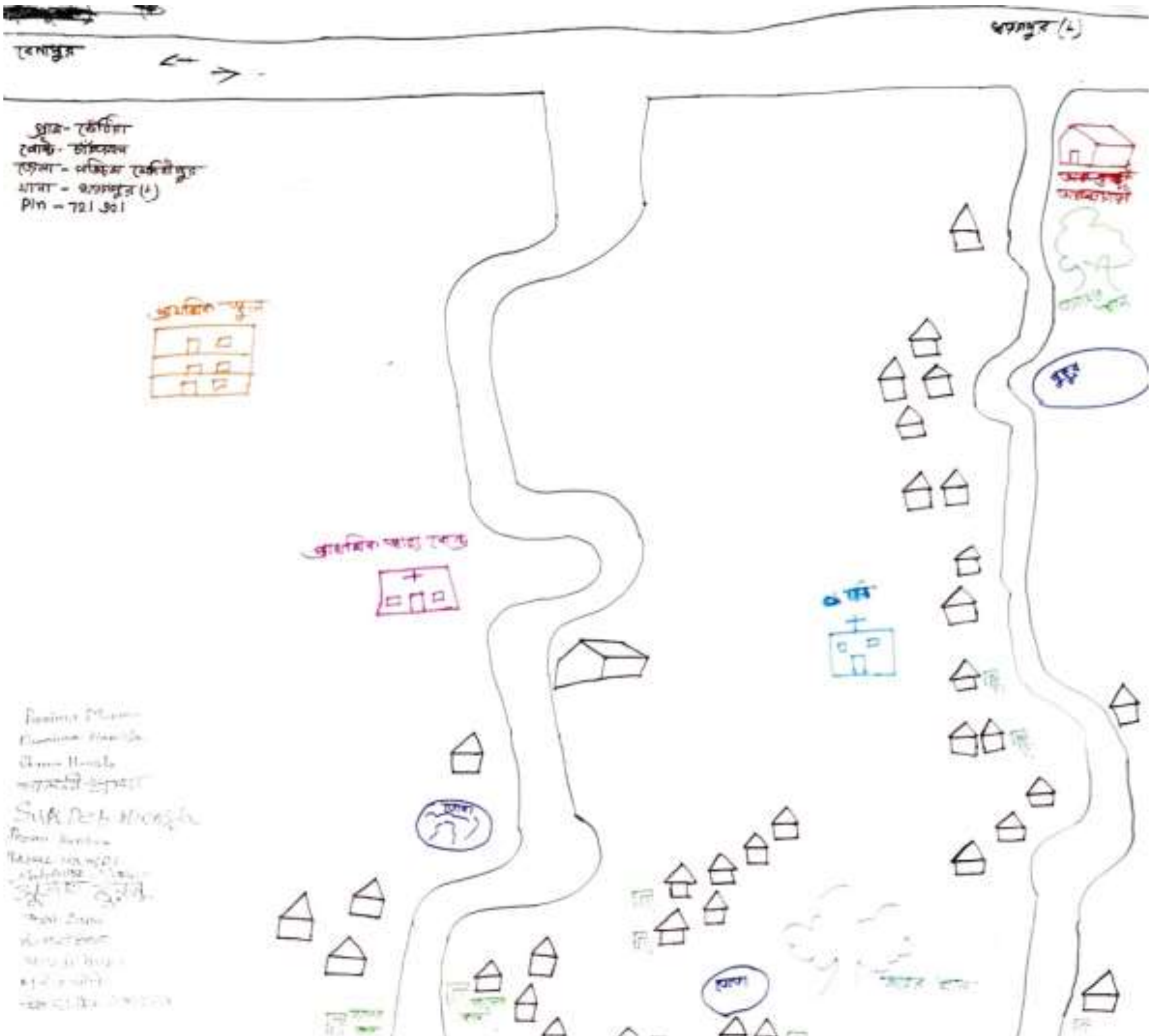

- **শিক্ষা:** – প্রাথমিক ও অঙ্গন ওয়াড়ি স্কুল সামনে, হাইস্কুল একটু দূরে হলেও সবাই স্কুলে যায়। ৩ জন কলেজ স্তরে পাশ করেছে। ৩ জন ছেলে ইচ্ছে করে পড়া বন্ধ করেছে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পড়াশোনা করার প্রবণতা বেশি।

- **অর্থনীতি:** – কমবেশি সবারই চাষের জমি আছে, জলের অভাবের জন্য শুধু বর্ষাতে চাষ হয়। দিনমজুরের কাজ করে সবাই। অন্য জায়গাতেও দিনমজুরের কাজ করতে যায়। একজনের ছোট দোকান আছে। সরকার থেকে সবাই জল আর বাথরুম পেয়েছে। রেশন সব পরিবারই পায়। ২০১৭ তে ৪ জন আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছে। গ্রামে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। অসুখ হলে সচেতনতার সাথে হাসাপাতালে যাওয়ার প্রবণতা কম। গ্রামে ডাইনি প্রথা আছে। সচেতনতার অভাবে অনেকেরই আধার কার্ড, রেশন কার্ড হয়নি বলেই মতামত। সবাই নেশাগ্রস্থ, মদ এবং হাঁড়িয়া খায়। গ্রামে মদের ভাটি আছে। সঞ্চয়ী মনোভাব খুব কম মানুষের আছে।

❖ বেগমপুর (কেশিয়ারি):

- **সংস্কৃতি:** – গ্রামে ৬০টি বাড়ি আছে। গ্রামের নিজস্ব বা সরকারি ধামসা মাদল নেই, নতুন প্রজন্ম গান জানেনা। ডিজে বাজানোর প্রবণতাই বেশি। পুজোতে বা অনুষ্ঠানে নিজস্ব সংস্কৃতির পোষাক পরা হয়। জাতিভেদ প্রথা নেই, শিব মন্দিরে পুজো দিতে যায়। পরবে গিয়ে ছেলে মেয়েরা কম বয়সে পালিয়ে বিয়ে করে। একটি ছেলে অন্য জাতির মেয়েকে বিয়ে করেছে। একঘরে করার প্রবণতা নেই। ডাইনি প্রথায় বিশ্বাস করে।
- **শিক্ষা:** – সবাই স্কুলে যায়, ৩ জন জন কলেজ পাশ, ৪ জন উচ্চ মাধ্যমিক, ৪ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ১২ জন নিজের ইচ্ছায় পড়া ছেড়েছে। পুরনো প্রজন্ম শারীরিক অসুস্থতা বা সচেতনতার কারনে নেশা কম করে। নতুন প্রজন্ম লুকিয়ে মদ খায়।

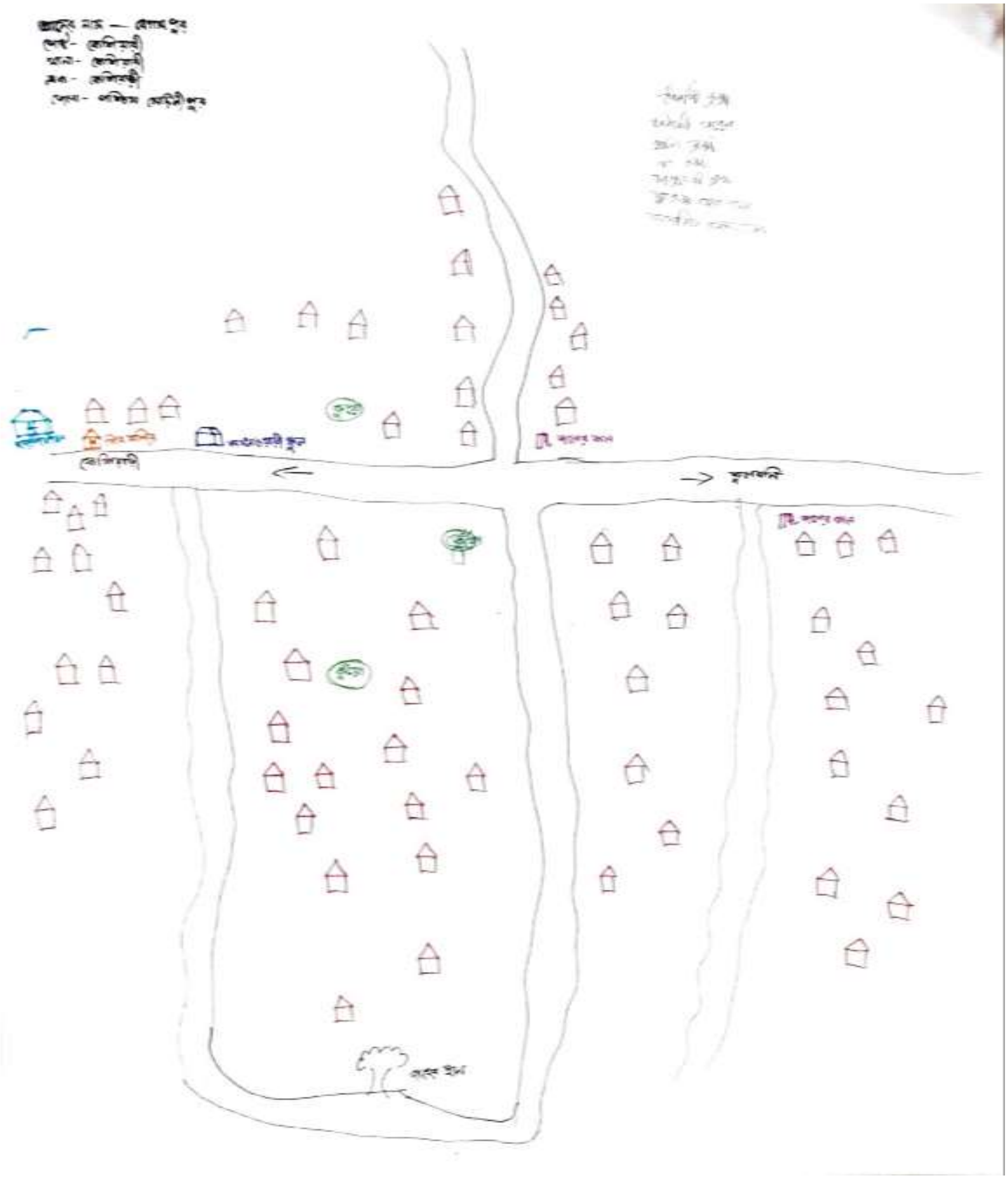

- **অর্থনীতি:** – ৬০ টি পরিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি পেয়েছে। জল এবং বাথরুম সবাই পেয়েছে। তবে ঠিকভাবে জলের ব্যবস্থা হয়নি। সবারই চাষের জমি আছে, ২ বার ধান চাষ হয়। বেশিরভাগ মানুষই দিনমজুরের কাজ করে। রাস্তা ভালো। ১৫ টি পরিবারের সঞ্চয়ী মনোভাব আছে।

❖ রানীর বাজার (ঘাটাল):

- **সংস্কৃতি:** – পুজোতে বা অনুষ্ঠানে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পোশাক পরার চল আছে। গ্রামে ধামসা মাদল নেই কিন্তু অনুষ্ঠানের সময় ভাড়া করে নিয়ে এসে নতুন প্রজন্ম এবং আগের প্রজন্ম নাচ গান করে। ডিজে চলে না। মাঝি পরগনা মহলের সাথে যোগাযোগ নেই। অন্য জাতির পুজোতে অংশগ্রহণ করে। ছেলে মেয়েরা পরব দেখতে যায়। অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহ হয়নি। ডাইনি প্রথা আছে।

- **শিক্ষা:** – হাইস্কুল এবং প্রাইমারি স্কুল সামনেই। দিনমজুরের কাজে এসে তিন প্রজন্ম এখানে বসবাস করছে। এখন অবধি তিনজন কলেজ পাশ করেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য অনেকেই পড়াশোনা করতে পারেনি। বিদ্যালয়ে বা কলেজে জাতিগত বা ভাষাগত সমস্যা নেই।

- **অর্থনীতি:** – জমি কারোরই নেই তাই সবাই দিনমজুরের কাজ করে। সরকার থেকে মাত্র তিনটি বাড়ি পেয়েছে। বাথরুম পেলেও সম্পূর্ণ হয়নি। সরকার জলের ব্যাবস্থা করলেও জলের সমস্যা মেটেনি। অর্ধেকের বেশি বাড়িতে কারেন্ট নেই। মোবাইল ব্যবহার করে।

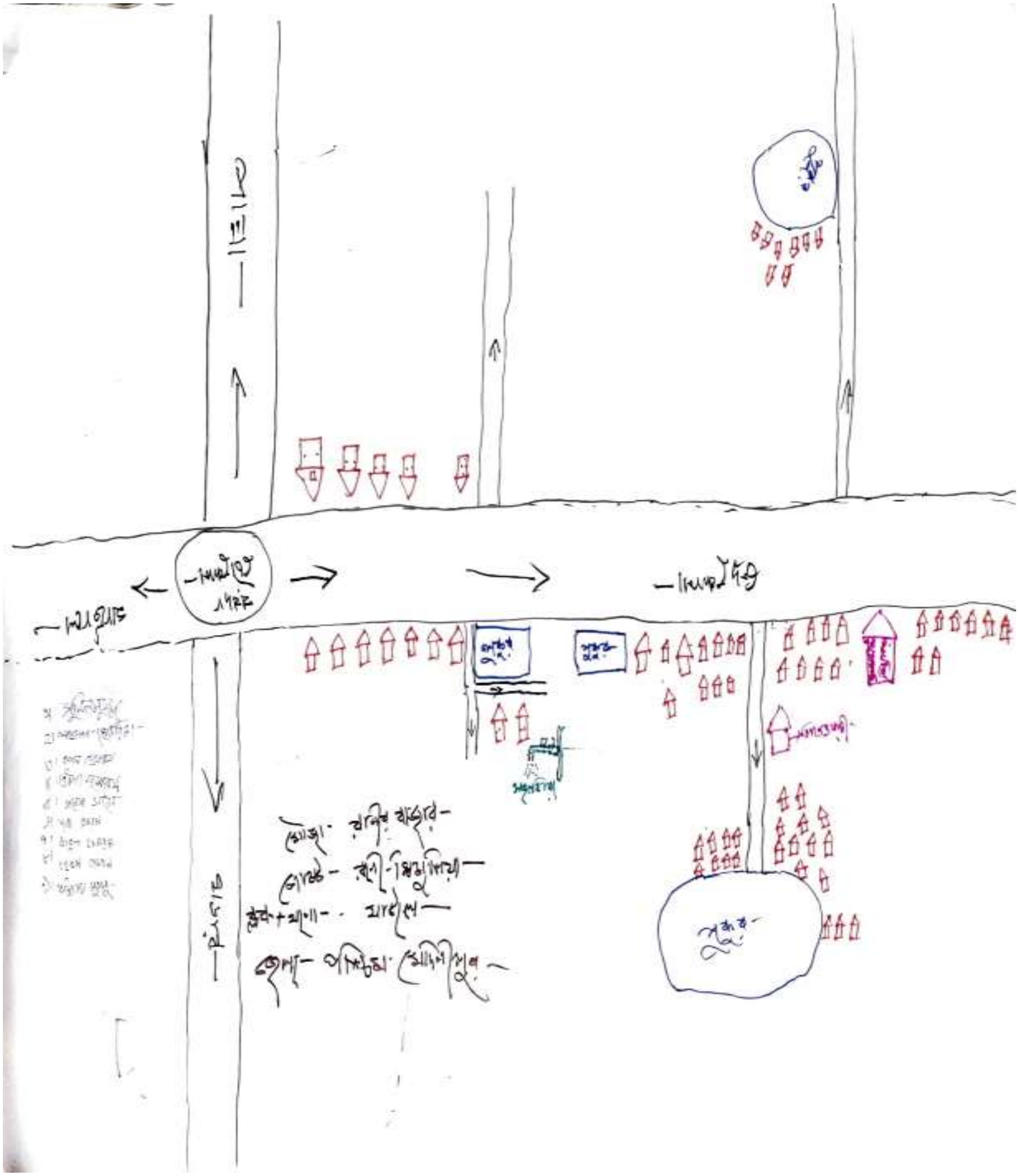

রোগ অনেকদিন ধরে ভালো না হলে ওঝার বাড়িতে যায়। যাদের জমির কাগজ আছে তাদের বাড়িতে কারেন্ট পেয়েছে টাকার বিনিময়ে। যাদের কাগজ নেই তারা কারেন্ট পায়নি। বাকি সরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা তারা পেয়ে থাকে।

❖ পাইরাশি, চাঁইপাট, দাসপুর-২:

- **সংস্কৃতি:** – এই গ্রামে যতগুলি পরিবার বাস করে সবাই বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজ করতে এসে এই গ্রামে বসবাস করছেন। এই গ্রামে মাঝি ব্যবস্থা থাকলেও জাহের থান নেই। তাই সাঁওতালি রীতিনীতি অনুযায়ী কোন পূজো হয় না। এই গ্রামে অনুষ্ঠান করে কারোর বিয়ে হয়নি। যতগুলো বিয়ে হয়েছে তার মধ্যে কোন কোনটা দেখতে গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে, আবার কেউ পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। অ-আদিবাসীদের সাথে এই গ্রামের কারো বিয়ে হয়নি। তবে অ-আদিবাসীদের বিভিন্ন পুজোতে অংশগ্রহণ করে। গ্রামের মানুষ ডাইনী প্রথায় বিশ্বাস করে। গ্রামের নিজস্ব ধামসা মাদল নেই। যে কোন অনুষ্ঠানে ধামসা মাদল বাজিয়ে নাচ করার থেকে মাইক বাজিয়ে নাচ করার প্রবণতা বেশি।
- **শিক্ষা:** - বর্তমানে সব শিশুরা স্কুলে যায়। একজন দ্বাদশ শ্রেণীর পড়া শেষ করেছে। কোন ছেলে মেয়ে স্নাতক স্তরের পড়া করেনি। তিনজন স্কুল ছুট শিশু আছে। স্কুল ছুট হওয়ার কারণ হিসেবে অভিভাবকদের অসচেতনতা এবং দরিদ্রতা কে গ্রামের মানুষ দায়ী করেছেন। অভিভাবকরা শিক্ষিত নন। যে দিনগুলোতে অভিভাবকরা দিনমজুরের কাজে যান সেই দিনগুলোতে শিশুরা বাড়িতে ভাই-বোনদের দেখাশোনা করে। অঙ্গনওয়াড়ি, প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রামের সামনেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অ-আদিবাসী অভিভাবকরা তাদের বাচ্চাদেরকে সাঁওতাল বাচ্চাদের সাথে মিশতে দেয় না। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই সমস্যা নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ভাষাগত সমস্যা কোন নেই। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার আগ্রহ বেশি।

• **অর্থনীতি:** - এই গ্রামের সবাই স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য এদের নিজস্ব কোন জমি নেই। গ্রামের সবাইকে বাড়ি এবং বাথরুম দেওয়া হয়েছে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ বাথরুম ব্যবহার করে না। সরকারি পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। সঠিকভাবেই সবাই রেশন পায়। জাতিগত শংসাপত্র জমা না দেওয়ার জন্য অনেকেই লক্ষীভান্ডার পায়নি। সরকারি বিভিন্ন স্কিম বা

অনুদান সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। সব বাড়িতেই ছেলেরা নেশায় আসক্ত। গ্রামের মহিলারা নেশা করেন না। গ্রামে চারজনের বাড়িতে কারেন্ট নেই। বিল দিতে পারবেন না বলে তারা কারেন্ট রাখতেও চাননি। সবার বাড়িতে গরু ছাগলের চাষ আছে। দুজনের বাড়িতে বাইক আছে। এই গ্রামে কেউ চাকরি করে না।

❖ কলকলি, কেশপুর ব্লক:

- **সংস্কৃতি:** – গ্রামের নিজস্ব ধামসা মাদল আছে। পুরনো প্রজন্ম চিরাচরিত সাংস্কৃতিক বাজনা বাজাতে পারলেও নতুন প্রজন্ম বাজাতে পারে না। পুরানো প্রজন্মের মহিলারা চিরাচরিত সাংস্কৃতিক গান করতে পারলেও নতুন প্রজন্ম চিরাচরিত সাংস্কৃতিক গান করতে পারে না। গ্রামে জাহের থান আছে, এখানে সাঁওতালি রীতিতে সমস্ত পুজো হয়। শুধুমাত্র অনুষ্ঠানের সময় তারা চিরাচরিত সাংস্কৃতিক পোশাক পরে। এই গ্রামের বেশিরভাগ ছেলে মেয়েরা কম বয়সে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করছে। অনেক ক্ষেত্রে কম বয়সী মেয়েদের কেও বাড়ি থেকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। অ-আদিবাসী মেয়েকে একজন সাঁওতাল ছেলে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে। গ্রামের মানুষ এবং নতুন প্রজন্মের মতে অ- আদিবাসীদের সাথে কেউ বিয়ে করলে তাদের কোন সমস্যা নেই। গ্রামের মানুষই ডাইনি প্রথায় বিশ্বাস করে। অ-আদিবাসীদের পুজোতে এই গ্রামের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
- **শিক্ষা:** - নতুন প্রজন্মের সবাই স্কুলে যায়। এই গ্রামে নতুন প্রজন্মের কেউ কলেজের পড়া শেষ করেনি। এই গ্রামে প্রায় সাত থেকে আটজন স্কুল ছুট আছেন। অভিভাবকদের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের অনীহার কারণেই স্কুলছুট হয়েছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

বিশেষ করে ছেলেদের ফুটবল খেলা, ঢালাই বল খেলা, বিভিন্ন পাতা, পরবে ঘুরতে গিয়ে পড়াশোনার ক্ষতি হয়। বিদ্যালয়ে জাতিগত কোন সমস্যা নেই বা ভাষাগত সমস্যা নেই। এই গ্রামের ছেলে এবং মেয়ে কারোরই বিশেষ পড়াশোনা করার আগ্রহ দেখা যায় না। গ্রামের কাছাকাছি অঙ্গনওয়াড়ি, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল আছে।

- **অর্থনীতি:** - এই গ্রামে কমবেশি সব পরিবারেই জমি আছে। এই গ্রামের দুইজন চাকরি করে। তিনজনের পাকা বাড়ি আছে। গ্রামে সরকারের সজল ধারার জলের ব্যবস্থা নেই। সবার বাড়িতে বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। সরকারি সাহায্য সবাই পায়। অসুখ হলে আগে হাসপাতালে যায়, দীর্ঘদিন ভালো না হলে ওঝার বাড়িতে যায়। গ্রামের মানুষ মাঝে মধ্যে শিকার করতে যায়। ইঁদুর, পাখি ইত্যাদি শিকার করে নিয়ে আসে।

❖ ঝাড়গ্রাম জেলা,বড়াশুলি:

- **সংস্কৃতি:** এই গ্রামে মহিলা এবং পুরুষ উভয়েই বিভিন্ন পরব, পূজো বা বিয়ের অনুষ্ঠানে তাদের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ নাচতে জানে। বয়স্ক মহিলারা চিরাচরিত সাংস্কৃতিক গান করতে পারে, নতুন প্রজন্ম এই চিরাচরিত গান করতে জানেনা এবং তারা চিরাচরিত গান শিখতে ততটা আগ্রহীও নয়। নাচ গানের সংস্কৃতি ধরে রাখতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা

করেন সমাজের রীতিনীতি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে। এই গ্রামে অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে

বিয়ের ঘটনা নেই এবং নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও অন্য জাতিতে বিবাহে আগ্রহী নয়। এই গ্রামের মানুষ এলাকাগত সংস্কৃতি এবং রীতি-নীতি পালনে অভ্যস্ত। অন্য এলাকার

রীতিনীতি এনারা গ্রহণ করতে পছন্দ করেন না। নিজেদের গ্রামে সাঁওতাল মানুষদের সাথে এনারা সাঁওতালি ভাষাতেই কথা বলেন অন্য কোন ভাষার ব্যবহার করেন না। কোন অনুষ্ঠানে বা পূজোতে মেয়েদের সাধারণত লালপাড় হলুদ শাড়ি এবং ছেলেদের পাঁচি বা পাঞ্চি ধুতি এবং সাদা গেঞ্জি পরার চল রয়েছে।

- **শিক্ষা :-** প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার সমস্যা প্রবল ভাবে এই গ্রামের সাঁওতাল শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করেছে। সাঁওতাল শিশুরা বাংলা মিডিয়ামের স্কুলে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলা শিক্ষকদের সাথে বা অন্যান্য অ- আদিবাসী বাচ্চার সাথে কথোপকথনের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বাধা। এই বাচ্চা গুলি যখন হাই স্কুলে যায় সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে তখন তারা বাংলা ভাষাটা কিছুটা রপ্ত করতে পারে। স্কুলে বা গ্রামে সাঁওতাল জাতির বাচ্চাদের সাথে অ-সাঁওতাল বাচ্চাদের খেলাধুলা করতে বা মিশতে দেওয়া হয় না। কারণ তারা মনে করে নিম্ন জাতির ছেলেমেয়েদের সাথে মেলামেশা করলে তাদের ছেলে মেয়েরাও খারাপ হয়ে যেতে পারে। এই গ্রামে চারজন স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এবং এদের মধ্যে দুজন মহিলা এবং দুজন পুরুষ। ২০ থেকে ২৫ জন ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় এবং গাইডেন্স এর অভাবে অচিরেই ছেলেমেয়েরা স্কুল ছুট হয়ে যায়। এই গ্রামে মেয়েদের বিয়ে ১৮ বছরের উর্ধ্বেই হয় সাধারণত, কিন্তু যারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে তাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১৮ বছরের নিম্নে বিবাহ হলেও যাতে তাদের সন্তান ১৮ বছরের আগে না হয় সেই দায়িত্ব মোড়লের ওপর আছে।

- **অর্থনীতি :-** সরকারি সাহায্য এনারা অনেকেই পাননি এবং সরকারের বিভিন্ন স্কিম সম্পর্কে এই গ্রামের মানুষদের কাছে তেমন কোন তথ্য নেই বা সেই সম্পর্কে জানতে তারা ততটা আগ্রহী নন। কারণ তারা শিক্ষিত না হওয়ার জন্য নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন। ইন্দিরা আবাস যোজনা এঁরা অনেকেই পেয়েছেন, রেশন ঠিকঠাক পান, বছরে একবার ধান চাষ এবং বাকি সময় সবজি চাষ করে থাকেন গ্রামের মানুষেরা। বর্ষাকালে এবং শীতকালে ততটা জলের অসুবিধা না থাকলেও গ্রীষ্মকালে জলের কষ্ট হয়। অনেক দূর থেকে তাঁরা পানীয় জল আনতে বাধ্য হন। শিক্ষিত না হওয়ার জন্য সবজি চাষিরা মহাজনের কাছে টাকা পয়সার ব্যাপারে ঠকে যান। জঙ্গল থেকে তাঁরা রান্নার কাঠ সংগ্রহ করেন এবং শালপাতা তুলে বিক্রি করে আয় করেন। জঙ্গলের বিভিন্ন পাতা, কাণ্ড ও মূল ঔষধি রূপে তাঁরা ব্যবহার করেন। জঙ্গল থেকে মধু, ফল এবং মাশরুম সংগ্রহ করেন খাওয়ার জন্য। জঙ্গলে শিকার করতে ততটা আগ্রহী নন।

❖ **গগনাশুলি:**

- **সংস্কৃতি:-** এই গ্রামের মানুষ সাঁওতালি ভাষায় সবাই কথা বলতে জানেন। বিধবা বা বয়স্করা গান করতে জানলেও নতুন প্রজন্মের মেয়েরা গান করতে জানে না। মেয়েরা সবাই চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ নাচতে জানে এবং চিরাচরিত সাংস্কৃতিক বাজনা বাজাতে সব ছেলেরাই জানে।
- **শিক্ষা:** - এই গ্রামে ভাষাগত কোন সমস্যা নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই গ্রামে কোন ড্রপ আউট নেই কমপক্ষে কলেজ পর্যন্ত সবাই পড়াশোনা করেছে এবং প্রায় সবাই চাকুরীরত অথবা কোনো কাজের সাথে যুক্ত।

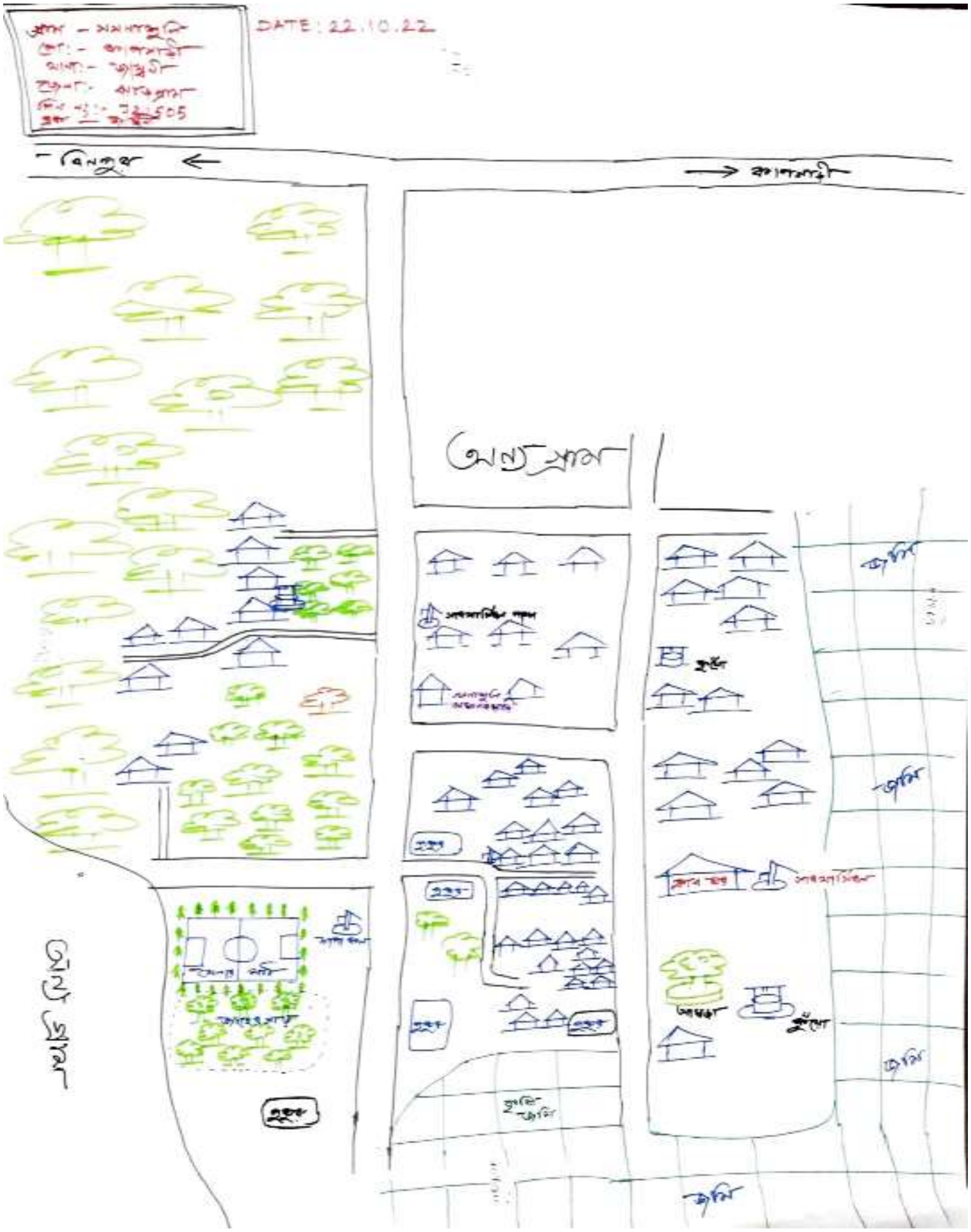

- **অর্থনীতি:** - কমবেশি সবাই চাকুরীরত এবং শিক্ষিত হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত। জঙ্গলের কাঠ সাধারণত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জঙ্গলের উপর সেরকম ভাবে নির্ভরশীল নয় কিন্তু জঙ্গলকে তারা রক্ষা করে থাকে। কয়েকজন গ্রামবাসী চাষবাসের উপর

নির্ভরশীল। সরকারি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তারা পায়। সরকারি স্কিম সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন।

❖ রাঙামাটিয়া:

- **সংস্কৃতি:**- বিধবা বা বয়স্করা চিরাচরিত সাঁওতালি গান জানে। যারা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে, পড়াশোনা করে, তারা চিরাচরিত সাংস্কৃতিক গান জানেনা। যারা স্কুল বা কলেজে পড়াশোনা করে না তারা চিরাচরিত সাংস্কৃতিক বাজনা বাজাতে পারে। কিন্তু যারা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে তারা চিরাচরিত সাংস্কৃতিক বাজনা বাজাতে পারেনা। গ্রামের প্রধান পুজো গুলোতে সবাই অংশগ্রহণ করে। গ্রামের মানুষ ডাইনি প্রথায় বিশ্বাস করে।
- **শিক্ষা:-** আর্থিক সমস্যার কারণে অনেক ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করতে পারেনি। পড়াশোনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অভিভাবকদের দূরদৃষ্টির অভাব, বেশিরভাগ ছেলেমেয়েদের ফেল করার জন্য স্কুলছুট হয়েছে, অল্প বয়সে বিয়ে করার কারণে পড়াশোনা হচ্ছে না বলে গ্রামের মানুষ জানিয়েছেন। হাই স্কুল দূরে এবং কলেজ দূরে হওয়ার জন্য পড়াশোনার ক্ষেত্রে অসুবিধা বা বাধা দেখা গিয়েছে। শুনশান জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার রাস্তা হওয়ার কারণে অনেক অভিভাবক তাদের মেয়েদেরকে স্কুল-কলেজে পাঠাতে চান না। যোগাযোগের ভালো ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবক এবং ছেলেমেয়েদের সচেতনতার অভাব। প্রাথমিক স্কুলের ক্ষেত্রে এই গ্রামের ছেলে মেয়েদের কিছু ভাষাগত সমস্যা দেখা যায়। তা

সত্ত্বেও এখানে মেয়েদের শিক্ষার হার ছেলেদের তুলনায় বেশি।

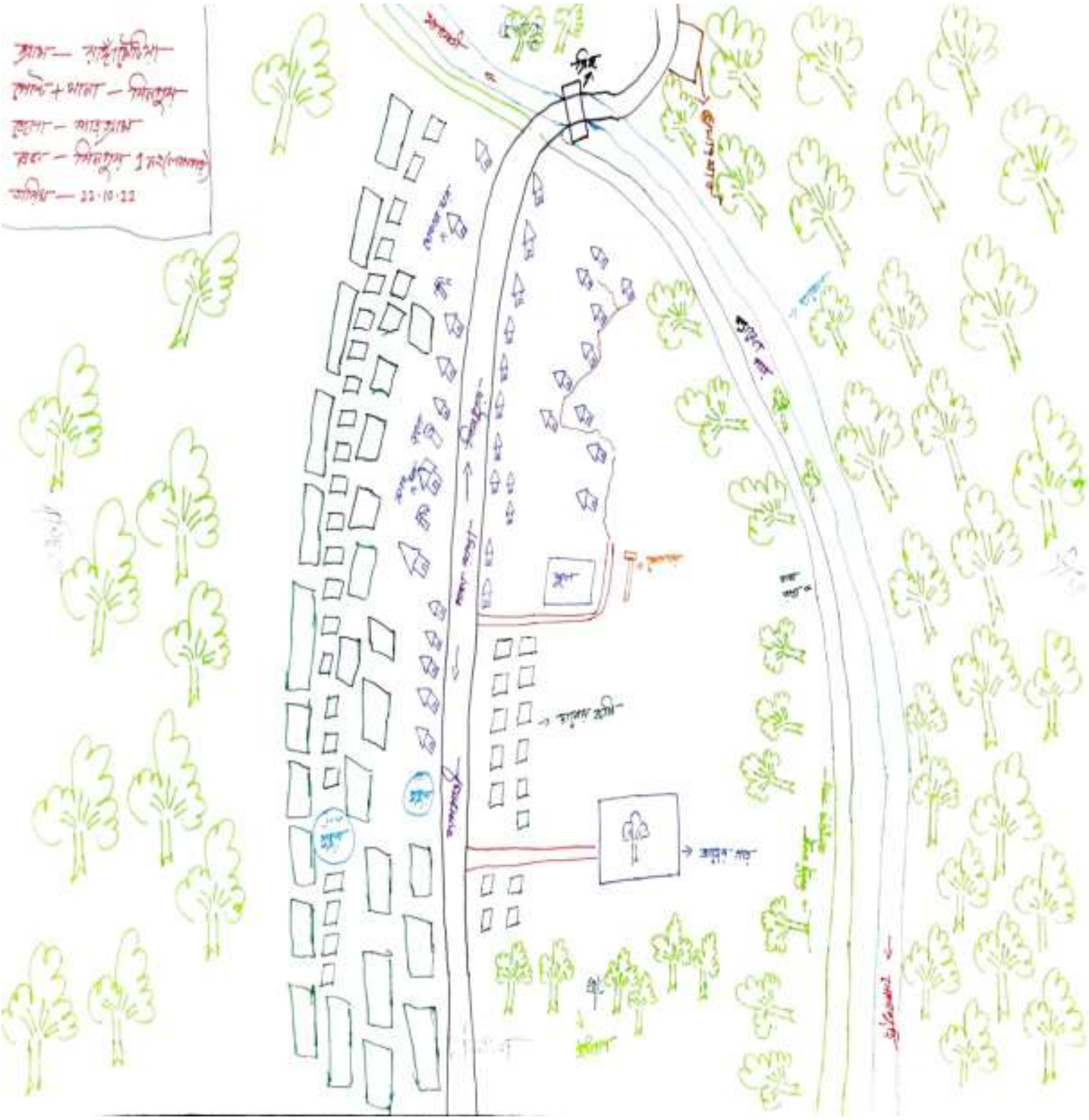

হাই স্কুলের শিক্ষকদের সাথে কম যোগাযোগের জন্য তাদের শিক্ষার অগ্রগতির হার কম দেখা যায়। এই গ্রামের ২৩ জন ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়ে। তিনজন চাকরি করেন একজন হাইস্কুলে, একজন বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মী এবং একজন নার্সিং এর কাজ করেন।

- **অর্থনীতি:** -এই গ্রামে বেশিরভাগ মানুষই সাধারণত দিনমজুরের কাজ করে থাকেন। আয়ের বিকল্প চিন্তা-ভাবনা এদের মধ্যে নেই। এনারা বন রক্ষা কমিটির সাথে যুক্ত আছেন। জঙ্গল থেকে ছাতু, মধু, কালমেঘ, লাল পিঁপড়ে, কেন্দু পাতা, কেঁদ ফল, খেজুর পাতা, খেজুর ফল, মহুল, বহেড়া, হরিতকি, কাজু ইত্যাদি তাঁরা সংগ্রহ করে থাকেন। গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের সমস্যা আছে। কিছু মানুষ ইন্দিরা আবাসের বাড়ি পেয়েছেন। সরকারি স্কিম সম্পর্কে এদের ধারণা নেই।

❖ গাডরা, লালগড়, ঝাড়গ্রাম:

- **সংস্কৃতি:** - সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য বছরে তিন থেকে চারবার গ্রামের মানুষ একসাথে বসে আলোচনা করেন, ফলে নতুন এবং পুরানো প্রজন্ম সবাই ধামসা মাদল বাজাতে পারে। পুরনো প্রজন্মের মহিলাদের সাথে নতুন প্রজন্মের মেয়ে এবং বিয়ে হয়ে আসা মহিলারাও গান করতে শিখছে। সাঁওতালি ভাষায় সবাই কথা বলতে পারে। ছেলেরা দূর-দূরান্তে পরব দেখতে যায়। পরব থেকে বিয়ে করে নিয়ে আসার ইতিহাস আছে এবং অনেকেই পালিয়ে বিয়ে করেছে। এই গ্রামে কোন অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহের ইতিহাস নেই। ট্রাডিশনাল পোশাক যেকোনো অনুষ্ঠানের সময় পরা হয়। অন্য সময় সবাই আধুনিক পোশাকেই অভ্যস্ত। যারা চাকরি করে তারা গ্রাম থেকে বাইরে বসবাস করলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তারা প্রত্যেকে উপস্থিত থাকে।
- **শিক্ষা:** - এই গ্রামে অলচিকি মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুল থাকলেও শিক্ষকরা সাঁওতাল নন। গ্রামের কিছু ছেলেমেয়েরা এই স্কুলেই পড়াশোনা করে। হাই স্কুলেও বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে অলচিকি

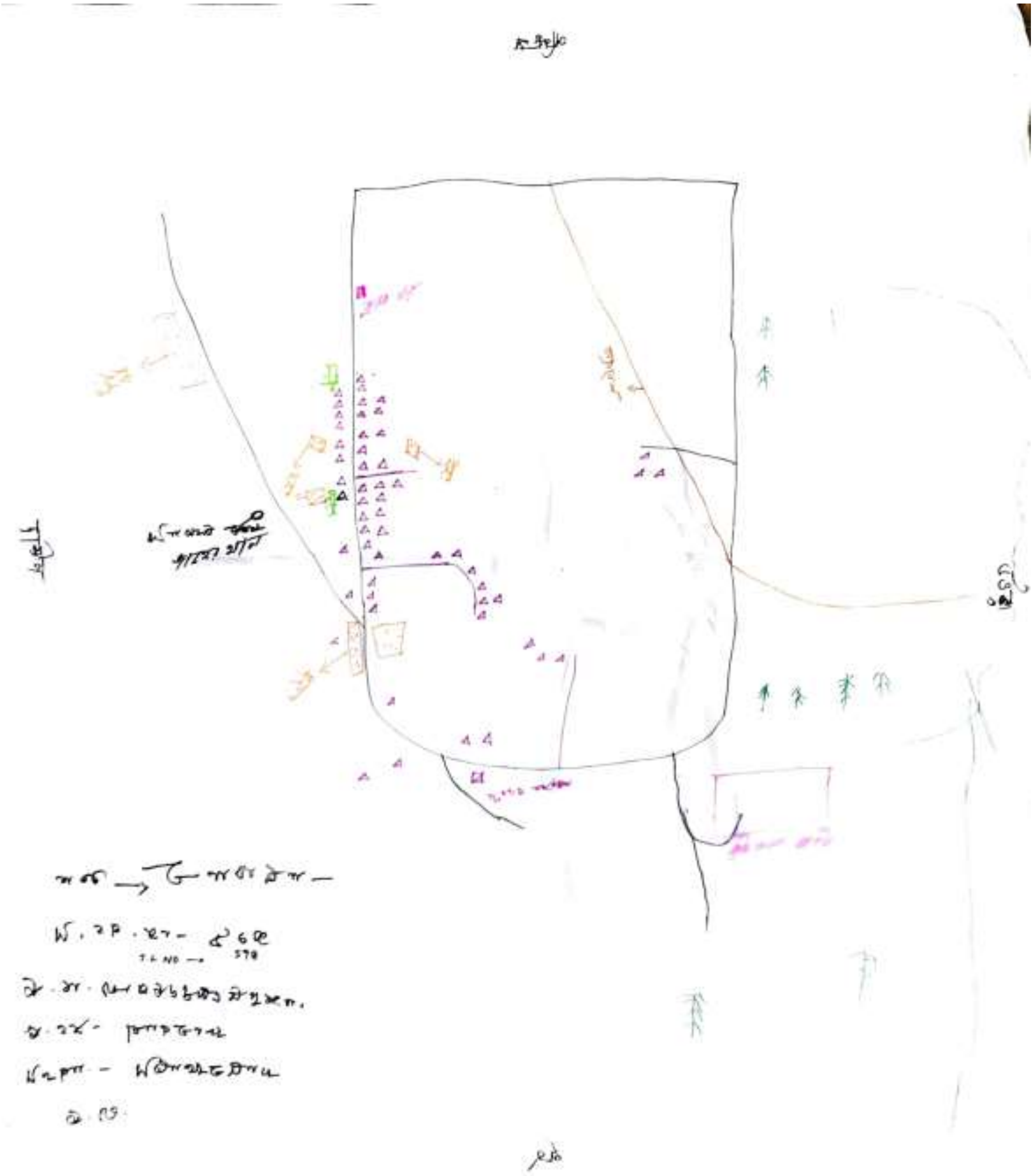

ভাষার মাধ্যমেই পড়াশোনা করে। পাঁচজন স্কুলছুট আছে যারা ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর আর পড়াশোনা করেনি। এবং স্কুল ছুট হওয়ার কারণ হিসেবে তাদের পিতা-মাতার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শনের অভাব কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই গ্রামের সাঁওতালিতে

স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন দুজন, B.Ed একজন এবং D.El.Ed দুজন করেছেন। হাই স্কুলে সাতজন পড়ে। বর্তমানে ছেলেদের থেকে মেয়েরা তুলনামূলক বেশি পড়াশোনা করছে।

- **অর্থনীতি:** - এই গ্রামে চারজন সরকারি চাকরি করে, তাদের মধ্যে একজন রেলওয়ে, একজন প্রাইমারি, একজন ভেটেনারি, একজন পুলিশে চাকরি করে। গ্রামের সবারই কমবেশি জমি আছে। যারা চাকরি করে তারা বাদে বাকিরা সবাই দিনমজুরের কাজ করে। জঙ্গল থেকে তারা জ্বালানি হিসেবে শাল কাঠ কেটে নিয়ে আসে, শালপাতা সংগ্রহ করে বিক্রি করে। জঙ্গলে কেন্দু গাছ, ছাতু, বাখর তৈরীর ওষুধের গাছ, কালমেঘ, খেজুর, শাল, মহুল প্রভৃতি গাছ পাওয়া যায়। খেজুর পাতা থেকে তারা চাটাই, ঝাঁটা প্রভৃতি তৈরি করে। বছরে একবার শিকারে যায় তারা খরগোশ, ইঁদুর, বনবিড়াল প্রভৃতি নিয়ে আসে। এই গ্রামে তুলনামূলক নেশাগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা অনেক কম, কারণ পূর্বে অনেকের বা নিজেদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কারণে তারা এখন অনেক সচেতন। বর্তমানে এই গ্রামের লক্ষ্য "হারিয়ে যেও না হারিয়ে দাও"।

❖ গোহালউড়া, গোপীবল্লভপুর (২):

- **সংস্কৃতি :-** চিরাচরিত সাংস্কৃতিক গান পুরানো প্রজন্মের সবাই করতে পারে, নতুন প্রজন্ম গান শিখতে চায়। ধামসা মাদল সবাই বাজাতে পারে, গ্রামের সব পুজো জাহের থানেই হয় এবং পুজোতে গ্রামের সবাই অংশগ্রহণ করে। পুজো বা অনুষ্ঠানের সময়ই সবাই নিজস্ব সংস্কৃতির পোষাক পরে। অন্যজাতির পুজোতে অংশগ্রহণ করে না। অ-আদিবাসী দের সাথে বিবাহ একটি হয়েছে, গ্রামের একটি ছেলে অন্যজাতির মেয়ে কে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে।

তবে বেশির ভাগ ছেলে মেয়েরাই অন্যজাতিতে বিবাহে আগ্রহী নয়। দূরের গ্রামে পরব হলে মহিলা পুরুষ যায়, পরব থেকে বিয়ে করে নিয়ে আসার ইতিহাস আছে। অনেকেই নিজেদের পছন্দের ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে এবং এক্ষেত্রে প্রায়শই কম বয়সে বিয়ে করার প্রবণতা দেখা যায়। অন্য রাজ্যের মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলেও এই গ্রামের সংস্কৃতি মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়না। গ্রামের সবাই নিজের জাতি নিয়ে গর্ব করে।

- **শিক্ষা :-** এই গ্রামের মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি, প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কিন্তু হাইস্কুল দূরে আছে। বাবা মা অশিক্ষিত এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না হওয়ার কারণে কিছু ছেলে মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ নেই। মাধ্যমিকে ১০ জন স্কুলছুট আছে। ছেলেরা পড়াশোনার থেকে বিভিন্ন জায়গায় ফুটবল, ঢালাইবল, মেলা, পরবে ঘুরতে বেশি আগ্রহী। পড়াশোনার ক্ষেত্রে ছেলেদের থেকে মেয়েরা বেশি আগ্রহী। অভিভাবকেরা বাড়ির কাজের জন্য ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চায় না। স্কুলে ভাষাগত এবং জাতি ভেদাভেদের কোন সমস্যা নেই। মিডডে মিল এবং কন্যাশ্রীর সমস্ত রকম সুবিধা পায় ছেলেমেয়েরা। গ্রামের একটি ছেলে সাঁওতালি ভাষায় গবেষণা করছে।
- **অর্থনীতি :-** একজন সেনাবাহিনীতে কাজ করে। তিনজন অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিজীবীর সবাই পুরুষ। কোন মহিলা চাকুরিজীবি নেই। সবারই নিজস্ব চাষের জমি আছে এবং একবার ধান চাষ হয়। গরমকালে জলের সমস্যা হয়, বর্তমানে সরকার প্রাপ্ত পাণীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে। সব পরিবারই রেশন পায়, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি অনেকেই পেয়েছে, সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে গ্রামের মানুষের ধারণা আছে এবং অঞ্চল বা বিডিও অফিসে যাতায়াত আছে।

গ্রামের মধ্যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই দিনমজুর। গ্রাম থেকে এক কিলোমিটার দূরে শাল গাছের জঙ্গল আছে। জঙ্গল থেকে তারা জ্বালানিকাঠ, পাতা, মাশরুম, শাক নিয়ে আসে বাড়িতে ব্যবহারের জন্য। বছরে একবার শিকার পরবের সময় তারা জঙ্গলে শিকার করতে যায়, এবং বনবিড়াল, খরগোশ, বনমোরগ, গোসাপ প্রভৃতি শিকার করে নিয়ে আসে। বন বাঁচাও কমিটি আছে জঙ্গল সবাই বাঁচাতে চায়।

❖ মাঠাসাই, গোপীবল্লভপুর-১:

- **সংস্কৃতি :-** পুরনো প্রজন্ম সবাই সাংস্কৃতিক গান করতে পারে, নতুন প্রজন্ম গান শেখার চেষ্টা করছে। মেয়েরা সবাই সাংস্কৃতিক নাচ করতে পারে। নতুন প্রজন্মের ছেলেরা ধামসা মাদল বাজাতে পারে না। তাদের মধ্যে ডিজে বক্স বাজিয়ে নাচার প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। নিজস্ব সংস্কৃতির পোশাক একমাত্র পুজোর সময় বা অনুষ্ঠানের সময় পরা হয়। এই গ্রামে অন্যজাতির ছেলেমেয়েদের সাথে কোন বিয়ে হয়নি। গ্রামের সব পুজো জাহের থানেই হয়। অন্য জাতের পুজোতে অংশগ্রহণ করা হয় এবং মেলামেশা হয় কিন্তু বিয়ে হয় না। বিয়ে হলে একঘরে করার নিয়ম আছে। গ্রামে ১৮ বছরের পরে সবার বিয়ে হয়। ছেলেমেয়েরা পরব দেখতে যায় এবং পরবে গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসার রীতি আছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেরা নেশাগ্রস্ত। অন্য রাজ্য থেকে বিয়ে হয়ে এলেও মানিয়ে নিতে সমস্যা হয় না।

- **শিক্ষা :-** এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি ও প্রাথমিক স্কুল আছে। হাইস্কুল দূরে হলেও যাতায়াতের কোনো অসুবিধা নেই। আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে ১০ থেকে ১২ জন স্কুল ছুট আছে। পাঁচজন ছেলে মেয়ে কলেজ পাশ করে গেছে এবং বর্তমানে পাঁচজন ছেলে মেয়ে কলেজে পড়াশোনা করছে। মিড ডে মিল, কন্যাশ্রীর সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা ছেলে মেয়েরা পায়। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে সবারই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ আছে তবে ছেলেরা

পড়াশোনার থেকে খেলাধূলায় বেশি আগ্রহী। কোন ছেলে মেয়ে যদি স্কুলে না যায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাড়িতে এসে বাচ্চাদের খোঁজখবর নেন এবং স্কুলে নিয়ে যান। স্কুলে ভাষাগত এবং জাতিগত বৈষম্যের কোন সমস্যা নেই। এই গ্রামে অলচিকি স্কুল নেই।

- **অর্থনীতি:** - গ্রামে নিজস্ব পাকা বাড়ি আছে তিনটি। চারজন চাকরি করে। চাষের জমি সবারই আছে এবং পরিমাণে অনেক বেশি। চাষের জলের অভাবের জন্য একবারই চাষ হয়। গ্রামের সবাই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছে এবং সরকারি জলের সুবিধা আছে। গ্রামের সবাই নিজের চাষের জমিতে চাষ করলেও দিনমজুর হিসাবে অন্য জেলায় বা রাজ্যে কাজ করতে যায়। সরকারী সমস্ত প্রকল্পেরই সুবিধা পায় গ্রামের মানুষ। গ্রামের প্রধান সাঁওতাল উপজাতিরই অন্তর্ভুক্ত।

❖ কুড়চিবনী (নয়াগ্রাম):

- **সংস্কৃতি:** – নতুন প্রজন্মের সবাই বাজনা বাজাতে জানেনা এবং শেখার চেষ্টাও নেই। ডিজে ব্যবহার হয় না। পরবে গিয়ে বিয়ে করার চল আছে। পুজোতে বা অনুষ্ঠানে নিজস্ব সংস্কৃতির পোষাক পরে। অন্যজাতির পুজোতে অংশগ্রহণ করে। জাতিভেদ প্রথা নেই। কম বয়সে এবং অন্য জাতিতে বিয়ে করে না।

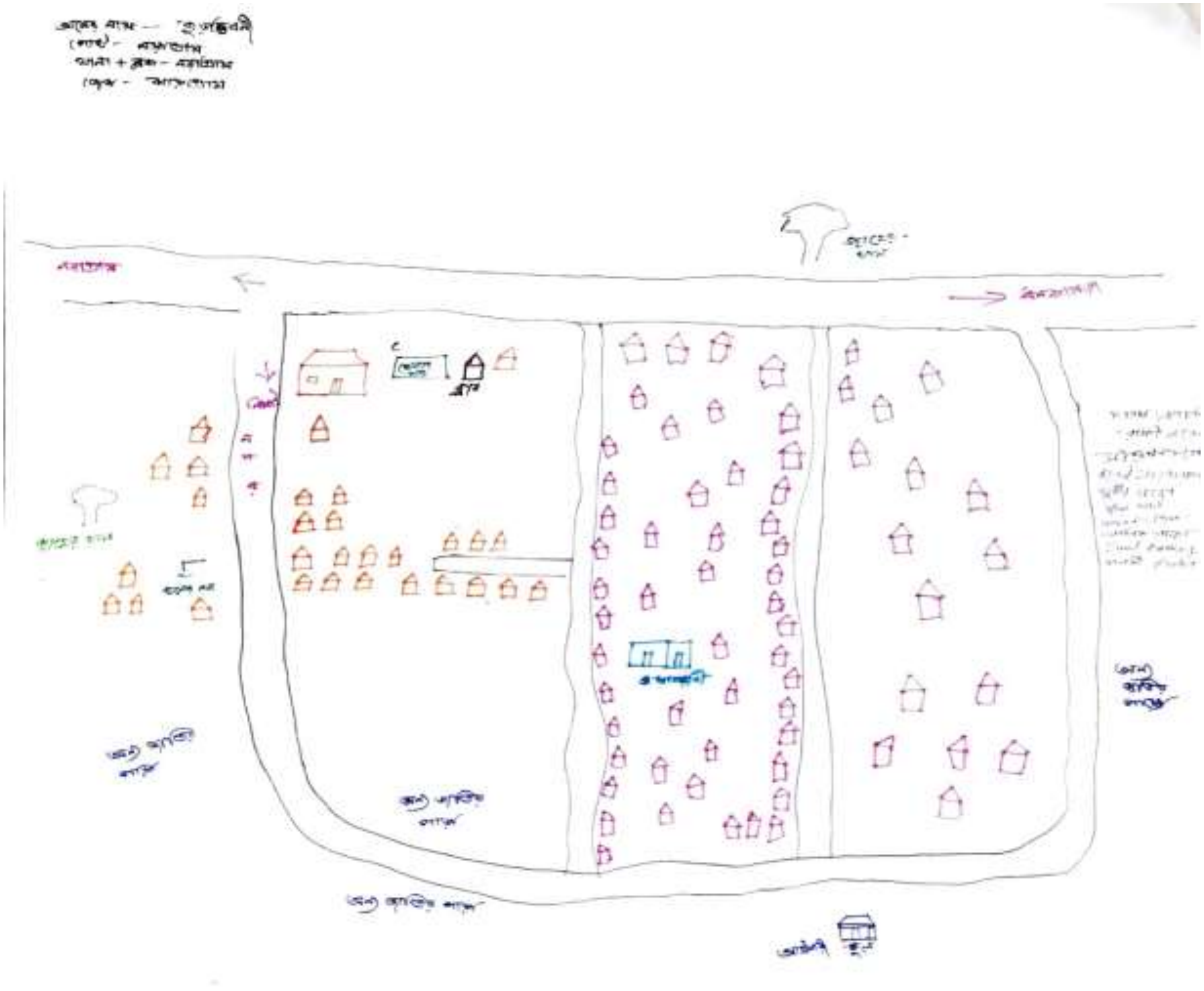

- **শিক্ষা:** – ছেলেমেয়ে সবাই স্কুলে যায়। ২ জন মেয়ে একজন ছেলে কলেজ পাশ করেছে। ৩ জন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। অঙ্গণ ওয়াড়িতে মিডডে মিল বন্ধ থাকে মাঝে মাঝে।
- **অর্থনীতি:** – সরকার থেকে ৩০ টি বাড়ি ও বাথরুম পেয়েছে। সবার চাষের জমি নেই, ২ বার ধান চাষ হয়। দিনমজুরের সংখ্যা বেশি। সিভিক পুলিশ মিলিয়ে চারজন চাকরি করে। সরকারি নলকূপ থাকলেও তাতে খাবারের জলের সমস্যা মেটেনি। অনেকেই জঙ্গলে পাতা তুলতে যায়, জ্বালানি নিয়ে আসে। অনেকেরই পাতা বিক্রি করে সংসার চলে। শাল, মহুল,

কেঁদ, বহেড়া গাছ পাওয়া যায়। জঙ্গলে ইঁদুর, কাঠবেড়ালি,খরগোস,বনবিড়াল আছে। বছরে একবার শিকার পরবের সময় জঙ্গলে শিকার করতে যায়।

৫.২ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জন্মকালীন আচার-অনুষ্ঠান:

- **হয় রুয়ৌড়: -** সাঁওতাল সম্প্রদায়ে একটি বাচ্চা জন্ম নিলে ‘হয়রুয়ৌড়’ এবং ‘ছৌটয়ৌড়’ করার প্রচলন আছে। এই হয়রুয়ৌড় কাজটি বাচ্চা জন্ম নেওয়ার ৯ দিনের মাথায় করতে হয় আর ছৌটয়ৌড় কাজটি বাচ্চা হাঁটতে শেখার সময় করতে হয়। অনেকে এই কাজটি অনেক দিন পরেও করে থাকেন। বা ছোটবেলায় না করা হলে বিয়ের সময় করা হয়। তবে কোন বাচ্চা যদি হয়রুয়ৌড়, ছৌটয়ৌড় হওয়ার আগে মারা যায় তাহলে তার শ্রাদ্ধ করা হয় না। তার মৃতদেহ পুড়িয়ে সৎকার করা হয় না। তাকে কবর দেয়া হয় এবং কবর এর উপরে কাঁটা বিছিয়ে রাখা হয়।

- **হয়রুয়ৌড় এর কাজ: -** সাঁওতাল সমাজের যে কোন কাজ ধৌয় বুডহি (ধোপা বুড়ি) ছাড়া হয় না। ধৌয় বুডহি এবং গ্রামের লোকের উপস্থিতিতে বাচ্চার নামকরণ করা হয়। এই নামকরণের সময় দাদু, ঠাকুমা, পিসি, পিসেমশাই, জেঠু, জেঠিমা, মামা বাড়ির পক্ষের সমস্ত আত্মীয় স্বজন উপস্থিত থেকে নামকরণ করা হয়। এককথায় একে 'হয় রুয়ৌড়' না বলে 'হহ রুয়ৌড়' বলা যায়।

দাই বুড়ি তিনটি শালপাতার বাটির এক একটিতে করে গোটা হলুদ, সর্ষের তেল এবং বাটা হলুদ আর বাচ্চার মাথার সামনে যে তিরের ফলা রাখা ছিল সেটা নিয়ে স্নানের ঘাটে যায়।

তীরের ফলায় বাঁধা সুতোর এক পাট জলে ভাসিয়ে দেয় ও অন্য পাটে হলুদ বাটা মাখিয়ে দেয় এবং তীরের ফলাটিকে ধুয়ে নেয়, তারপর সব মহিলারা স্নান করে বাড়িতে ফেরে। ওইদিন নাপিত এসে শালপাতার বাটির মতো বানিয়ে একটাতে হলুদ, একটাতে শুধু জল, আর একটা খালি রাখে। জল দেওয়া শালপাতার বাটিতে তার ক্ষুর ভিজিয়ে বাচ্চার মাথায় তিন জায়গার চুল কাটে এবং চুল গুলি খালি শালপাতার বাটিতে রাখে। বাচ্চার মাথার যে জায়গার চুল কাটা হয় সেখানে হলুদ মাখিয়ে দেয়, পরে নাপিত সব শালপাতার বাটি গুলি গুছিয়ে পুকুরের ঘাটে গিয়ে ভাসিয়ে দেয় এবং স্নান করে। তার সাথে যে সমস্ত পুরুষ মানুষ যায় সবাই স্নান করে বাড়ি ফিরে আসে।

এরপর শুরু হয় বাড়ির কাজ। বাড়িতে যে তীরের ফলাটাকে ধুয়ে নিয়ে আসা হয় তাতে হলুদ এবং আতপ চাল বাটার মিশ্রন মাখানো হয় এবং বাকি মিশ্রণকে বাড়ি চারপাশে, বাড়ির ভেতরে ছড়িয়ে দেয় এবং তীরের ফলায় যে সুতোতে হলুদ মাখানো ছিল সেটা খুলে বাচ্চার কোমরে ঘুমষির মতো করে বেঁধে দেয় এবং বাচ্চাকে আতনা পাতায় কোলে করে বাইরে নিয়ে আসে এবং বাচ্চাকে যার নাম দেওয়া হয়েছে তার কোলে দিয়ে দেয়। সেই সময় ধাই বুড়ি বা দাইমা গান করেন-

সেরেঙ্গ

তাহাঁ রেঁতা নানা তারনা

তাহাঁ রেঁতা নানা জে হো,

তেহেঞ বাবা নুই গিদরৈ

আতনা সাকাম রে আতাং কাতে,

জাতৌ বাবা গো জাতি এমায় কান ।

জাতৌ বাবা গো জাতি খেরওয়াল

জাতৌ বাবা গো জাতি লে লেগেৎ

বাচ্চাকে যার হাতে দেওয়া হলো তার নাম জিজ্ঞেস করে বাচ্চাকে ফেরত নিয়ে দাইমা সবার কাছে বাচ্চার নাম প্রকাশ করে এবং বাচ্চাকে মায়ের কাছে ফেরত দিয়ে দেয়। এই সময় বাচ্চার মা দুয়ারের ভেতরে থাকে এবং দায়ীমা বাইরে। এরপর দাইমা এক জামবাটি গোবর জল ঘরের চালের উপর ছুড়ে দেয় এবং মাকে বলে বাচ্চাকে নিয়ে তিনবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে আবার ঘরে ঢোকার জন্য। ওই সময় উপর থেকে ঝরে পড়া জল যদি বাচ্চার গায়ে পড়ে তাহলে অনেক শুভ হয়।

এরপর নিম ভাতের পূজো হয়। আতপ চাল সিদ্ধ করে তাতে নিমপাতা ভাজা গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিমভাত বানানো হয়। আদিবাসী বা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের নিমভাত পুজো করতেই হয়। তাঁরা মনে করেন যে খেরওয়াল জাতি বা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের এই নিমভাত পুজো মারাং বুরু শুরু করে গেছেন। তাই বলা হয়-

সেরেঞ

মারাং বুরুয় তেয়ার কেৎ

খেরওয়াল ধরম নেমাচার,

ওনা রেগে খেরওয়াল কবন সেতোঃ আকানা।।

সাঁ কা মোহে খেরওয়াল

আগিল রেনা: আচার বেওহার,

সুতু: কা: মেহো খেরওয়াল

পহিলা: নেয়াম নেমাচার।

জানাম রেদ এহো খেরওয়াল

নিম দা: মৌডি গ..........

গুজু রেদ এহো খেরওয়াল তাং বডচ্ হান্ডি।।

গুজ: বুর: রে আম দহো খেরওয়াল

সিম বুসৌ: বেগর, অকয় হুঁ– ব্যাং এ্য সাঁও আম।।

নিমভাত রান্না হয়ে গেলে শিশুর পিতা সেটিকে উঠোনে নিয়ে আসেন। সেখানে তিনটি শালপাতার বাটিতে নিমভাত বেড়ে উঠোনের মাঝে লাতা দিয়ে নিমভাত লাতার উপরে রেখে মারাং বুরুর নামে পূজা করেন। সেই সময় মন্ত্র হিসাবে বলেন –

বাঁখেড়

জহার গঁসাই মারাং বুরু

মা এনখান ন: অয় নওয়া ধীরতি রে

নাওয়া হড়ে হেচ্ আকানা অনাতে,

উনিয়া: নারতা কৌমি ঞুতুমতে নিম দাঃ মৌড়ি লে

এম আম কান–চাল আম কানা গঁসাই।

চাচো ক: ডিডি ক: মায় গঁসাই।

জমরে ঞুরে লাজ হাসো বহ: হাসো ক –

আলম সিরজৌও হচয়া গঁসাই

নায় বাড়ে নাপায় বাড়ে গঁসাই।

এই ভাবেই পিলচু হাড়াম, পিলচু বুডহির নামেও একইভাবে একইরকম মন্ত্র বলে পুজো করা হয় এবং শালপাতার বাটির জল যেখানে পূজা হয়েছে তার চারপাশে ছড়িয়ে দিয়ে প্রণাম করে। শালপাতায় যে নিমভাত বেঁচে থাকে সেটা একটু বাচ্চা এবং বাচ্চার মাকে খাওয়ানো হয়। আর বাকি যে নিমভাত থাকে তা গ্রামের সবাইকে এবং আত্মীয় যারা থাকে তাদেরকে বিলিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর বাড়িতে ছৌটয়ৌড় কাজের জন্য রাখা হাঁড়িয়ার হাড়ি থেকে এক হাড়ি হাঁড়িয়ার রস গড়িয়ে নিয়ে দাইমাকে দেওয়া হয়। তিনি এটি মারাং বুরুর নামে পুজো করেন এবং ওই হাঁড়িয়ার হাঁড়ির বাকি অংশ মশারির মত কোন জালে চেলে নিয়ে মাড় বের করে তা পুজো করেন পিলচু হাড়াম এবং পিলচু বুডহির নামে। তখন মন্ত্র বলা হয়-

বাঁখেড়

জহার গঁসাই মারাং বুরু

মা এনখান হ-য় রুওয়ৌড় ঞুতুম তে

ঝার দা: তাপান দা: লে

এম আম কান চাল আম কান গঁসাই

নিয়ৌগে চেরেচ কা: চেপেজ কা: মে গঁসাই।

- **বুকো তপা:-** ছোট বাচ্চার নাভি শুকিয়ে গেলে সেটা যতদিন না পড়ে যায় ততদিন তার মা কে সেটার খেয়াল রাখতে হয়। কারন এই শুকনো নাভী বেখেয়ালে কোথাও পড়ে গেলে অশুভ বলে মনে করা হয়। সেই জন্য নাভিটি শুকনো হয়ে পড়ে গেলে সেটাকে কাপড় সেলাই করার সূচ দিয়ে বারবার ফুটো করে দুয়ারের ভেতর খুলে রাখা গর্তের ভেতরে রেখে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর দুয়ারের ভেতর জামবাটির মধ্যে রাখা জল শালপাতার বাটিতে করে নিয়ে ডানহাত দিয়ে চোখ চাপা দিয়ে বাম হাতে করে বাইরের দিকে ছুঁড়ে ফেলতে হয়।
- **ছৌটয়ৌড়:-** সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাচ্চারা হাঁটতে পারলে নাম অনুযায়ী এই অনুষ্ঠান করা হয়। কেউ কেউ অনেক দেরিতেও করে থাকেন। কোন বাচ্চার এই অনুষ্ঠান না হলে বংশের পুজোর কাজে লাগে না। এই কাজ হওয়ার পূর্বে কোন বাচ্চা মারা গেলে তার শ্রাদ্ধের কাজ হয় না।

- **ছৌটয়ৌড় কাজটি করার নিয়ম: -** যেদিন এই কাজ হবে সেদিন গ্রামের সবাইকে ডাকা হয়। নায়কে কে ঐদিন উপস্থিত থাকতেই হয়। কারণ ওই দিনের সব উপাচার নায়কের হাত দিয়েই হয়। নায়কে বাচ্চার বাড়ির উঠোনের মাঝে গোবর দিয়ে লাতা দিয়ে পুজো করতে বসেন। প্রথমে হাঁড়িয়ার হাঁড়ি থেকে গড়ানো রস একটি অবিবাহিত ছেলে নায়কের হাতে রাখা

শালপাতার বাটির মধ্যে ঢেলে দেয়। এবং সেটা মাটিতে ঢেলে মারাংবুরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। সেই সময় উপস্থিত পুরুষরা মিলে একটি মন্ত্র বলেন। সেই মন্ত্র বলা হয়ে গেলে শালপাতার বাটি নিচে রেখে আবার দুটো শালপাতা হাতে নিয়ে ডান হাত বাম দিকে এবং বাম হাত ডান দিকে করে ক্রশ চিহ্নের মতো করে বসেন এবং দুজন অবিবাহিত ছেলে তাতে হাঁড়িয়া ঢেলে দেয়। এই সময় সবাই মিলে মারা যাওয়া পূর্বপুরুষ পুরুষদের নাম করে মন্ত্র বলেন-

জহার গঁসাই গচ আকান সুচ আকানপে আগিল পুরুধুলু – ক –

ন: অয় ছৌটয়ৌর ঞুতুমতে বড়চ হৌঁডিলে –

এম আপে কান চাল আপে কান্ গঁসাই,

সুখতে সাঁওয়ারতে আতাং কা তেল কাঃ গঁসাই,

নায় বাড়ে– নাপায় বাড়ে গঁসাই।

মা এনখান সানাম কগে কুশিতে কুশৌলতে

চেরেচ হৌটিঞ চেপেচ হৌটিঞ কাঃপে গঁসাই।

নুই গিদরৈ ঠেন তেহেঞ খন তিসহ লাচহাসো বহ: হাসো,

আ– ল বাড়ে পে সিজাও হচয়, ভিড়ৌও হ– চয়া গঁসাই,

রুত পৌড়ু হেঁসেল পৌড়ু লেকা –

হারাড়ো বুরৌড়ো ক: মায় গঁসাই–

নায় বাড়ে – নাপায় বাড়ে গঁসাই–।

মন্ত্র বলা হয়ে গেলে সেই অবিবাহিত ছেলেরা নায়কের হাত থেকে শালপাতার বাটিগুলো নামিয়ে রেখে নতুন শালপাতার বাটি হাতে তুলে দেয় এবং তাতে দুজনে দুহাতে জল ভর্তি করে দেয়। সেই সময় সূর্য চন্দ্রের নামে মন্ত্র বলা হয়-

"জহার গঁসায় তিকিন সিঞ, লাওয়ের সিঞ।

নওয়া ছৌটয়োড় ঞুতুমতে সুচ দাঃ, ডাডি দাঃ লে এম আবিন কান, চাল আবিন কান গঁসায়। সুখ সাঁওয়ার তে আতাং কাঃ, তেলা কাঃ গঁসায়। নায় বাড়ে, নাপায় বাড়ে গঁসায়। নাওয়া সাকাম আউরি হাওয়েদঃ হাওয়েদঃ তেগে আরহঁ বাড়ে কলে কঃ, বালে কঃ মা গঁসায়।

নায় বাড়ে নাপায় বাড়ে গঁসায়"।

মন্ত্র শেষ হয়ে গেলে নায়কে সেই শালপাতার বাটি দুটি সামনের দিকে ঢেলে পাতা দুটি উল্টে দেন। এগুলো হয়ে গেলে পুকুরে জল দিয়ে তিনবার ডান দিক থেকে বাম দিক ঘুরিয়ে প্রণাম করেন। এ সময় যে দুটো হাঁড়িয়ার হাঁড়ি ব্যবহার করা হয়েছে সেটা সবাইকে খেতে দেওয়া হয়। এ সময় অনেক বাড়িতে ছৌটয়ৌড় বিন্তি করা হয়। যেখানে পৃথিবী সৃষ্টি থেকে মানুষের জন্ম হওয়া অব্দি কথাগুলো বলা হয়। এগুলো বলে থাকেন বিন্তি গুরুরা।

- **মগরা সিনৌন:-** যে সমস্ত বাচ্চার জড় চাঁদোতে দাঁত বের হয় সেইসব বাচ্চার বাধা কাটানোর জন্য এই নিয়ম পালন করা হয়। যে বাচ্চার জড় চাঁদোতে দাঁত বেরোয় তাকে নিয়ে গডেত গ্রামের লোক এবং মামা, মামি অথবা পিসি, পিষেমশাই মেয়ে হলে কোলে এবং ছেলে হলে কাঁধে চড়িয়ে ধামসা মাদল বাজিয়ে বাড়ির সামনে যে মগরা পোল আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে বাচ্চার মামা-মামী, পিসি পিষেমশাইয়ের যেকোনো একজন জল ঢালে মগরা পোলের

একদিকে। অন্যদিকে যে জলটা গড়িয়ে পড়ে সেদিকে একজন সেই গড়ানো জলে বাচ্চাকে স্নান করিয়ে নেয়। স্নান হয়ে গেলে বাচ্চাকে নতুন জামা পরিয়ে কোলে বা কাঁধে করে নিয়ে আসা হয়। এরপর বাড়ি পৌঁছে সবার গায়ে জল ছিটিয়ে বাড়িতে ঢুকানো হয়। এই সময় যা কিছু বাজনা বা গান হবে, সেগুলো বিয়ে বাড়িতে যে নাচ হয় তা ছাড়া অন্য কোন কিছু হবে না। এই কাজের জন্য মামা-মামী, পিসি পিসেমশাই কে নতুন জামা কাপড় দিতে হয় এবং গ্রামের মানুষের জন্য দুই হাড়ি হাঁড়িয়া দিতে হয়। মেয়ে পক্ষকে এক হাড়ি এবং ছেলে পক্ষকে এক হাঁড়ি।

- **সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাচ্চাদের উপর পাটির দাঁত আগে বেরোলে বাধা কাটানোর নিয়ম: -**

যে সমস্ত ছেলে বা মেয়েদের উপরের পাটির দাঁত আগে বেরোয়, সেই দাঁতকে বলা হয় কুকুরের দাঁত। এই বাধা কাটানোর জন্য বাচ্চাদের কুকুর বা শাবড়াগাছের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের জন্য একটি ছেলে/মেয়ে কুকুর বা শাবড়াগাছ লাগে। এই কুকুরকে ধরে নিয়ে আসা হয় নাহলে পাড়ার মধ্যে কোন শাবড়া গাছকে চিহ্নিত করা হয়। বিয়ের দিন উভয়কে হলুদ তেল মাখিয়ে সামনাসামনি বসানো হয়। নায়কে শালপাতায় সিঁদুর রেখে মাটিতে টিপ দেন। এরপর মাঝি কুকুরটির পায়ে সিঁদুর লাগিয়ে মেয়ের কপালে দেওয়ায় এবং ছেলে হলে তার হাতে সিঁদুর দিয়ে মেয়ে কুকুরের পায়ে বা কপালে ঘষে দেওয়ায়।

আর যদি শাবড়া গাছের সাথে কোন মেয়ের বিয়ে হয় তাহলে মেয়েকে কোলে করে গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রথমে গাছের তলায় মারাংবুরু, জাহের আয়োর নামে পুজো করা হয়। তারপর গাছের ডালের সিঁদুর ঘষে মেয়ের কপাল সেখানে ঘষে দেওয়া হয়। আর ছেলে হলে

তার হাতে সিঁদুর দিয়ে গাছের ডালে লাগিয়ে দিতে হয়। এইভাবে বিয়ে সম্পন্ন হলে বাধা কেটে যায় বলে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের ধারণা।

৫.৩ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিবাহ:

❖ **বাপলা:** হিন্দুদের ন্যায় সাঁওতাল সম্প্রদায়েও বিবাহ একটি অত্যন্ত পবিত্র সামাজিক প্রথা। প্রাচীনকাল থেকেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ে বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে বিবাহ বিচ্ছিন্ন/বিচ্ছিন্না হলে কিংবা স্ত্রী/স্বামী মারা গেলেও তার বিবাহের ক্ষেত্রে কোন বাধা বলে স্বীকার করা হয় না। এইখানেই হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ থেকে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিবাহের একটি অন্যতম পার্থক্য। হিন্দুদের ন্যায় সাঁওতালদের বিবাহেও পণপ্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দুরা প্রাচীনকালে বরপক্ষ পণ দিয়ে কনেকে নিয়ে যেত যদিও বর্তমানকালে কনে পক্ষকে বর কে/বরপক্ষ কে পণ দিতে হয়। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে বরপক্ষই কনেপক্ষকে পণ দেয়। যেহেতু মা-বাবা এবং পরিবার তাদের মেয়েকে জন্ম দিয়েছেন, লালন পালন করেছেন, বড় করেছেন, এবং বরের বাড়ি গিয়েও তাকে তার বরের পরিবারের দায়িত্ব, ছেলে মেয়ের লালন পালন করা সবকিছুই নিজের হাতে করতে হবে সেজন্য পাত্রকে বিয়ের পর কনে পক্ষের হাতে নির্দিষ্ট পণ দিতে সমাজ বাধ্য করে। এখানে পণ হিসাবে নগদ সাড়ে বারো টাকা, একটি বকনা (স্ত্রী) বাছুর এবং একটি এঁড়ে (পুরুষ) বাছুর, একটি ছাগল, মেয়ের পরিবারের মহিলা যারা মেয়েকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন তাদের জন্য শাড়ি (খাঁড়া গেঁদাঃ) দিতে হয়। আর কনে'র বাবা-মা তাদের সামর্থ্য এবং আগ্রহ অনুসারে মেয়ে জামাইকে সোনা, রুপো, পেতল, কাঁসার থালা বাটি

ও অন্যান্য বাসনপত্র এবং নিত্য ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন জিনিসপত্র দিলেও তা বিয়ের পূর্বে বা বিয়ের কিছুদিন পরে বরের বাড়িতে দিয়ে আসতে পারেন। সেগুলো তিনি গ্রামের মানুষের পাঁচজনের সামনে দান সামগ্রী রূপে দিতে পারেন না। সাঁওতাল সমাজে বিভিন্ন প্রকার বিবাহের প্রথা প্রচলিত। এদের মধ্যে এখনও বহুল প্রচলিত বিবাহ প্রথা হল ইতুৎ সিঁদুর। নিম্নে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিবাহ প্রথাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল-

- **ইতুৎ সিঁদুর বাপলা:-** বিয়ের জন্য বরপক্ষ একজন মধ্যস্থ (রায়বার) দ্বারা মেয়ের বাড়িতে খবর পাঠান। মধ্যস্থ মেয়ের বাবা-মার কাছে জানতে চান তাদের বিয়ের যোগ্য কোন মেয়ে আছে কিনা এবং বিয়ে দিতে চান কিনা। মেয়ের বাবা মা রাজি হলে মধ্যস্থ মেয়ের বাড়িতে ছেলেকে এবং ছেলের বাড়ির কয়েকজন অভিভাবককে সঙ্গে এনে কনে দেখানোর ব্যবস্থা করেন। বরপক্ষের মেয়েকে পছন্দ হলে এবং কনে পক্ষের বরকে পছন্দ করলে উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিয়ের কথাবার্তা এগিয়ে নিয়ে যান। বিয়ের কথা স্থির হলে সাগুন পাঁজা অর্থাৎ হিন্দুদের কুষ্টি বিচারের মতো উভয়ের সম্পর্ক কেমন হবে এবং ছেলে ও মেয়ের শুভ লক্ষণগুলি খুঁজে দেখা হয়। সাগুন পাঁজায় কোন বাধা না থাকলে উভয় পরিবার থেকে খাওয়া-দাওয়ার দিন ধার্য করা হয়। খাওয়া দাওয়ার সূচনা হয় কনের বাড়িতে। নির্ধারিত দিনে বরকর্তা তাদের গ্রামের মাঝি এবং গ্রামের আরো কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে কনের বাড়িতে আসেন। গ্রামে ঢোকার মুখে কনে পক্ষের গ্রামের মোড়ল জগমাঝি এবং আরো কয়েকজন গ্রামবাসী পূর্ব থেকেই গ্রামে ঢোকার মুখে কলসী ভর্তি জল, একটি ঘটি এবং পিঁড়ি নিয়ে অপেক্ষা করেন। এখানে তারা প্রথমে বর পক্ষের মোড়ল বা মাঝি এবং পরে জগমাঝি বা তার সহকারী এবং অন্যান্য আগন্তুক

অতিথিদের পা ধুইয়ে দেন।এরপর কনের বাড়িতে এনে বসতে দেন। পরিবারের এবং গ্রামের মেয়ে, বউরা পূর্ব থেকেই ঘটিভর্তি জল নিয়ে প্রস্তুত থাকেন। তারা উভয় পক্ষের মাঝি বা মোড়লের সামনে জলের ঘটি নামিয়ে সাঁওতাল প্রথায় 'গড জহার' অর্থাৎ নমস্কার জানায়। নমস্কার শেষ হলে শালকাঠির দাঁতন, মাথায় এবং গায়ে মাখার তেল,গামছা নিয়ে পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয় বর পক্ষের অতিথি দের। স্নান করা হলে বরপক্ষের অতিথিদের আবার কনের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এখন কনের পক্ষের জগমাঝি হাত ধোয়ার জল নিয়ে এসে অতিথিদের হাত ধোয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। হাত ধোয়ার পর বরপক্ষের লোকেদের কনের বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে খেজুরের পাতা দিয়ে তৈরি চাটার ওপর বসতে বলা হয়। উতি জিদের সঙ্গে কনের বাড়ির মোড়ল বা মাঝি, জগমাঝি বা সহকারী এবং অন্যান্যরা থাকেন। এরপর অতিথিদের সবাইকে শাল পাতার তৈরি পাতড়াঃ এবং ফুডুঃ দেওয়া হয়। জঙ্গল থেকে মেয়েরা শালপাতা সংগ্রহ করে এনে ওই পাতড়াঃ বা ফুডুঃ তৈরি করেন। এবার অতিথিদের জলখাবারের জন্য চিড়ে বা মুড়ি এবং গুড় বা মিষ্টি দেওয়া হয়। বর্তমানে এসব খাবারের পরিবর্তে অন্যান্য খাবার দেওয়া হয়। জলখাবারের পর পানীয় জল হিসেবে মিৎ বার ফুডুঃ হাঁড়িয়া দেওয়া হয়। জল খাবার খাওয়ার পর দুই পক্ষের মোড়লের সক্রিয় অংশগ্রহণে দেনা পাওনার বিষয় আলোচনা হয়। দেনা পাওনার আলোচনায় বরপক্ষ বা কনে পক্ষের মা বাবারা সরাসরি অংশগ্রহণ করেন না। এই আলোচনা চালানোর সময় শাল পাতার ফুডুঃ অর্থাৎ বাটি ব্যবহার করা হয়। এবং এই বাটিতে কিছু ধাতব মুদ্রা রাখা হয়। দেনা পাওনার আলোচনা শেষ হলে খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর বর পক্ষের অতিথিরা

নিজেদের গ্রামে ফিরে যায়। একই পদ্ধতিতে কনেপক্ষের লোকেরা বরপক্ষের বাড়িতে যায় এবং ফিরে আসে তবে এক্ষেত্রে দেনা পাওনার বিষয় থাকে না।

এরপর বিয়ের দিন ধার্য করা হয়, বেজে ওঠে বিয়ের বাজনা। বিয়ের নির্ধারিত দিন কাছাকাছি এলে বরপক্ষের জগমাঝি বরের বাড়িতে গ্রামের সব লোকজনকে একত্রিত হতে বলেন। একইভাবে কনে পক্ষের জগমাঝি কনের গ্রামের সবাইকে একত্রিত হতে বলেন। এরপর বরকর্তা এবং কনেকর্তা উভয়েই উভয়পক্ষের সমস্ত লোকজনকে হাঁড়িয়া খাওয়ায়। সমবেত লোকজন এবার জিজ্ঞাসা করে এটা কিসের হাঁড়িয়া। বরকর্তা জবাব দেন 'গিরো তল হাঁড়ি' অর্থাৎ বিয়ের আর দেরি নেই। তাই গিরো তৈরি করতে হবে। বরকর্তা বাড়ির ভিতরে ঢুকে একগাছি সুতো এবং গুঁড়ো করা হলুদ নিয়ে আসে। গ্রামের লোকজন সেই সুতোয় গিঁট দেয় তিনটি অথবা পাঁচটি করে যার অর্থ তিন দিন বা পাঁচ দিন পরে বিয়ে। বর্তমানে বিভিন্ন অসুবিধার কারণে সবাই বিয়ের অনেক আগে থেকেই গিরো তল করে নেয়। বরকর্তা এবং কনেকর্তা এইভাবে গিঁট দেওয়া হলুদে কষানো সুতো প্রত্যেকের হাতে দেয়, অথবা প্রত্যেক পরিবারে গিয়ে দিয়ে আসে। অর্থাৎ নেমন্তন্ন করে আসে। সুতরাং বিয়ের আগে সমস্ত প্রথাতে সমস্ত গ্রামবাসী সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

বিয়ের তিন দিন আগে হয় গায়ে হলুদ বা 'সুনুম সাশাং'। সেদিন সূর্য অস্ত যাবার পর গ্রামের নারী-পুরুষ সবাইকে জগমাঝি বরকনের বাড়িতে একত্রিত হতে ডাক দেন। সবাই জড় হলে প্রথমে দুজন তেতরে কুড়ি অর্থাৎ কুমারী মেয়েকে নির্বাচিত করা হয় যারা বর কনের গায়ে হলুদের জন্য শিলনোড়ায় হলুদ বাটে এবং বিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত বর এবং কনের বাড়িতেই

থাকে। গায়ে হলুদের দিন প্রথমে গ্রামের মাঝি হাড়াম এবং তার ধর্মপত্নীর গায়ে হলুদ লাগানো হয়। এরপর গ্রামের অন্যান্য গন্য মান্য ব্যাক্তিদের গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। এরপর বরকর্তা এবং কনে কর্তার গায়ে হলুদ হয়। এরপর বর এবং কণের গায়ে হলুদ হয়। গায়ে হলুদ হওয়ার পর বর এবং কনে একা একা বাড়ির বাইরে যেতে পারেনা। বরের সঙ্গে থাকে লুনতুঃয় কড়া' (নিতবর) এবং কনের সাথে থাকে 'লুনতুঃয় কুড়ি' (নিতকনে)। এরা সম্পর্কে বর এবং কনের ভাই বোন হয়। বর এবং কণের গায়ে হলুদের সাথে সাথে এদেরও গায়ে হলুদ হয়। গায়ে হলুদের শেষে সমবেত হওয়া সমস্ত গ্রামবাসী নিজের বাড়িতে ফিরে যায়।

গায়ে হলুদের তিনদিন পরে হয় 'ছাইলছামডা' অর্থাৎ অধিবাস। জগমাঝি ঐদিন সকালে বর এবং কনের বাড়িতে জড়ো হওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের ডাক দেন। লোকজন এলে শুরু হয় 'ছামডা এবং মাডওয়া' বাঁধার কাজ। উঠানের চারদিকে চারটি খুঁটি পুঁতে মাথায় ডালপালা এবং খড়ের তৈরি 'বড়' দিয়ে ছামডা তৈরি হয়। এছাড়াও মাঝে একখানা গর্ত করা হয় একে বলে মাডওয়া। এর দুপাশে দুটি জলভরা কলসি থাকে। এদের 'সাগুন ঠিলি' বলে। তেরতে কুড়িরা এই কলসিতে করে জল আনে। এদের মাথায় গামছা বা কোন কাপড় দিয়ে ঘোমটার ন্যায় তৈরি করে পাশাপাশি জলের কলসি কাখে নিয়ে জল আনে। এবং মাডয়ার সামনে মাডওয়া বিসর্জন দেওয়ার আগে পর্যন্ত ওই জল কলসিকে ঢেকে রাখা হয়। বিয়ের আগে সমস্ত অনুষ্ঠান এই মাডওয়ার সামনেই হয়। এই দিনটিকে বলে 'ছাইলছামডা'। ছামডা বা ছাউনি তৈরির কাজ শেষ হলে ছাউনি তৈরীর কাজে হাতে লাগানো সবাইকে 'ছামডা দাকা' অর্থাৎ ভাত খাওয়ানো হয় এবং তখনকার মতো অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পরের দিন জনমাঝি পুনরায় সবাইকে আসার জন্য অনুরোধ জানান। এই সময় গ্রামের নারী পুরুষ এবং আত্মীয়-স্বজনরা সবাই একত্রিত হয়। আত্মীয়-স্বজনরা উপস্থিত থাকলেও বিয়ের কোন অনুষ্ঠানে তারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতে পারেনা। গ্রামবাসীরাই সমস্ত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে। এদিনও একতরফা আগের নিয়মে হলুদ দেওয়া হয়। ছাইল ছামডার দিন বর এবং কনের আত্মীয়রা গুড় দিয়ে রান্না করা ভাত অর্থাৎ দাকা নিয়ে এসে কনেকে খাওয়ায়।

এরপর মাঝি বুডহি অর্থাৎ মোড়লের স্ত্রী নতুন কুলোয় দাঃ বাপলার প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে তেতরে কুড়ি, গ্রামের জগমাঝি এবং লোকজন নিয়ে গ্রামের নিকটে কোন পুকুর বা নদীতে গিয়ে দাঃ বাপলা সারে এবং তেতরে কুড়িরা কলসি ডুবিয়ে জল তোলে এবং সকলে একসঙ্গে ফিরে আসে।

এরপর শুরু হয় খাঁড়া দাঃ। বাড়ির কাছে একটি লম্বা অগভীর গর্ত খোঁড়া হয় এবং গর্তের দু'পাশে দুটি জোয়াল ফেলে রেখে তার পাশে বরের বাবা মা এবং বরকে দাঁড় করানো হয়। বরের মাথার উপরে দুহাতে একখানি তরোয়াল উঁচু করে উল্টো করে ধরে রাখা হয়। গ্রামের জগমাঝি সাগুন ঠিলির জল এমন ভাবে ঢালতে থাকে তা বর এবং তার বাবা মার মাথায় এসে পড়ে। জগমাঝি তিনবার জল ঢালে এরপর বর এবং তার বাবা মা সবাই স্নান করে কাপড় পরিবর্তন করে। একই নিয়মে কনের বাড়িতেও কনে, কনের বাবা এবং মা তিনজনে স্নান করে কাপড় বদলায়।

এরপর হয় মাতকম বাপলা। এই বাপলা বরের বাড়ির কাছে আম গাছে অনুষ্ঠিত হয়। বরকর্তা বরকে নিয়ে মাঝি এবং গ্রামের অন্যান্যদের সঙ্গে কনের পক্ষের বাড়ির দিকে যায়। কনে পক্ষের আতো মাঝি বরপক্ষের সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে কনের বাড়িতে নিয়ে আসেন। এবার কনের মা তার বাড়ির মেয়েদের নিয়ে বরকে বরণ করেন এবং বরকে মিষ্টি খাওয়ান। এবার হরঃচিন ছামডার নিচে পাতা মাদুরে বর এবং কনেকে পালা করে বসানো হয়। এই সময় নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনেরা বর এবং কণেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু উপঢৌকন দেন। যদিও এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এই হরঃচিন এর কাজ বর্তমানে বর এবং কনের বাড়ির লোকজনের সুবিধার জন্য বিয়ের অনেক আগেই সেরে নেওয়া হয়। হরঃচিন বা আশীর্বাদের কাজ শেষ হলে কনের নিজের বোন বা দিদিরা বাড়ির বাইরে পিঁড়িতে বসিয়ে বরকে জল, তেল, সাবান দিয়ে স্নান করায় এবং হলুদের রাঙানো ধুতি এবং গেঞ্জি পরতে দেয়।

এরপর হয় 'শালাদাহড়ি' অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান কালে বর তার ভগ্নিপতির অর্থাৎ 'বামড়ে বা সাদমের' কাঁধে ওঠে। কনের ভাই ও তার ভগ্নিপতির কাঁধে চড়ে বাড়ি থেকে রাস্তায় বের হয়ে আসে। এরপর উভয়কে তিনবার এপাশ ওপাশ করে আলিঙ্গন করানো হয়। এবং মুখোমুখি করা হয়। এবার দুজনেই দুজনকে পান খাওয়ায় এবং হবু বর তার হবু শালার নিজেদের মাথার হলুদে রাঙানো পাগড়ি পরস্পরের মাথায় পরিয়ে দেয়। এভাবে শালাদাহড়ি শেষ হয়।

এরপরে শুরু হয় বিয়ের মূল অনুষ্ঠান ইতুৎ সিঁদুর। মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে বরপক্ষের জগমাঝি বরযাত্রীদের কয়েকজনকে নিয়ে কনের বাড়িতে ঢোকেন। বাড়িতে ঢুকলে তাঁদেরকে বসতে দেওয়া হয় বাড়ির এক কোনে। খেতে দেওয়া হয় শালপাতার বাটিতে হাঁড়িয়া এবং

এরই ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির মেয়েরা হলুদ জল দিয়ে এদের জামাকাপড় রাঙিয়ে দেয়। এবার বেতের বোনা নতুন বড় আকারের খালি 'দৌওড়ো' এর মধ্যে কনেকে বসিয়ে দিলে বরের দাদা রা কনেকে দৌওড়ো সমেত ছামডা বা ছাউনির নিচে নিয়ে আসে। বরের জামাইবাবু বরকে কাঁধে করে কনের সামনে আনে। বর এবং কনের দু'পাশে দুজনের বৌদি ঘটিতে করে জলের মধ্যে আমডালা নিয়ে দাঁড়ায়। এবার বর এবং কনে দুজনকে বিপরীত ক্রমে তিনবার করে ঘুরানো হয় তারাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে। তখন বর এবং কনে আমডাল দিয়ে পরস্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। এর সাথে সাথে বর এবং কনে পরস্পরের গায়ে আতপ চাল ছড়ায়। তিন পাক ঘোরা হলে বর এবং কনেকে মুখোমুখি করা হয়। এইসময় একটি মোটা কাঠিতে ন্যাকড়া জড়িয়ে আগুন লাগিয়ে মশাল জ্বালানো হয়। জগমাঝি বর এবং কনের মাঝে একটি সাদা কাপড় টাঙিয়ে দেন সেই সাদা কাপড়টি নামিয়ে বর বরকর্তার হাত থেকে নোয়া নিয়ে বর কনের বাম হাতে পরিয়ে দেন। এবং কনের ঘোমটা খুলে সিঁদুর নিয়ে প্রথমে দুবার অল্প সিঁদুর কনের সিঁথি তে ঘষে দেয় এবং তৃতীয়বারে শালপাতা সমেত পুরো সিঁদুরটাই কনের সিঁথি তে ঘষে দেয়। বর এবং কনে কে এরপর একসঙ্গে নামিয়ে মাটিতে দাঁড় করানো হয়। এবারে কনের মা তার জা কে সঙ্গে করে এগিয়ে আসে এবং থালা থেকে আতপ চাল দূর্বা ঘাস এবং ভেজা হলুদ গুঁড়ো দিয়ে বর এবং কনেকে বরণ করে তাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে যায়। এবং একসাথে বসিয়ে খাবার খাওয়ায়। সারারাত ধরে বিয়ে চলতে থাকে এবং সঙ্গে চলে প্রচুর নাচ, গান ও বাজনা। এই করতে করতেই ভোর হয়ে যায়। এবার বর এবং কনেকে আবার ছামডার নীচে পোটয়োর উপরে বসানো হয়। বাঁধা পণের জন্য এই সময়

বরপক্ষের গ্রামের লোকজন অংশগ্রহণ করে। বরপক্ষ কনেপক্ষের হাতে সাড়ে বারো টাকা বাঁধা পণ দেয় এবং কনে পক্ষ থেকে পূর্বে যা দাবী করে ছিল তাই দেওয়া হয়।এরপর কনে কে হাত মুখ ধুয়ে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়। বর কনে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হলে গ্রামের লোকজন, আত্মীয়-স্বজন এবং বর যাত্রীরা বর এবং কনেকে নিয়ে উভয়কে মাদুরের ওপর পাশাপাশি বসান। দুই পক্ষের দুই গ্রাম প্রধান সামনাসামনি বসে কথা বলেন। কনে পক্ষের গ্রাম প্রধান প্রথমে কথা বলা শুরু করেন। তিনি বর এবং কনেকে তাদের দাম্পত্য জীবন এর ক্ষেত্রে করণীয় এবং সামাজিক কাজকর্ম সম্পর্কে উপদেশ দেন এবং মেনে চলতে বলেন। এরপর বরপক্ষের গ্রাম প্রধানও বর এবং কনেকে একই রকমের উপদেশ দেন। বরপক্ষের গ্রাম প্রধান দায়িত্ব নেন যে কনে তার গ্রামে ভালো থাকবে। অন্যথায় তিনি কনে পক্ষের মোড়লকে সমস্যার কথা জানাবেন। যাতে উভয়পক্ষ পারস্পরিক আলোচনায় সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারেন।

- **টুমকি দিপিল বাপলা:**

এই প্রকার বিয়ের রীতিনীতি সাধারণ বিয়ের মত। এই বিয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বরযাত্রীগণ পাত্রীর বাড়িতে যায়। পাত্রকে পাত্রীর বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় না। বরপক্ষ পাত্রীকে পাত্রের বাড়িতে নিয়ে আসে। পাত্রের বাড়িতে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়, দেনা পাওনা বিষয়টি বরপক্ষ পাত্রীর বাড়িতেই সম্পন্ন করে আসে।

- **ঘারদি জাঁওয়ায় বাপলা:**

এই প্রকারের বিয়েতে মেয়ের অভিভাবকরা উপযুক্ত ছেলে সন্ধান চালায়। মেয়ের পক্ষ থেকে ছেলে পছন্দ হলে গ্রামের পাঁচজনকে সঙ্গে করে ছেলের বাড়ি যায়। এই বিয়েতে দুই পক্ষের সম্মতি হলে ছেলেকে মেয়ের বাড়ি নিয়ে আসা হয়। দুই পক্ষের গ্রামের মোড়ল সমস্ত বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। বিয়ের পর ছেলেকে মেয়ের বাড়িতে ঘর জামাই থাকতে হয়।পরবর্তীকালে ওই যুগলের মধ্যে কোন সমস্যা তৈরি হলে ওই দুই গ্রামের মোড়ল বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করেন।

- **কিরিঞ জাঁওয়ায় বাপলা:**

কোন অবিবাহিত মেয়ে গর্ভবতী হলে সেই মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য ছেলের খোঁজ করা হয়। যে ছেলে বিয়ের জন্য রাজি হবে তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রকার বিয়ের সমস্ত খরচা মেয়েপক্ষ কে বহন করতে হয়। ছেলেদের কোন খরচ খরচা করতে হয় না, মানে মেয়েপক্ষ জামাইকে কিনে নিচ্ছে। তাই এই প্রকার বিয়েকে বলা হয় কিরিঞ জাঁওয়ায় বাবলা।

- **সাঁঘা বাপলা:**

কোন বিধবা বা বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলার পুনরায় অন্য কোন ছেলের সঙ্গে যে বিয়ে সে বিয়েকে বলা হয় সাঁঘা বাপলা।

➢ **কোঁড়েল এঞাপাম বাপলা:**

একটা ছেলে ও একটা মেয়ে নিজেদের পছন্দে একে অপরকে বিয়ে করাকে বলা হয় কোঁড়েল এঞাপাম বাপলা।এরা প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন নদী, নালা, গাছপালা, পাহাড়, পর্বত, ইত্যাদি কে সাক্ষী রেখে বিয়ে করে। বিয়ের পর ছেলে মেয়েকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসে। মেয়ের বাড়ির লোকজন তখন গ্রামের পাঁচজনকে পাঠিয়ে মেয়ের খোঁজ চালায় ছেলের গ্রামের মোড়লের কাছে। তারপর দুই গ্রামের মোড়ল একসাথে ছেলের বাড়ি যায়।ছেলের বাড়িতে মেয়েকে খুঁজে পেলে দুই মোড়ল ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞেস করে তারা বিয়েতে রাজি কিনা। যদি দুজনেই এই বিয়েতে রাজি থাকে তাহলে আর কোন সমস্যা নেই। তাদেরকে একসাথে থাকার অনুমতি দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে শুভদিন দেখে সিঁদুর দান করানো হয় দুই গ্রামের শাসন ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকা ব্যাক্তিদের উপস্থিতিতে।

৫.৪ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মৃত্যুর পর আচার-অনুষ্ঠান:

➢ **সাঁওতাল সমাজের শ্মশান থেকে অস্থি তোলার নিয়ম:**

মৃতদেহ শ্মশানে দাঁড় করানোর পর সমস্ত দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও মাথা পুরোপুরি ছাই হয় না। দাহ করার পর আগুন নিভিয়ে মাথার কিছু অস্থি তুলে নেওয়া হয়। হলুদ মাখানো জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে একটা পরিষ্কার মাটির হাঁড়িতে রাখা হয়। হাঁড়িটাকে মাটির ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয় মধ্যে একটা ছোট্ট ফুটো করা হয় ফুটোটাকে একটা কাঠি গুঁজে

বন্ধ করা হয়। তারপর হাঁড়িটাকে গাছে তলায় পুঁতে দিয়ে তার উপর কাঁটাগাছের ডাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির হাত ও পায়ের কেটে রাখা নখ পুঁতে রাখা হয়।

- **সাঁওতাল সমাজে কোন মানুষের মৃত্যুর পর অস্থি সংরক্ষণ করার নিয়ম:**

সাঁওতাল সমাজে মৃতদেহ দাহ করার পর অস্থি সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতে বিসর্জন না করলে সেটাকে সংরক্ষণ করা হয়। যতদিন না অস্থি বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে ততদিন সিন্দুর ব্যবহার করা যায় না। সেজন্য ততদিন বিবাহ, পূজা অর্চনা করতে পারে না। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে অস্থি সংরক্ষণ করে রাখলে সব ধরনের সামাজিক কাজকর্ম যেমন বিবাহ, পূজা অর্চনা করা যায়। সংরক্ষণের নিয়মগুলি হলো নিম্নরূপ-

মৃতদেহ দাহ করার পর মাথার অস্থি ছোট্ট নতুন মাটির হাঁড়িতে তুলে একটা গাছে তলায় পুঁতে রাখা হয়। তার ওপর কাঁটা জাতীয় গাছের ডাল রেখে দেওয়া হয়। পরে হাঁড়িটাকে বের করে অস্থি টাকে হলুদ মেশানো জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে হলুদ মাখানো সাদা কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখা হয়। তারপর অন্য একটা নতুন মাটির হাঁড়িতে রেখে বাড়িতে আনা হয়। সেই হাঁড়িটাকে বাড়ির নিরিবিলি জায়গায় যেখানে মানুষের আনাগোনা কম সেখানে মাটিতে না রেখে ঝুলিয়ে রাখা হয়। যতদিন ওই অস্থি বাড়িতে থাকবে ততদিন নিয়ম করে একবেলা দুধ দেখাতে হয় একটু জল অস্থিতে ঢেলে দেওয়া হয়। যতদিন অস্থি বাড়িতে থাকবে ততদিন এই নিয়ম পালন করা হয়ে থাকে।

- **অস্থি ভাসানোর নিয়ম:**

- **শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান:** সাঁওতাল সমাজে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করা হয় তার মধ্যে শ্রাদ্ধ হল সর্বশেষ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে সকল আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হয়। শ্রাদ্ধের সময় যে সকল নিয়মকানুন পালন করা হয় সেগুলি হল-

প্রথমে একটা নাপিতকে সঙ্গে করে তিনটি শাল পাতার বাটিতে তেল, তিনটি বাটিতে কাড়ে আর তিনটি শালের দাঁতন নিয়ে পুকুরে স্নান করতে যায়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের কাজ করবে তার এবং তার ভাইদের মাথার চুল ফেলে দেয়। যে ব্যক্তি মারা গেছে তার পুত্ররা শ্রাদ্ধের কাজ করে থাকে। পুকুরের ঘাটে পৌঁছে মাথার চুল ফেলে দেওয়া হয়। তারপর যে ব্যক্তি কাজটি করবে সে স্নান করে ঘাটে একটা থান বানায়। ওই থানে পূর্ব দিকে মুখ করে তিনটি শালপাতা রাখবে। ওই পাতার ওপর একটি করে শালের দাঁতন, কাড়ে, এঁটেল মাটি রাখবে। প্রথমটি মারাংবুরু নামে, দ্বিতীয়টি পূর্বপুরুষ নামে, আর শেষটি যিনি মারা গেছেন তার নামে রাখা হয়। তারপর এঁটেল মাটি আর কাড়ে মিশিয়ে মিশ্রণটি নিয়ে পুজো করবে। প্রথমে মারাংবুরু নামে ডান হাত দিয়ে তারপর পূর্বপুরুষের নামে, শেষে বা হাত দিয়ে যে মারা গেছে তাকে স্মরণ করে পুজো হয়। পূজো হয়ে যাওয়ার পর শালের দাঁতন ভেঙ্গে পাতাগুলোকে জলে বিসর্জন দেয়া হয়। তারপর সবাই এঁটেল মাটি ও কাড়ে মেখে স্নান করে তেল মেখে নেয়। যে কাজটি করবে তাকে ঘাট থেকে তুলে নতুন কাপড় দেওয়া হয়। আত্মীয় স্বজনরা নতুন কাপড় দান করে থাকে। কাপড় দান করা হয়ে গেলে তিনবার হরিবোল বলে বাড়ি উদ্দেশ্যে সবাই রওনা দেয়।

বাড়িতে এসে উঠোনে যেখানে বেদী করা হয়েছে সেখানে গোবর দিয়ে গোলাকার লতা দিয়ে তার ওপর একটা শালপাতার থালা রেখে তার মধ্যে চাল রাখা হয়। যে ব্যক্তি কাজ করবে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য একজন কুড়ুল হাতে বসে থাকে। প্রথমে একটা সাদা মুরগির রক্ত মারাংবুরু নামে ঝরানো হয়। তারপর পূর্বপুরুষে নামে আরেকটা মুরগি, আর যে মারা গেছে তার নামে আর একটা মুরগির রক্ত ঝরানো হয়। মুরগি গুলোকে বলি না দিয়ে কুড়ুল দিয়ে মাথায় আঘাত করে মারা হয়। শেষে আত্মীয়স্বজনরা যারা ছাগল মুরগি নিয়ে এসেছে তাদের বলি দেওয়া হয়। পূজোর পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর সেই পাতার চাল আর বলি দেওয়া মুরগির মাংস রান্না করা হয়। ভাত মাংস আর যা যা রান্না হয়েছে একটু করে একটা একটা শালের থালায় রেখে বেদির সামনে রাখা হয়। এরপর আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদের খেতে দেওয়া হয়।

- **সাঁওতাল সমাজে গর্ভবতী মহিলার মৃত্যু হলে সৎ কাজে নিয়ম:**

গর্ভবতী মহিলার মৃতদেহ থেকে বাচ্চাটাকে কেটে বের করা হয়। তারপর মৃত মহিলা ও বাচ্চাটাকে পৃথক পৃথক স্থানে মাটি দেওয়া। এক্ষেত্রে মৃতদেহ দাহ করা হয় না। গর্ভের সন্তানের বয়স ৫ মাস বা তার বেশি হলে পেট থেকে বের করা হয় পাঁচ মাসের কম হলে পেট থেকে কেটে বার করার প্রয়োজন নেই। সাঁওতাল সমাজের মানুষরা এটা মনে করেন যে কোন মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় মারা গেলে মৃত্যুর পর সে 'চুড়িন' হয়। ওই চুড়িন মানুষকে তাড়া করে। যাতে কাউকে তাড়া করতে না পারে বা বেশি দৌড়াতে না পারে তার জন্য কাঁটা জাতীয় গাছের ডাল পায়ে ঠেকিয়ে মাটি দেওয়া হয়। বাচ্চাটাকে পৃথক স্থানে কবর দিয়ে কবরের উপর মহুয়া

বা আকন্দ গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয়। মহুয়া বা আকন্দ গাছের রস মায়ের দুধের সমতুল্য মনে করা হয়। যেহেতু বাচ্চাটা মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত তাই ওই গাছের রস দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করবে। সাঁওতাল সমাজে বট বা মহুয়া গাছগুলিকে ঠাকুর বা দেবতা মনে করে করেন। সেই কারণে মৃত বাচ্চাটাকে মহুয়া গাছের তলায় কবর দেওয়া হয়।

ষষ্ঠ-অধ্যায়

প্রাপ্ত ফলাফল ও তার আলোচনা

৬.১ প্রাপ্ত ফলাফল

৬.১.১ সাঁওতালদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য

৬.১.২ সাঁওতালদের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য

৬.১.৩ সাঁওতালদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য

৬.২ আলোচনা

৬.৩ শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য

৬.৪ পরবর্তী গবেষণার সুযোগ

৬.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

তথ্যসূত্র

ষষ্ঠ-অধ্যায়

প্রাপ্ত ফলাফল ও তার আলোচনা

৬.১. প্রাপ্ত ফলাফল (Findings):

গবেষিকা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লকের কুড়িটি আদিবাসী (সাঁওতাল) গ্রাম থেকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান চিত্র তিনি এই গবেষণায় দেখার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়োজনে তিনি প্রতিটি গ্রামে নিজে গিয়েছেন, কিছুদিন থেকেছেন, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। PRA, FGD এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করে যে তথ্য পেয়েছেন সেগুলিকে নীচে তুলে ধরা হলো-

৬.১.১. সাঁওতালদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য:

ক. সমস্ত গ্রামেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজস্ব সংস্কৃতি এবং সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান।

খ. কোন অবস্থাতেই সাঁওতাল সম্প্রদায় নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন।

গ. বর্তমান প্রজন্মের সাঁওতাল ছেলেমেয়েরাও চিরাচরিত সাঁওতালি সংস্কৃতি মেনে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করে এবং বিয়ে করতে পছন্দ করে।

ঘ. সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থাকে এখনও বর্তমান প্রজন্ম যথেষ্ট সম্মান দিয়ে থাকে।

ঙ. সাঁওতালদের নিজস্ব সারি-সারনা ধর্মকে সকলেই শ্রদ্ধা করে এবং কেউই অন্য কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে চায় না। সমস্ত সাঁওতাল গ্রামেই নিজেদের মধ্যে সাঁওতালি ভাষায় কথোপকথন চলে।

চ. পুরানো প্রজন্মের মতো বর্তমান প্রজন্মের ছেলেরাও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরতে ভালোবাসে।

ছ. পুরনো প্রজন্মের মহিলারা চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী গান করতে জানলেও নতুন প্রজন্মের মেয়েরা চিরাচরিত গান শিখতে পারেনি। কিন্তু তারা এই গান শিখতে আগ্রহী।

জ. পুরনো প্রজন্ম এবং নতুন প্রজন্মের সমস্ত মহিলা ও মেয়েরা তাদের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ নাচতে পারে।

ঝ. সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী বাজনা পুরানো প্রজন্মের পুরুষদের সাথে সাথে নতুন প্রজন্মের ছেলেরাও শিখতে আগ্রহী। বেশিরভাগ গ্রামেই নতুন প্রজন্মের ছেলেরা তা আয়ত্তও করতে পেরেছে।

ঞ. সমস্ত গ্রামগুলিতেই ছেলেদের পরবে গিয়ে কম বয়সে পালিয়ে বিয়ে করার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে।

ট. ডেবরা, পিংলা, শালবনি, সবং, গোহালউড়া, বেগমপুর, কলকলি প্রভৃতি গ্রামগুলিতে অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহের ঘটনা আছে। যদিও বয়স্করা এই ধরনের বিয়েকে মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না।

ঠ. গড়বেতা-২ ব্লকের বুলানপুর গ্রামে চারটি সাঁওতাল পরিবার খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে।

ড. সব গ্রামেই সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনী প্রথায় বিশ্বাস করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

ঢ. সব গ্রামেই সাঁওতালরা তাদের সমস্ত পুজো জাহের থানেই করে।

ণ. প্রায় সব গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষরাই অন্য জাতির পুজোতে অংশগ্রহণ করে।

ত. চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ-গানের প্রচলন থাকলেও বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ডিজে বাজিয়ে নাচ করার প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

থ. সব গ্রামে যেকোন অনুষ্ঠানে মদ হাঁড়িয়া তৈরি করা এবং খাওয়ার চল রয়েছে।

দ. যে গ্রামগুলিতে ছেলেমেয়েরা অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহ করেছে, তাদের বেশিরভাগ গ্রামেই এক ঘরে করার প্রবণতা নেই।

ধ. বয়স্ক এবং নিরক্ষর পুরুষ ও মহিলাদের কেউ কেউ 'ডাইনি', অপদেবতা, ভুত-প্রেত, ওঝা-গুনিন বিষয়ে বিশ্বাস রাখে।

ন. এদের মধ্যে পরিযায়ী হওয়ার বা স্থানান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

প. সাঁওতাল পরিবারগুলিতেও বিশ্বায়ন এবং আধুনিকীকরণের ঢেউ লেগেছে।

৬.১.২. সাঁওতালদের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য:

ক. অর্থনৈতিকভাবে সাঁওতালরা পূর্বের তুলনায় একটু ভালো অবস্থানে বর্তমানে থাকলেও অধিকাংশ গ্রামের অধিকাংশ সাঁওতাল পরিবার এখনো দুরবস্থার মধ্যে রয়েছেন।

খ. কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের পক্ষ থেকে আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা থাকলেও, আজও পর্যন্ত তার সুফল অধিকাংশ সাঁওতাল গ্রামের সাঁওতাল পরিবারগুলিতে পৌঁছায়নি।

গ. বহু পরিবারে এখনো পর্যন্ত আধার কার্ড এমনকি কিছু ক্ষেত্রে রেশন কার্ডও নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই সরকারি রেশন বা অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে সাঁওতালদের অনেকেই বঞ্চিত।

ঘ. অধিকাংশ সাঁওতাল পরিবারে কোনো সদস্য/সদস্যা সরকারি/বেসরকারি চাকরি ক্ষেত্রে নিযুক্তি লাভ করেন নি।

ঙ. প্রায় কোন গ্রামেই কোন সাঁওতাল পুরুষ বা মহিলা কোন ধরনের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নয় তবে ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কেউ সবজি বা মসলার স্থানীয় ব্যবসা করেন।

চ. মেদিনীপুর জেলার কিছু ব্লকে এবং ঝাড়গ্রাম জেলার অধিকাংশ সাঁওতাল গ্রামে চাষযোগ্য জমিতে কেবলমাত্র আমন ধানের চাষ হয়। কারণ ওই সকল জমিতে কোনরূপ সেচের ব্যবস্থা নেই। ওই জমিগুলিতে চাষ করার জন্য বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করতে হয়।

ছ. সাঁওতাল গ্রামগুলিতে অধিকাংশ বাড়িতেই শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই।

জ. বহু সাঁওতাল পরিবারই এখনো কুঁড়ে ঘরে বসবাস করে।

ঝ. ঝাড়গ্রামের অধিকাংশ সাঁওতাল পাড়া যেহেতু জঙ্গলের কাছে তাই অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার জন্য তারা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

ঞ. এখনো অধিকাংশ সাঁওতাল পরিবার অর্থনৈতিকভাবে দিনমজুরীর উপর নির্ভরশীল।

ট. বহু সাঁওতাল পরিবার পরিযায়ী শ্রমিক রূপে দূর দূরান্তে ইঁটভাটা, রাস্তা তৈরি, চাষের কাজ, মুরগী ফার্মে ডিম কুড়ানো ইত্যাদিতে শ্রম দান করে।

ঠ. সাঁওতালরা তাদের ছোটখাটো অসুখে জঙ্গলের ঔষধি গাছ ব্যবহার করে।

ড. সাঁওতালরা গেঁড়ি, গুগলি, শাকপাতা, জঙ্গলের বিভিন্ন গাছের মূল,মাশরুম এবং জঙ্গলে শিকার করা পশুর মাংস প্রভৃতি দিয়ে নিজেদের ভিটামিন-প্রোটিনের চাহিদা মেটায়।

৬.১.৩. সাঁওতালদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য:

ক. বর্তমান প্রজন্মের সমস্ত ছেলেমেয়েরাই বিদ্যালয়ে যায়।

খ. বর্তমানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা পড়াশোনা করতে বেশি আগ্রহী।

গ. বনবাসী আশ্রমিক বিদ্যালয় কোন গ্রামে নেই।

ঘ. প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি গ্রামের কাছাকাছি থাকলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ বহুদূরে থাকায় সাঁওতাল পরিবারের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে অপারগ।

ঙ. বাবা মায়ের দূরদর্শিতার অভাব, কাজের চাপ, দরিদ্র্য, জঙ্গলে-মাঠে ছেলেমেয়েদের ঘুরে বেড়ানোর প্রবণতা, শিকারের প্রতি আসক্তি, বিভিন্ন সময়ে সামাজিক অনুষ্ঠান ও পরবে

অংশগ্রহণ, ফুটবল খেলায় আসক্তি, কম বয়সে বিয়ে ইত্যাদির কারণে অধিকাংশ সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে এখনো উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী হতে পারেনি।

চ. যেহেতু উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের পক্ষে সরকারি বা বেসরকারি চাকরি সংগ্রহ সহজসাধ্য নয় তাই গ্রামের মানুষরা সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় পাঠাতে অনাগ্রহী।

ছ. অধিকাংশ এলাকায় প্রাথমিক থেকে মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত কোন স্কুল নেই। সাঁওতালি ভাষায় লেখাপড়া করার সুযোগ নেই, ফলে বাংলা ভাষায় পড়তে অনাগ্রহী বহু ছেলে মেয়ে প্রাথমিক স্তরেই বিদ্যালয় ছুট হয়ে যায়।

জ. সমস্ত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা থাকলেও শুধুমাত্র খাবারের টানে সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায় না।

ঝ. অল্প কিছু সংখ্যক সাঁওতাল গ্রামে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও এখনো পর্যন্ত এটি কোন সামগ্রিক চিত্র নয়।

ঞ. মধ্যাহ্ন কালীন আহার গ্রহণের সময়, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা আদিবাসী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে আহার এবং খেলাধুলা করতে আগ্রহ দেখায় না।

ট. সাঁওতালি ভাষা ও সাঁওতালি সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং সাঁওতালি সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান শিক্ষক/শিক্ষিকার অনুপস্থিতির কারণে সাঁওতাল ছেলে

মেয়েরা বিদ্যালয়ে এমনকি উচ্চ শিক্ষার প্রাঙ্গনেও হীনমন্যতায় ভোগে যার ফলে অচিরেই তারা বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ঠ. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষার পরিমন্ডল আজও অধিকাংশ সাঁওতাল গ্রামে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

ড. পৃথকভাবে 'মহিলা মঙ্গল সমিতি' কোন গ্রামেই তৈরি হয়নি এ বিষয়ে সরকারি বা বেসরকারি কোনো উদ্যোগ আজও চোখে পড়েনি।

৬.২ আলোচনা (Discussion):

যে কোন স্থায়ী সুসংগঠিত সমাজে আমরা দেখতে পাই সামাজিক স্তরবিন্যাস। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক সরোকিন এর মতে সামাজিক স্তর বিন্যাস বলতে জনগণের পর্যায়ক্রমিক বিভাগকে বোঝায়। এই স্তর বিন্যাস এর একদিকে যেমন উচ্চতর শ্রেণী থাকে তেমনি এর অপরদিকে থাকে নিম্নশ্রেনী। অন্যভাবে দেখলে একদিকে থাকে আর্য সমাজ ব্যবস্থা এবং অপরদিকে থাকে আদিম অনার্য সমাজ ব্যবস্থা। ট্যালকট পারসনস্ এর মতে সামাজিক ক্ষেত্রে অসাম্যের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হল সামাজিক স্তরবিন্যাস। সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের বিবেচনা অনুযায়ী কেউ উচ্চ স্তরে রয়েছেন এবং কেউ রয়েছেন নিচু স্তরে। বটোমোর এর মতে সামাজিক স্তর বিন্যাস হলো সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে ও শ্রেণীতে সমাজের বিভাজন এবং তার ভিত্তিতে ক্ষমতা ও মর্যাদার ক্রমোচ্চ বিন্যাস।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বহু প্রাচীনকাল থেকে আর্য এবং অনার্য এই দুই ভাগে সমাজকে ভাগ হয়ে থাকতে দেখা যায়। সমাজের জাত পাতের বিভাজনের ফলে কিছু মানুষ যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে

পড়েছেন। এদের একটি বড় অংশ উপজাতি সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। এরা বিভিন্নভাবে মূল সমাজ ব্যবস্থা থেকে পৃথক এবং সমাজের মূল দেহ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনী শক্তি সংগ্রহ করতে অপারগ। তাই এই তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত এবং ব্যক্তিগত অগ্রগতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এরা অসমর্থ। এরা বহু ক্ষেত্রে 'গিরিজন' নামে পরিচিত।

১৯১৯ সালের জনগননা অনুসারে ভারতের তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের হার ৮.৮% ছিল যা সংখ্যায় প্রায় ৭.৪২ কোটি। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের তপশিলি উপজাতি ভুক্তদের হার ৮.৬% অর্থাৎ ১০.৩ কোটি। ওই একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের মোট সংখ্যা ৫২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৫৩ জন। ১৯৫৬ সালের Scheduled Tribe Lists Modification Order (1956) থেকে ৪১৪ ধরনের তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতে রয়েছেন। এদের সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের ৩৩৬ (২৫) নম্বর ধারায় এবং ৩৪২ (১) নম্বর ধারায় আলোচনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছেন ৪০ ধরনের উপজাতি।

ভারতের তপশিলি উপজাতিদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাঁওতাল উপজাতির মানুষেরা কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বসবাস করেন। সাঁওতাল সমেত সমস্ত ধরনের আদিবাসীদের ব্রিটিশ সরকার 'Criminal ' বা 'Anti-social' বলে অভিহিত করেছেন। আদিবাসীদের মধ্যে যে সকল মানুষ ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় ভাবে শোষণ, অত্যাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন তাদেরকেই ব্রিটিশরা ‘ডাকাত’ বলে চিহ্নিত করেছেন।

ভারত স্বাধীনতা হবার পর থেকে তপশিলি উপজাতিদের উন্নয়নে বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন। পচাৎপদ আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাধীন ভারতের সরকার বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সংবিধানের ১৫ নম্বর, ১৬ (৪), ৩২০ (৪), ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫, ১৯ (৫), ৪৬, ১৬৪, ২২৪, ২৭৫ (১), ৩৩৮, ৩৩৯ (২), এবং ৩৪২ নম্বর ধারায় আদিবাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ভারত সরকার। স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৫৩-১৯৫৫ সালে কাকা কার্লেকার এর নেতৃত্বে Backward Classes Commission প্রতিষ্ঠা করেন। এবং এদের সমস্যাগুলি জানার চেষ্টা করেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে রেনুকা রায়ের নেতৃত্বে একই লক্ষ্যে গঠিত হয় 'The Study Team of Social Welfare of Backward Classes'. ১৯৬০-৬১ সালে UN Dheba এর নেতৃত্বে ভারত সরকার গঠন করেন The Scheduled Areas and Schedule Tribe Commission. ১৯৭৯-৮০ সালে B. P. Mondal এর নেতৃত্বে গঠিত হয় The Second Backward Classes Commission. উল্লিখিত সমস্ত Commission এবং Study Team ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের সমস্যা গুলিকে যেমন বোঝার চেষ্টা করেছেন, তেমনিই এদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেই বিষয়েও আলোচনা করেছেন।

ইসমাইল এবং গুহ (২০১৫) তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে ভালোভাবে জানলে তবেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেই সম্পর্কে সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে। তাঁদের মতে সাঁওতালরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ এবং সাঁওতালরা স্বশ্রেণী ছাড়াও বাকি সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে পছন্দ করেন। এদের উন্নতি ঘটাতে হলে এদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক

ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে তার মাধ্যমে কি পথ পাওয়া যাবে সেই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে।

সরেন (২০১৩) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল সম্প্রদায় বহু ক্ষেত্রেই পরিযায়ী শ্রমিকের ভূমিকা পালন করায় তাঁদের উন্নয়নের নির্দিষ্ট রূপরেখা পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন ঋতুতে কাজের খোঁজে এঁদেরকে স্থানান্তরিত হতে হয়, ফলে সরকারি এবং ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু বেসরকারিভাবেও যে সকল সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয় তার অধিকাংশ এদের কাছে পৌঁছাতে পারেনা। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাঁওতাল সম্প্রদায় কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের আনুগত্য স্বীকার না করায় রাজনৈতিক নেতারা এদের উন্নয়নে বিশেষ আগ্রহ দেখান না। একই সঙ্গে পরিযায়ী প্রকৃতির জন্য এরা যেহেতু মূল স্রোতের সমাজের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় তাই এদের সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বেশভূষা, রান্নার পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা এবং সঞ্চয়ের মানসিকতার উপর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একই কারণে চিরাচরিত বনজ ওষুধের উপর নির্ভর না করে রোগের চিকিৎসায় আধুনিক এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথির চিকিৎসার ওপর এরা অনেক অংশে নির্ভরশীল। আর এর ফলে এদের যেমন স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটছে তেমনি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হারও কমছে। এই দিক থেকে দেখলে সাঁওতালদের জীবনে তথাকথিত মূল স্রোতের মানুষের জীবনধারার গুরুত্ব অপরিসীম।

সেন (২০২১) তাঁর গবেষণায় সাঁওতালদের জীবিকার মধ্যে বিশেষ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠে থাকা সাঁওতাল পুরুষ ও নারী সমাজের জীবিকার বিষয়ে তিনি গবেষণাতে লক্ষ্য করেন যে শান্তিনিকেতনের সাহচর্যে থাকার কারণে তাঁরা

সমাজের মূলস্রোত থেকে নিজেদের তো বিচ্ছিন্ন করেননি উপরন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। এছাড়াও শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নাচ, গান ও বাজনা এবং বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের দ্বারা এরা যথেষ্ট ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। এর ফলে এই অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায় নিয়মিত নাচ-গান প্রদর্শন ও হস্তশিল্পের বিক্রয়ের দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছেন। বিশ্বভারতীর গ্রামীণ পুনর্গঠন বিভাগ শ্রীনিকেতনের সীমারেখায় অবস্থানকারী সাঁওতাল পল্লীর উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় পাল এবং গুপ্তা (২০১৬) এর গবেষণায়। তাঁরা বীরভূম জেলার (পশ্চিমবঙ্গ) সাঁওতাল উপজাতিদের সংস্কৃতির পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁদের মতে বীরভূম জেলায় বহু সংখ্যক সাঁওতাল পরিবার তাঁদের চিরাচরিত সারি-সারণা ধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এর কারণ হিসাবে জানিয়েছেন যে ধর্মান্তরিত সাঁওতালরা অন্য ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে ধর্মান্তরিত হননি বরঞ্চ কিছু আর্থিক লাভের প্রত্যাশায় তাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন। গ্রামে গ্রামে খ্রিস্টান মিশনারীরা যে ইংরেজি মাধ্যমের বেসরকারি স্কুল স্থাপন করেছেন তাতে বিনা পয়সায় শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন ধর্মান্তরিত পরিবারের ছেলেমেয়েরা। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তারা পাচ্ছে বই, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, বাড়ি সারানোর জন্য বা পরিবারের কারোর চিকিৎসার জন্য টাকা, শীতের দিনে গরম জামা কাপড় ইত্যাদি। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা পরিবার গুলির সঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারীরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। তাঁদের প্রয়োজনে সমস্ত রকমের সাহায্য সহায়তা দান করেন। তাই গবেষকদের মতে ধর্মান্তরিত সাঁওতালরা যে কেবলমাত্র বৈষয়িক সুযোগ-

সুবিধা পাচ্ছেন তা নয়, একই সঙ্গে তাঁরা লাভ করছেন মানবিক আচরণ। বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা লক্ষ্য করেছেন যে কুড়িটি গ্রামের মধ্যে মাত্র একটি গ্রামের চারটি সাঁওতাল পরিবার খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন।

বিভিন্ন গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে যে চিরাচরিত সাঁওতাল সমাজের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তন ঘটেছে। পাল এবং গুপ্তা (২০১৬) লক্ষ্য করেছেন যে বীরভূম জেলার যে সকল সাঁওতাল পরিবার উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন তাঁরা মূল স্রোতের সাঁওতাল সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছেন। তাঁরা শহর অঞ্চলে উঠে গিয়ে বসবাস করছেন। শহুরে সংস্কৃতিতে নিজেদের একাত্ম করার চেষ্টা করছেন। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে নিজেদের সাঁওতাল পরিচিতির বলয় থেকেও বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। বর্তমান গবেষিকা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার যে কুড়িটি গ্রামের তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে সাঁওতাল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা তিনি সাঁওতাল মানুষ জনের মধ্যে লক্ষ্য করেননি। তবে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে উচ্চশিক্ষায় আসা বহু সাঁওতাল যুবক-যুবতী আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর উচ্চবর্ণের ছেলে/মেয়েকে বিবাহ করেছেন এবং নিজের গ্রাম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না যাওয়ার বিষয়ে মনস্থ করেছেন। এদিক থেকে দেখলে গ্রামীণ সাঁওতাল সমাজ মনে করেন উচ্চশিক্ষা তাদের সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ যে শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর ছেলে-মেয়েরা সমাজ-সংস্কৃতি, প্রথা, ধর্ম ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস না রেখে অন্য ধর্ম, অন্য সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ধাবিত হয়, তা যে কোনো সমাজের পক্ষে মৃত্যু ব্যতীত কিছু নয়। বর্তমান গবেষিকাও বিশ্বাস করেন যে সাঁওতাল সমাজের উন্নতির জন্য উচ্চশিক্ষা লাভ করা জরুরী। কিন্তু একই সাথে নিজের সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় পরিচিতি কে অস্বীকার করে নয়।

সাঁওতাল সমাজে মেয়েরা চিরাচরিতভাবেই যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেন। যদিও সাঁওতাল সমাজে মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ছেলেদের তুলনায় সাঁওতাল সমাজে মেয়েদের অধিক পরিমাণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সাঁওতাল মেয়েরা এখন শুধুমাত্র শালপাতা, সাবুই ঘাস ইত্যাদি শিল্পে নিজেদের বন্দী না রেখে বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ, রূপচর্চা, অফিস সহকারী, রেস্টুরেন্ট সহকারী, স্বাস্থ্য সহায়িকা, শিক্ষিকা, ক্লার্ক ইত্যাদি বৃত্তিতে আগ্রহী হয়েছেন। তবে যে সমস্ত মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তারা উচ্চশিক্ষায় আর অধিক অগ্রসর হতে পারছেন না। গ্রামীণ এলাকায় সাঁওতাল মেয়ে এবং মহিলারা সেল্ফ-হেল্প গ্রুপ তৈরি করে তার মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক সামর্থ্যকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। এখন সাঁওতাল মেয়েরা বুঝেছেন টাকা সঞ্চয় করার গুরুত্ব। তাই পঞ্চায়েত থেকে তাঁদের দক্ষতা বিকাশকারী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিক পরিসরেও শিক্ষিত সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের আগ্রহ এবং উপস্থিতি চোখে পড়ছে। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতিও একজন সাঁওতাল মহিলা। বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিতা সাঁওতাল মেয়েদের সাথে আলোচনা করে এই একই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

সমাজ-সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে সাঁওতাল সমাজে বিশেষ কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা না গেলেও সাঁওতাল মেয়েদের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার এবং স্বশক্তিকরণ এর আকাঙ্খায় এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। সাঁওতাল সমাজের যুবক-যুবতীরা উচ্চশিক্ষায় যথেষ্ট আগ্রহী। চিকিৎসা বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষকতা এবং বিভিন্ন সরকারি চাকুরী ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবণতা বিশেষ ভাবে এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বায়ন এবং আধুনিকীকরণ সাঁওতাল সমাজকে স্পর্শ করেছে এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা

নেই। বিশ্বায়ন সাঁওতাল সমাজের অর্থনৈতিক চিত্রকে পরিবর্তিত করেছে। শতকরা ৬৫.৫ ভাগ সাঁওতাল বর্তমানে ভালো উপার্জন করেন, ১৫.৫% সাঁওতাল মধ্যম মানের উপার্জন করেন এবং ৯% সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ স্বল্প মানের উপার্জন করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উপরে অরূপ দে (২০১৫) এর গবেষণায় এই তথ্য ধরা পড়েছে। এই বিশ্বায়নের কারণে সাঁওতালদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রতি প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন শতকরা ৫৩.৫ ভাগ সাঁওতাল পুরুষ ও মহিলা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে আগ্রহী কারণ তাদের বিশ্বাস আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাল মেলাতে গেলে উচ্চশিক্ষা লাভ জরুরী। বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা লক্ষ্য করেছেন যে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুযোগ পেলে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রতি আগ্রহ অধিক। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল পুরুষদের স্বাক্ষরতার হার যেখানে ৬৬.১২% ছিল সেখানে সাঁওতাল মেয়েদের ওই সময় সাক্ষরতার হার ছিল ৪৩.৫% এবং সামগ্রিকভাবে এই সাক্ষরতার হার ছিল ৬৬.১২%। বর্তমানে এই হার বৃদ্ধির প্রবণতা যথেষ্ট লক্ষণীয়। তাই সাঁওতাল পরিবার উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য তাদের ছেলেমেয়েদের দূরের স্কুল-কলেজের হোস্টেলে রাখতে আর দ্বিধাবোধ করেন না। তবে একথাও ঠিক যে সামগ্রিকভাবে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট না থাকায় উচ্চশিক্ষিত/শিক্ষিতা সাঁওতাল যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চশিক্ষা লাভের ফলে এরা আর চিরাচরিত শারীরিক শ্রমের কাজে অংশ নিতে পারছেন না। তাই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত সাঁওতাল যুবক যুবতীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট হতাশা জেগেছে।

গবেষিকা তাঁর গবেষণায় লক্ষ্য করেছেন যে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের ন্যায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয় শিক্ষাটুকুই শেষ করতে পারেনা।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষের আগেই অনেকে স্কুলছুট হয়ে যায়। অন্তত মাধ্যমিক শ্রেণি অবধি ধারাবাহিক শিক্ষা লাভ না করলে অধীত বিদ্যা এরা ধরে রাখতে পারে না। ফলে পূর্বতন শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কারণ হিসাবে জানা গেছে পরিবারের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, ভাষাগত সমস্যা, বাড়িতে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করার মতো লোকের অভাব, সহপাঠীদের বঞ্চনা এবং সহপাঠীদের কাছ থেকে পৃথকীকৃত থাকা, পারিবারিক কাজকর্মে নিযুক্তি ইত্যাদির কারণে এরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করতে পারেনা। বর্তমান গবেষিকার প্রাপ্ত ফলাফল কে স্বীকার করেছেন বিভিন্ন গবেষক- মুরমু, দে এবং মাইতি (২০২০), গৌতম (২০০৩) প্রমুখরা।

সরকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের মধ্যে স্বনির্ভরতার পাঠদানের লক্ষ্যে Large Sized Multipurpose Cooperative Society (LAMPS) তৈরি করে আর্থিক ঋণদান, উন্নতমানের বীজ, সার, ওষুধ, চাষের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। এছাড়াও আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আদিবাসী এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে অধিক সংখ্যক আদিবাসী শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আদিবাসী ছেলেরা যাতে সরকারি চাকুরীতে ঢুকতে পারেন তার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৬.৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য:

বর্তমান শিক্ষাক্ষেকে গবেষিকার গবেষণাটি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে-

১. আদিবাসী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করা এবং পুরো শিক্ষার সময়কাল তাদেরকে ধরে রাখার বিষয়ে প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য সহকারী শিক্ষক

শিক্ষিকারা বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন। পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের এই সমস্ত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা ভাষাগত সমস্যা, সঞ্চিত শব্দভাণ্ডারের অপ্রতুলতা এবং পরিবারে শিক্ষার্থীর বিষয় ভিত্তিক সহায়তা দানের সুযোগ না থাকার জন্য এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় ছুট হয়ে যায় তাই এদের জন্য অবসর সময়ে অতিরিক্ত সহায়তা দানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২. অর্থনৈতিকভাবে এই পরিবারগুলি পিছিয়ে থাকে। এদের অধিকাংশের যথেষ্ট পরিমাণে চাষযোগ্য জমি নেই। যে অল্প জমি রয়েছে তাতে বর্ষার জল ভিত্তিক চাষটুকু হয়। এই সকল দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সারা বছরের প্রয়োজনীয় বই, খাতা, পেন, পেন্সিল, রং, দুই সেট করে ইউনিফর্ম, জুতা, ছাতা, জলের বোতল সমস্ত বিদ্যালয়ে থেকে এদের সরবরাহ করতে হবে। দারিদ্র্যের কারণে অনেক পরিবারে দিনান্তে একবার মাত্র রান্না হয় এবং খাবার জোটে, তাই বহু ছেলে-মেয়ে সকালে অভূক্ত অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসায় লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারেনা। তাই মধ্যাহ্নকালীন আহারের দিকে তাদের নজর থাকে। বিদ্যালয়ের শুরুতেই যদি এদের জন্য ভারী টিফিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তাহলে একদিকে যেমন এরা পুষ্টি লাভ করবে তেমনি অন্যদিকে শিক্ষার প্রতি এদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে অবশ্যই। অভুক্ত শরীরে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ যে অসম্ভব এ কথা প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরাও জানতেন।

৩. ভাষাগত সমস্যার কারণে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বহু শিক্ষার্থী তাদের প্রার্থিত শিক্ষাটুকু লাভ করতে পারে না, তাই সাঁওতালি ভাষায় পাঠদানের জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সকল এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীর আধিক্য রয়েছে সেখানে

আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের অধিকাংশ সংখ্যায় শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করলে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের ধরে রাখা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

৪. আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে আরো গভীরভাবে নিরন্তর গবেষণার প্রয়োজন। সরকারি প্রচেষ্টা এবং সাহায্য ব্যতিরেকে দীর্ঘমেয়াদি গুণগত মান বিশিষ্ট গবেষণা অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেও আদিবাসী বিষয়ের গবেষণায় আগ্রহ দেখাতে হবে এবং গবেষকদের বিশেষ ভাবে আর্থিক সহায়তা দান ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫. বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এবং আদিবাসীদের সম্পর্কে উন্নত গুণমানের গবেষণা গুলিকে প্রকাশিত করতে হবে। অন্যথায় আদিবাসী বিষয়ে গবেষণার সুফল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে পৌঁছাবে না।

৬. সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আদিবাসীদের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পত্র যুক্ত রাখতে পারলে ভাবী কালের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা আদিবাসীদের সমস্যা এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ জানবেন। এই সমস্ত শিক্ষকরা তবেই শ্রেণীতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পর্যায় গুলি গ্রহণ করতে পারবেন।

৬.৪ পরবর্তী গবেষণার সুযোগ:

১. আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য পাঠক্রম এর মধ্যে আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক কাহিনীকে কিভাবে যুক্ত করা যায় এবং তুলে ধরা যায় সে বিষয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

২. আদিবাসী বয়স্কদের নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা, তাদের জন্য পাঠাগার প্রস্তুতকরণ বিষয়েও গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

৩. বনজ সম্পদকে সুরক্ষিত রেখে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে কিভাবে সেগুলিকে সুরক্ষিত রাখা যায় এ বিষয়ে গবেষণার সুযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. আদিবাসীদের জন্য এলাকাভিত্তিক এবং সম্পদের প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে নতুন ধরনের কি কি বৃদ্ধিতে এদের নিযুক্ত করা যায় ও আর্থিকভাবে এদের সাফল্যের মুখ দেখানো যায় সেই বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

৫. বর্তমানের বিশ্বায়ন, পাশ্চাত্যীকরণ এবং আধুনিকীকরণের প্রভাব সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উপর কতখানি এই নিয়ে গবেষণা করা যায়।

৬. আদিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার এবং ডাইনি প্রথা, মন্ত্র, ভূত-প্রেত, ওঝা-গুনিন ইত্যাদি থেকে মুক্ত করবার জন্য এবং এদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

৬.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

১. গবেষিকা কেবলমাত্র সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করেছেন। তিনি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের তুলনামূলক আলোচনাতে প্রবেশ করেননি।

২. তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা দানের জন্য গবেষিকা কেবলমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে মাত্র কুড়িটি গ্রাম চিহ্নিত করে কাজ করেছেন।

ফলে অপরাপর গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ না করায় এই গবেষণায় সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বিষয়ে বহু তথ্যই গবেষিকার জানার বাইরে থেকে গেছে।

৩. তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষিকা কেবলমাত্র দুটি জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামকে চিহ্নিত করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন। সময়ের অভাব, অর্থাভাব, যোগাযোগের ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে অন্যান্য জেলাগুলি থেকে গবেষিকা তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি।

৪. আদিবাসী সম্প্রদায় বিশেষত সাঁওতালদের নিয়ে প্রচুর গবেষণা না হওয়ায় গবেষিকা খুব বেশি সংখ্যক গবেষণা পত্রের পর্যালোচনা করে উঠতে পারেননি।

৫. উপযুক্ত সহায়ক ব্যবস্থা না থাকার কারণে গবেষিকা আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ কালে যে কৌশল গুলিকে ব্যবহার করেছেন তার বিস্তারিত স্থিরচিত্র এবং অডিও ভিসুয়াল চিত্র সংগ্রহ করতে পারেননি।

তথ্যসূত্র (Reference):

Murmu, De, & Maiti (2020). Problems of Drop-Out of Scheduled Tribe Students at the Upper Primary Level. *International Journal of Research*, 6 (3), 76-85.

Goutam, Vinoba (2003). Education of Tribal Children in India and the Issue of Medium of Instruction, Janasala, Maharashtra, India. *International Journal of Research,* 6 (3), 85.

গ্ৰন্থপঞ্জী (Bibliography)

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

Ahmed, N., & Tattwasarananda, S. (2018). Education of Santals of Jhargram: An Ethnographic Study. *IOSR-JHSS*, 7(3), 51-58.

Ahmed, N., & Tattwasarananda, S. (2019). Mordenization and the Educated and Non-Educated Santals of Jhargram: An Ethnographic Study. *JETIR*, 6(5), 180-200.

Ali, S., & Akter, T. (2014-2015). Gender Development and the Status of Tribal Women: A Study of Tripura. *A Journal on Tribal life and Culture,* 18 (2), 86-93.

Sen, Amartya (2020, Feb). Forward. Living World of the Adivasi of West Bengal. *Asiatic Society and Pratichi Institute.*

Anbuselvi, G., & Leeson, P. G. (2017). Education of Tribal Children in India: A Case Study. *IJAIR,* 4 (3), 205-209.

Babu, T. B., & Brahmanandam, T. (2016). Educational Status among the Schedule Tribes Issue and Challenges. *NEHU,* 14(2), 69-85.

Banerjee, S., & Adhikary, B. (2017). Multiculturalism and Academic Libraries: A case study of Santal Tribe of West Bengal, India. *NSOU*, 4(1), 36-44.

Basu, A., & Chatterjee, S. (2013). Status of Educational Performance of Tribal Students Study in Paschim Medinipur District, West Bengal, *S-Academic Journal,* 9 (20), 925-937.

Biswas, S., & Chatterjee, M. (2018). Folklores of Shantal Inhabiting Joypur Forest of Bankura District, West Bengal. *RJLBPCS,* 4 (6), 780-788.

Buzdar, M. A., & Ali, A. (2011). Parent's Attitude toward Daughter's Education in Tribal Area of Dera Ghazi Khan (Pakistan). *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry,* 2 (1), 16-23.

Chakraborty, N, R., & Paul, A. (2014). Traditional Knowledge on Medicinal Plants used by the Tribal People of Birbhum District of West Bengal in India. *IJAEB,* 7 (3), 547-554.

Chakraborty, S. P., Ghosh, J., Bhattacharya., & Panda, S. (2019). Unveiling the Socio-Economic Condition of Tribal Peoples in West Bengal. *International Journal of Operation Research, Technology and Engineering*, 8(4), 12317-12326.

Daripa, S. K. (2018). Social Economic Status of the Tribals of Purulia District in the Post-colonial Period. *International Journal of Research in Social Science,* 8(2), 727-739.

Das, M. (2017). Economic Growth and Women Empowerment through Education: A Study on Santal at Birbhum, West Bengal. *IJEDR,* 5(3), 392-397.

Das, P. (2020). Educational Status and Dropout Rate of Schedule Tribe in West Bengal: Study on Birbhum District. *Aegaeum Journal,* 8 (8), 485-495.

Das, P. (2020). Educational Status and Drop-Out Rate of Scheduled Tribe in West Bengal: A Study on Birbhum District. *AEGAEUM JOURNAL,* 8(8), 485-495.

Das, T. (2019). Economic Condition of Santhal Tribe in Lakhimpur District: A Sociological Study. *EPRA International Journal of Research and Development,* 4(10), 123-125.

Dey, A. (2015). An Ancient History: Ethnographic Study of the santhal, *International Journal of Novel Research in Humanity and Social Science,* 2 (4), 31-38.

Dey, A. (2015). Globalization and Change in Santhal Tribes at Paschim Medinipur (West Bengal), India. *International Journal of Scientific Reesearch,* 4(6), 37-41.

Dutta, S., & Bisai, S. (2020). Literacy Trends and Differences of Schedule Tribe in West Bengal: A Community Level Analysis. *International Journal of Humanities and Social Science Invention,* 16(1), 125-132.

Garnaik, I., & Barik, N. (2012). Role of Ashram School in Tribal Education: Study of a Block in Jharsuguda District. *Orisha Review,* 85-89.

Ghosh, P. (2013). Development Programme and the Tribal Study on the Santal of Birbhum District. *IOSR-JAGG,* 1 (5), 35-39.

Ghosh, P. (2015). Impact of Globalization on Tribal World of West Bengal. *Arts and Social-Science Journal,* 6(2), 1-5.

Ghosh, P. (2018). Development of Education and its Impact on the Population Composition of the Tribal People of Birbhum District of West Bengal. *ASSRJ,* 5 (1), 64-82.

Gope, L., Behera, S. K., & Roy, R. (2017). Identification of Indigenous Knowledge Components for Sustainable Development among the Santal Community. *AEGAEUM,* 5(8), 887-893.

Goutam, Vinoba (2003). Education of Tribal Children in India and the Issue of Medium of Instruction, Janasala, Maharashtra, India. *International Journal of Research,* 6 (3), 85.

Guha, N., & Das, P. (2013-14). Educational Advancement of Schedule Tribes in West Bengal (1947-2011). *GJISS*, 18, 112-131.

Guha, S., & Ismail, M.D. (2015). Socio-Cultural Change of Tribes and Their Impacts on Environment with Special Reference to Santhal in West Bengal. *GJISS*, 4(3), 148-156.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Binpur_I

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Binpur_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chandrakona_I

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chandrakona_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Daspur_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Debra_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Garhbeta_I

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Garhbeta_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Garhbeta_III

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ghatal_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gopiballavpur_I

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gopiballavpur_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jamboni_(community_development_bloc)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Keshiari

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Keshpur-(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kharagpur_II

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nayagram_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pingla_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sabang_(community_development_block)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Salboni_(community_development_block)

https://www.Banglalecturesheet.xyz/2022/06/Methodology-Focus-Group.html

Majumder, K., & Chatterjee, D. (2021). The cultural dimension of environment: Ethnoscientific study on santal community in eastern India. *IJAE*, 5 (16), 1-21.

Majumder, K., & Chatterjee, D. (2021). The Cultural Dimension of Environment: Ethnoscientific Study on Santhal Community in Eastern India. *International Journal of Antropology and Ethnology*, 5(16), 1-21.

Mal, S., & Khatun, S. (2022). The Status of Women among the Tribal Communities of West Bengal, India, *Research Journal of Humanities and Social Science.*

Mallick, M. A. (2011). Tribal Development Scenario in West Bengal A Study of Jamalpur Block of Burdwan District. *IJSW*, 72(3), 315-334.

Mishra, M. (2014). Educational Awareness of Tribal People (Santali) in Malda District, West Bengal. *IJIFR*, 2(3), 630-639.

Mondal, J. (2018). Socio-Economic Status of Tribal People Mukundapur Village West Bengal. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 3(12), 354-357.

Mudi, N, R. (2018). Transformation of Social-Economic Condition of Tribal Community in Frontier Bengal: Identity Crisis and Present Scenario. *International Journal of Innovative Science and Research Technology,* 5 (10), 667-673.

Mukherjee, S. (2014). Ignored Claims: A Focus on Status of Tribal Women Education of Santal community of Purulia District, West Bengal, India. *Transactions,* 5 (1), 43-48.

Mukherjee, S. (2014). Status of Female Education among Santal, kheria Sabar and Birho & Tribal Communities of Purulia District West Bengal, India. *Transactions,* 36 (2), 271-278.

Murmu, De, & Maiti (2020). Problems of Drop-Out of Scheduled Tribe Students at the Upper Primary Level. *International Journal of Research,* 6 (3), 76-85.

Patra, B., & Mal, S. (2020). A Study on Educational Status of Santal (tribal) Community: A Theroitical Study on Gourangdih Gram Panchayat of Purulia (1978-2011). *Journal of Social Science,* 8 (1), 356-359.

Patra, S., & Panigrahi, N. (2018). Educational Status of the Marginalized: A Study among the Santal of Paschim Medinipur District West Bengal. *Journal of Social Science,* 57(1-3), 1-7.

Patra, S., Dutta, A. K., & Upadhyay, P. (2021). An Analysis on the Educational Awareness of Marginalized Community of Nayagram Block, Jhargram District, West Bengal. *NSOU,* 4 (1), 36-44.

Paul, S. K., & Gupta, A. (2016). The Changing Cultural Pattern among the Santals of Birbhum, West Bengal. *South Asian Anthropologist,* 16 (1), 7-18.

Pushpalatha. (2010). The Influence of Globalization Over Tribal Culture, Education and Health in Jharkhand. *The International Journal of Indian Psychology,* 7(3), 776-787.

Rupvath, R. (2016). Tribal Education: A Perspective from Below. *South Asia Research,* 36 (2), 206-228.

Saha, R. (2021). Socio- Economic Condition of Tribal People: A Study on Uttar Dinajpur District of West Bengal. *IJCRT,* 9 (12), 659-661.

Saha, R. (2021). Socio-Economic Condition of Tribal People: A Study on Uttar Dinajpur District of West Bengal. *International Journal of Creative Research Thoughts,* 9(12), 659-661.

Samanta, S. (2021). Attitude towards Girls' Education and Socio-Economic Status of the Tribal Village in W. B. *IJCRT,* 9(1), 2624-2631.

Saren, G. (2013). Impact of Globalization on the Santals: A Study on migration in West Bengal, India. *IJHSSI,* 2(7), 29-33.

Sen, M. (2018). Tribal Development: A New Vision for Transforming India. *IJRSR,* 9 (12 E), 30118-30121.

Sen, M. (2018) Socio-Cultural Transformation of Santhals in Bolpur Shantiniketan of Birbhum district, West Bengal. *IJCRT,* 9 (3), 3117-3126.

Sharma, P., & Bera, S. (2018). A Comparative Study about Scheduled Tribe in West Bengal, India. *IOSR-JESTFT,* 12 (2), 10-15.

Soren, D. D. L., & Mondal, S. (2019). An Analytical Study of Inter District Tribal Development of Dakshin Dinajpur district, West Bengal. *JHSSS,* 1(5), 39-52.

Talukdar, D., & Mete, J. (2021). Social Media in Changing the Culture of Tribal Community in West Bengal. *ACCESS*, 6 (5), 164-174.

ঘোষ, ফটিকচাঁদ (২০১৯)। ‘ডুলুং’, *মেদিনীপুরের নদ-নদী কথা,* মাইতি, তাপস (সম্পাদনা), পৃঃ ১৭০-১৮৩।

টুডু বুদ্ধেশ্বর, *সাঁওতাল মহান পরম্পরায় অনুসন্ধানে ব্যস্ত এক মহান জাতির কথা,* পৃষ্ঠা– ৩০, পৃষ্ঠা– ১০৪-১১৭।

বড়পন্ডা, কুমার (২০১৯)। তারাফেনী, *মেদিনীপুরের নদ-নদী কথা,* মাইতি, তাপস (সম্পাদনা)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুশ্রী। ভারতবর্ষের আত্ম পরিচয় (পূর্ব) । *ভারত চিন্তাঃ ভারতের স্বরূপ সন্ধান।* পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান (২০১২) । *প্রসঙ্গ আদিবাসী।* Concept Publishing Company Private Limited, New Delhi.

মাইতি, চন্দ্র (১৪১০)। মেদিনীপুর জেলার প্রস্তর যুগের নিদর্শন: একটি আলোচনা। পশ্চিমবঙ্গ, *মেদিনীপুর জেলার সংখ্যা,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

মান্ডী কলেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল পূজো পার্বণ,* পৃষ্ঠা- ৪-৬৬।

সারাংশ (Summary)

সারাংশ (Summary)

প্রথম-অধ্যায়

১.১ ভূমিকা:

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ২৪০-২৪২ বছর পূর্বে ল্যাটিন শব্দ "ট্রাইবাস" শব্দ বলতে বোঝাত টাইটেস, Ramnes, লুসেরস নামক তিনটি গ্রামীন গোষ্ঠীকে যারা রোম শহরের বাইরের বিভিন্ন গ্রামে থাকতেন। এই তিনটি গোষ্ঠী অর্থাৎ 'ট্রাই' থেকে 'ট্রাইবাস' শব্দের উৎপত্তি। 'আদিবাসী' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৩২ সালে ঝাড়খন্ড আন্দোলনের শুরুতে 'আদিবাসী' শীর্ষক পত্রিকায়। জয়পাল সিং ঝাড়খন্ড আন্দোলনের প্রথম সারির অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি 'Scheduled Tribe' শব্দের পরিবর্তে আদিবাসী শব্দটিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, যদিও বাবাসাহেব আম্বেদকরের আপত্তিতে তা তখন সম্ভব হয়নি। আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষেরা সাধারণত যথেষ্ট দরিদ্র হন। অমর্ত্য সেন (২০২০, বিখ্যাত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ) লিখেছেন যে, দলিত ও অন্যান্য পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর মানুষেরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে খুবই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আছে। আর তার চাইতেও খারাপ অবস্থায় আছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী।

আর্যরা ভারতবর্ষে আসার পূর্ব থেকেই আদিবাসীরা ভারতবর্ষে বসবাস করতেন। তাঁরা নিজেদের মত করে একটি সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, যদিও সম্ভবত প্রথম মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন ফসিলস্ টি পাওয়া গেছে আফ্রিকাতে। ঐতিহাসিকদের মতে ওই ফসিলস্ এর বয়স আনুমানিক ৩.৩-৩ লক্ষ বছর পূর্বের। এই গোষ্ঠীর মানুষেরা কয়েক লক্ষ বছর আফ্রিকাতেই বসবাস করতেন। আজ থেকে ৭০-৭৫ হাজার বছর আগে খাবারের

খোঁজে একদল মানুষ আফ্রিকা ছেড়ে বাইরের দিকে এগোতে শুরু করেন, মনে করা হয় যে এরাই ছিলেন সমস্ত মানুষের পূর্বজ (বন্দোপাধ্যায়) ।

পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে অসুর নামক উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের বসবাস রয়েছে। মূলত চা বাগান এলাকায় এবং ডুয়ার্সের তরাই অঞ্চলের জঙ্গলের মধ্যে এরা বসবাস করেন। অসুরদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে 'আসুরিন'। কিন্তু বর্তমানে অসুর সম্প্রদায়ের খুব কম মানুষ নিজেদের ভাষায় কথা বলেন বা বোঝেন। অসুর সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষের একটি অতি প্রাচীন আদিবাসী সম্প্রদায়। ঋকবেদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে অসুর শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

আদিবাসী জীবন ও প্রকৃতির উপর আধুনিক সভ্যজগৎ নিরন্তর নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে চলেছে। কিন্তু তবুও আদিবাসীদের মধ্যে এখনো দেখা যায় প্রকৃতি এবং মানুষের সহ সম্পর্কের লালনকে। আদিবাসীরা প্রকৃতির সঙ্গে সহজীবী পরিবেশ সুরক্ষা করে আজও।

আদিবাসীরা জঙ্গলকে নষ্ট না করে জঙ্গলের উপবৃত্ত অথবা অপ্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করেন জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রেখে। অরণ্য, ভূমি, নদী ও বিস্তীর্ণ প্রকৃতির বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার পেয়েও আজও আদিবাসীরা ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে অনাহার, দারিদ্র ও নিরক্ষরতা কে বরণ করে নিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রতি ১০ জন আদিবাসীর মধ্যে ৪ জনই নিরক্ষর, এবং প্রতি ১০০ জন আদিবাসী শিশুদের মধ্যে ৩৭ জনের মৃত্যু হয়। এই শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ আদিবাসী সমাজের দারিদ্র্য, অনাহার এবং অবশ্যই নিরক্ষরতা।

ভারতবর্ষ একটি বহু জাতির দেশ। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রায় ৬৬৫ ধরনের আদিবাসী মানুষ ভারতে বসবাস করে থাকেন। তাঁরা হলেন- অসুর, মুন্ডা, ওঁরাও, মেছ,

রাভা, গারো, কোড়া, টোটো, সাঁওতাল প্রভৃতি। এই সকল আদিবাসী মানুষেরা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিছিন্ন হয়ে পৃথক পরিবেশে বসবাস করেন। ভারতবর্ষে আদিবাসীরা হলেন সমাজ বহির্ভূত সম্প্রদায়। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসীরা ভারতবর্ষে বসবাস করেন। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতবর্ষে বসবাস করেন ১০.০৩ কোটি আদিবাসী মানুষ, যা ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৮.৩%। এদের মধ্যে ৮৯.৯৭% মানুষ বসবাস করেন গ্রামাঞ্চলে এবং ১০.০৩% মানুষ বসবাস করেন শহরাঞ্চলে। ভারতবর্ষের প্রতি ১০০০ জন আদিবাসী পুরুষের মধ্যে আদিবাসী মহিলার সংখ্যা ৯৯০ জন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ ধরনের আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে জানা যায়। এদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ সব থেকে বেশি বসবাস করেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাঁওতালরা অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন।

২০১১ এর আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী মানুষের সংখ্যা হল ৫২,৯৬,৯৫৩ জন, যেখানে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ২৫,১২,৩৩১ জন। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের সাক্ষরতার হার ৪৩.৪%। যেখানে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৫৭.৪% এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ২৯.২%। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ধরনের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের সাক্ষরতার হার মোট ৪২.২%। এর মধ্যে পুরুষদের সাক্ষরতার হার ৫৭.৩% এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ২৭%।

সাঁওতালদের বসবাসের স্থানের সংকুলান খুবই সীমিত। এদের সংস্কৃতি, নিয়ম-কানুন, ধর্ম এগুলিই এদেরকে অন্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা করে। সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে।

ডঃ ডি. এন. মজুমদার এর মতে সাঁওতালরা হলেন অনেকগুলি পরিবারের মিলিত রূপ যেখানে সদস্যরা একই জায়গায় বসবাস করেন। একই ভাষা বলেন, একই ধরনের কাজকর্ম করে থাকেন এবং একই ধরনের নিয়মকানুন মেনে চলেন।

সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা সাঁওতালি ভাষা নামে পরিচিত। এই ভাষা মুন্ডা, হো, মাহালি, ভূমিজ, এবং খেড়িয়া ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। Peter W. Schmidt এই ভাষাগোষ্ঠী কে Austro-Asiatic ভাষাগোষ্ঠী বলে শ্রেণিকরণ করেছেন। সাঁওতালি ভাষা যেমন মুন্ডাপরিবারের ভাষার অন্তর্গত তেমনি অন্যান্য ভাষা গুলিকে নৃতত্ত্ববিদ্যায় শ্রেণিকরণ করা হয়েছে- Pre- Dravidians, Kolarians, Dravidians, Proto- Astraloids, Nishadies, and Austric প্রভৃতি। সামান্য কিছু বছরের মধ্যে সাঁওতালরা তাঁদের সাঁওতালি ভাষার লিপিকে উন্নত করেছেন, যা "অলচিকি" নামে পরিচিত।

স্বাধীনতার উত্তরযুগে এমনকি স্বাধীনতার পূর্বযুগে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকালেও সমস্ত ভারতীয়দের মধ্যে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন উপজাতি সম্প্রদায় তাঁরা একদিকে যেমন ব্রিটিশদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন তেমনি অপরদিকে উচ্চজাতির মানুষেরাও সমান ভাবে অত্যাচার করে গেছেন। তাঁদের না আছে নিজস্ব বসবাসের স্থান, জমি, তেমনি তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত সঙ্কুল। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী, তবুও এই সমস্ত কিছুর পরেও সমস্ত ধরনের উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতালরা তুলনামুলুক ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনীতিতে এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

সাঁওতাল সমাজের অর্থনৈতিক নকশা লক্ষণীয়। এঁদের নিজেদের মধ্যে সংহতি আছে এবং জাতিগতভাবে এঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়। এঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধানত কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। এঁরা বাইরের সম্প্রদায়ের সাথে ব্যাবসা-বানিজ্যও করে থাকেন। এতদ্ সত্ত্বেও সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে অনেক দুর্বল। প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এঁদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। এঁদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি প্রাকৃতিক উৎস নির্ভর। ফলে এঁদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উন্নতি সীমিত। পূর্ববর্তী রীতি বজায় রেখে এঁরা একই ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদের মধ্যে নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। এঁরা বাইরের সমাজ থেকে বিছিন্ন থাকতে এবং একই রকম ভাবে যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তিত জীবন যাপন করতে পছন্দ করেন। বিশ্বজিৎ পাল ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিভিন্ন উপজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে নিরীক্ষণ করেন, যেখানে তিনি এই উপজাতিদের জীবনধারণের ধরণ, বাসস্থান, নিয়ম-কানুন গুলিকে লক্ষ্য করেন। গবেষণায় তিনি চারটি ভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক আচরণ কে লক্ষ্য করেন।

আদিবাসী সমাজে আদিবাসীদের উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। কারন তাঁদের বসবাসের মান খারাপ। ক্ষুধা, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যসমস্যা প্রাত্যহিক জীবনের সাথে জড়িত। নিরক্ষরতা, বেকারত্বের অভিশাপ আদিবাসী সমাজের রোজনামচা। যেকোনো উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, তার সাথে প্রয়োজন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি। পরিবর্তনের আধুনিক প্রক্রিয়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত হয় শিল্পায়ন, নগরোন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নতি প্রভৃতি। উপজাতি সম্প্রদায় এতদ্

সত্ত্বেও উন্নয়নের সুফল প্রাপ্তি থেকে বহুদূরে রয়েছে। দেশ নির্মাণ এবং সুনাগরিক তৈরীর জন্য শিক্ষা একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় বিষয়। মানবীয় সংস্থানের উন্নতির জন্য শিক্ষা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। শিক্ষা মানুষকে দেয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং চরিত্র। স্বাধীনতার পরে ভারত সরকারের সাক্ষরতা মিশন 3RS (Reading, Writing and Arithmetic) এর ওপর জোর দিয়েছেন এবং রাজ্যসরকার গুলিকে নীতি নির্দেশ মেনে জনগণের চাহিদা পুরনের জন্য সক্রিয় হতে বলেছেন। শিক্ষা হলো ক্ষমতায়নের সামনের দরজা। এটি মহিলাদের ক্ষমতায়নের কার্যকরী সরঞ্জামও বটে। সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার হার অন্যান্য উচ্চ জাতির মানুষদের তুলনায় অনেক কম এবং তাঁদের পড়াশোনার প্রতি অনীহা দেখা যায়। বেশিরভাগ সাঁওতাল মহিলারা বাড়ির বাইরে কাজ করেন এবং তারা বিভিন্ন ধরনের দিনমজুরির কাজের সাথে যুক্ত থাকেন। অল্পবয়সী মেয়েরাও তাদের মায়ের সাথে বাড়ি থেকে অনেক দূরে কাজ করতে যায়। বেশিরভাগ সময় তারা প্রত্যহ স্কুলে যেতে পারে না বা যেতে চায় না এবং স্কুলছুট হয়। গরিব পরিবারের পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে চান না কারণ বাচ্চারা তাদেরকে বাড়ির কাজে সাহায্য করে ফলে বাড়ির মহিলারা তাদের পারিবারিক কাজের চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

১.২ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য :

আদিবাসীদের সমাজ প্রাচীন যুগ থেকে মোটামুটি ভাবে অপরিবর্তিত। বিভিন্ন সময়ে বাইরের বিভিন্ন চাপের মুখে দাঁড়িয়েও আদিবাসী সমাজ এখনো তাদের প্রাচীন ধ্যান ধারণা গুলিকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য সক্রিয় হয়েছেন। বাইরের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুশাসন, খাদ্যাভ্যাস, জীবন চর্চা, বাড়ি-ঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংগীত-নৃত্য ইত্যাদি দ্বারা এখনো

পর্যন্ত সামাজিকভাবে এঁরা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হননি। স্বাধীনতা লাভের পর পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে গিয়ে কোন কোন আদিবাসী মানুষ নিজেকে কিছুটা পরিবর্তিত করলেও সামগ্রিকভাবে এখনো তাঁরা অপরিবর্তনীয়ই রয়ে গেছেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আদিবাসীরা জল, জঙ্গল, জমি, পাহাড় ইত্যাদির উপর আবহমান কাল ধরে নির্ভরশীল। তাদের এই নির্ভরশীলতা প্রকৃতির সঙ্গে তাদেরকে সহজীবি সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে। এখনো জমি চাষ, মাছ ধরা, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প ইত্যাদির উপর এরা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। জঙ্গল থেকে পরিবারের প্রয়োজনে জ্বালানি, শুকনো কাঠ, ঔষধি গাছ, ছাতু (মাশরুম), মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করলেও কোন ক্ষেত্রেই জঙ্গলকে এরা ক্ষতিগ্রস্ত করতে চান না। কারণ জঙ্গল, পাহাড়, ঝরণা, নদী এদের কাছে ঈশ্বরের থেকে পবিত্র দান হিসেবে স্বীকৃত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন কোন আদিবাসী পরিবার অর্থনৈতিকভাবে চিরাচরিত ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে গেলেও সামগ্রিকভাবে এখনো আদিবাসী সমাজ চিরাচরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরা তুলনামূলকভাবে উন্নত হলেও এখনো চূড়ান্ত দারিদ্র্যের শিকার। এরা যে সকল স্থানে বসবাস করেন সেখানে উন্নত পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ সংযোগ, চিকিৎসার সুযোগ, এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রায়শঃই পাওয়াই যায় না। এদের অধিকাংশ জনই আধুনিক প্রযুক্তি সমূহ যেমন দূরদর্শন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির ব্যবহার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এতদ্ সত্বেও এরা এখনো সঠিক ভাবেই এবং নিজেদের মতো করে নিজেদের জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যান। এদের জীবনের অন্যতম চালিকাশক্তি হল চিরাচরিত

সংস্কৃতি ও প্রথা সমূহ। ধর্মীয় অনুশাসন, জীবনযাপনের নীতিসমূহ, এবং সর্বোপরি সততা, এদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও ভাষা, অন্যান্য অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর থেকে অনেকাংশে পৃথক। পারস্পারিক যোগাযোগের জন্য এরা বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে থাকেন যেটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। তাই তাদের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে কতখানি পরিবর্তন এসেছে তার বিচার বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এটিও সত্যি কথা যে একটি সমাজের সংস্কৃতির অনুশীলনকে গাণিতিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। আবার একইভাবে বাইরে থেকে কোন কোন ধরনের সংস্কৃতি আদিবাসী সমাজের চিরাচরিত সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে তা বাইরে থেকে বলা সহজ নয়। একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতিকে জানতে গেলে সেই সংস্কৃতির একজন হয়ে উঠতে হবে। তাই বর্তমান গবেষিকা সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষা কে অনুধাবন করবার প্রচেষ্টা করেছেন ওই সমাজের একজন সদস্যা হিসেবে।

১.৩ গবেষণার প্রশ্ন :

১. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান কি?

২. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থান কি?

৩. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা কি?

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য :

১. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থাকে তুলে ধরা।

২. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাকে তুলে ধরা।

৩. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিক্ষার বর্তমান অবস্থাকে তুলে ধরা।

১.৫ সমস্যার বিবৃতি :

বর্তমান এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে Ethnography পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যাকে জানা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করা। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে মানুষের মধ্যে যান্ত্রিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চিরাচরিত রীতিনীতি ও প্রথাগুলির গুরুত্ব হারাচ্ছে। এর ফলে যে কোন সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আদিবাসী সমাজ বিশেষত সাঁওতাল সমাজেও এর ব্যতিক্রম পাওয়া যায় না। একদিকে সাঁওতাল সমাজের চিরাচরিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি, প্রথার প্রতি সাঁওতাল সমাজের আঁকড়ে থাকার প্রবণতা এবং অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বায়নের ও পাশ্চাত্যকরণের ঢেউয়ে সাঁওতাল যুবক যুবতীদের গা ভাসিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এই দুইয়ের মধ্যে সাঁওতাল সমাজের বর্তমান অবস্থাটিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

তাই বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যাটি হল- পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করা।

১.৬ গবেষণার সুযোগ :

বর্তমান গবেষিকা নিজে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর একজন সদস্যা হওয়ার কারণে এবং সাঁওতাল গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে তাঁদের সমস্যাগুলিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং পূর্বের গবেষণাগুলিতে সাঁওতালি সংস্কৃতি, ভাষা, চিরাচরিত নিয়ম-নীতি, প্রথা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মাচরণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষাগত সমস্যা নিয়ে যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা থাকার সম্ভাবনা ছিল সেই অভাব গুলি পূরণের জন্য বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা চেষ্টা করেছেন। তিনি সামগ্রিক কোন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেননি, বরঞ্চ অনুপুঙ্খ এবং জীবন্ত অভিজ্ঞতা গুলিকে তৃণমূল স্তর থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, যেখানে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর উঠে এসেছে। তাঁদের ভাবনা এবং মূল্যবোধ বর্তমান গবেষণায় স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১.৭ গবেষণার সীমা নির্দেশকরণ :

বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যাটি হল– “পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা”। একজন গবেষিকার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সমস্ত সাঁওতাল সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা প্রায়

অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানত ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মালদহ সহ উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি এলাকায় বহু সংখ্যক সাঁওতাল বসবাস করেন। তাই সমস্ত এলাকার সাঁওতালদের নিয়ে গবেষণা করা একক কোন গবেষণায় সম্ভব নয়। তাই এ সমস্যাটিকে নিয়ে গবেষণা করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে এর সীমারেখা নির্দেশ করণ প্রয়োজন বলে গবেষিকা মনে করেছেন। এই গবেষণার সীমায়িতকরণের ক্ষেত্রগুলি হল-

১. পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম কেবলমাত্র এই দুটি সাঁওতাল অধ্যুষিত জেলাকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২. সাঁওতাল সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে কেবলমাত্র তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির উপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. তথ্য সংগ্রহের জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি ব্লকের একটি করে সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রূপ মোট কুড়িটি গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. তথ্য সংগ্রহের জন্য সেমি- স্ট্রাকচারড সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ এবং Participatory Rural Appraisal (PRA) পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়-অধ্যায়: সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা

২.১ সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার উদ্দেশ্য:

গুহ, এবং ইসমাইল (মে-জুন ২০১৫) পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁদের গবেষণা পত্রটির শিরোনাম- "Socio-cultural changes of tribes and their impacts on environment with special reference to santal in West Bengal" গবেষকরা তাঁদের গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি গড়ে তোলেন- ১. আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক- সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ওপর আলোকপাত করা। ২. আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতি, সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং প্রসারের ওপর আলোকপাত করা। ৩. আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতি এবং শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাধার রূপরেখা তৈরি করা। গবেষক এই গবেষণা পত্রে আগেই উল্লেখ করেছেন পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল জাতি একটি বৃহৎ সম্প্রদায়। তাঁদের জীবনের একটি বড় অংশ হল তাঁদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা এবং কারুকার্য। তাঁরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে বছরের সমস্ত সাংস্কৃতিক উৎসব গুলি পালন করেন। তাঁরা নিজস্ব গান, নাচ, এবং বাজনা যেগুলি ধামসা, মাদল নামে পরিচিত এগুলির মাধ্যমে উৎসবে আনন্দ করেন। তাঁদের নিজস্ব ভাষা সাঁওতালি এবং বাংলা ভাষাতেও তাঁরা যথেষ্ট সাবলীল। এঁরা ভীষণই শান্তপ্রকৃতির হয়ে থাকেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন।

ডঃ সরেন, (জুলাই ২০১৩) সাঁওতাল জাতির স্থানান্তর সম্পর্কে একটি গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণা পত্রটির শিরোনাম- "Impact of globalization on the santals: A study on migration in West Bengal, India." গবেষক তাঁর গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য

ঠিক করেছেন - ১. সাঁওতাল গোষ্ঠীদের মধ্যে দেশান্তরের ফলে তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষিকাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাজনীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করা। গবেষক এই গবেষণা কর্মটিকে সম্পাদন করার জন্য মোট ১৪৭ জন নমুনার কাছ থেকে field survey এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষক তাঁর গবেষণার ফলে নিম্নের বিষয়টি খুঁজে পেয়েছেন- স্থানান্তর সাঁওতালদের ঐতিহ্য কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন আনে।স্থানান্তর তাদের চাষবাসের ধরণ, রান্না খাওয়ার অভ্যাস, ভাষা, পোশাক, পরিচ্ছদ, রাজনৈতিক সচেতনতা, সঞ্চয়ের অভ্যাসকে প্রভাবিত করে। স্থানান্তর যখন গ্রাম থেকে শহরে হয়, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের শিশুদের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে, উচ্চমানের স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তোলে। বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার যেমন-ডাইনি প্রথা, ওঝা, গুনিন প্রভৃতি ধারণা থেকে বেরিয়ে আসে।

শ্রীমতি সেন (৩ মার্চ, ২০২১) বীরভূমের সাঁওতালদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- “Socio cultural transformation of santal in Bolpur, Shantiniketan of Birbhum district, West Bengal.” গবেষিকা তাঁর গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি গড়ে তোলেন- ১. সাঁওতালদের জীবন যাত্রার সাম্প্রতিক পরিবর্তন নিরূপণ করা। ২. শান্তিনিকেতনের আশ্রম এর সাথে সাঁওতালরা কতটা জড়িত। ৩. শান্তিনিকেতনের ইতিহাস জানা। গবেষিকা তাঁর এই গবেষণা কর্মটিকে সম্পাদন করার জন্য মোট ৩২৮ জন নমুনার কাছ থেকে প্রশ্নাবলী, নিরীক্ষণ, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ এবং এই জাতির বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

তাঁর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল হল - সাধারণভাবে সাঁওতালদের জীবন যাত্রা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য পরিচালিত হয় ওই স্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা। বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাঁওতালরা প্রকৃতি এবং শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সাথে ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। যা প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনার মাধ্যমে, বিশ্বায়ন এবং প্রকৃতিবাদের দর্শনে বিশ্বাস করে। বিশ্বায়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শান্তিনিকেতনের আশ্রম অন্যান্য স্থানের সাঁওতালদের মত তাদের কে আলাদা করে রাখেনি। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও এই অঞ্চলের সাঁওতালদের সাদরে গ্রহণ করেছে। বিশ্বভারতীর সাথে সাঁওতালদের সম্পর্ক শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য নয়, বরং শান্তিনিকেতন সাঁওতালদেরকে প্রশিক্ষণ দেয় বিভিন্ন রকম শিল্প কলা এবং বিশ্বভারতীর গ্রামীণ পুনর্নির্মাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে। যেটা তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রার অভ্যাসকে পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সাঁওতালদের থেকে তাদেরকে আলাদা করে।

আহমেদ, এবং তত্ত্বসারানন্দ (২০১৯) ঝাড়গ্রাম এর সাঁওতালদের আধুনিকতা এবং শিক্ষার উপর একটি গবেষণা করেছেন যার শিরোনাম হলো - "Modernization and the educated and non-educated santals of Jhargram: ethnographic study."

গবেষকগণ তাঁদের গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন - আধুনিকতার প্রসঙ্গে শিক্ষিত সাঁওতাল এবং অশিক্ষিত সাঁওদের মধ্যে সম্পর্ক। গবেষকগণ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য PRA, participant observation, FGD, semi-structured interview schedule, ঘরোয়া এবং পারিবারিক নিরীক্ষণ এর মাধ্যমে ৪৯৬ জন নমুনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পারিবারিক নিরীক্ষণ এর মাধ্যমে গবেষকগণ শিক্ষিত

সাঁওতাল এবং অশিক্ষিত সাঁওতালদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। গবেষণায় খুঁজে পাওয়া গেছে যে গবেষণা স্থলে অশিক্ষিত সাঁওতালদের তুলনায় শিক্ষিত সাঁওতালরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে উন্নতিকরণ প্রক্রিয়া, যন্ত্রপাতি, এবং নতুন দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

মিশ্র (নভেম্বর, ২০১৪) মালদা জেলার সাঁওতালদের শিক্ষামূলক সচেতনতার উপর একটি গবেষণা করেছেন যার শিরোনাম হলো – "Educational awareness of tribal people (santal) in Malda district, West Bengal."

গবেষক তাঁর গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন- ১. মালদা জেলার সাঁওতালদের বসবাসের ধরন, শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্তি, শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ- সুবিধা, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা, সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধা এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপ করা। ২. গবেষণাপত্রে উল্লিখিত স্তর অনুযায়ী চল গুলির মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা।

গবেষক তাঁর গবেষণা কাজের জন্য ১০০ জন্য নমুনার কাছ থেকে interview scale for assessing educational awarness of Santali people, এবং structural interview scale এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষক তাঁর গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয় গুলি খুঁজে পেয়েছেন - ১. শিক্ষা ক্ষেত্রে সচেতনতা আনার জন্য গবেষণাপত্রে যতগুলি মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছিল সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য তার প্রত্যেকটা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ২. উন্নত সাক্ষাৎকার স্কেল এর সাহায্যে অভিপ্রেত চল গুলিকে মাপা হয়েছে এবং এটি স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখে বিন্যাস হয়েছে।

মন্ডল (ডিসেম্বর, ২০১৮) আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন, গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হলো- "Socio economic status of tribal people Mukundapur village, West Bengal. "

গবেষিকা তাঁর গবেষণার জন্য উদ্দেশ্য ঠিক করেছেন- ১. সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করা যা আদিবাসীদের ভিন্ন অবস্থান তৈরি করে। ২. তাদের শিক্ষার সমতা এবং আয় এর সমতা মূল্যায়ন করা। ৩. তাদের জীবনধারণের কৌশলের উপাদানগুলি অন্বেষণ করা ৪.বর্তমান সমাজে তাদের ভূমিকা এবং অবস্থা নির্ধারণ করা।

গবেষিকা তাঁর গবেষণার জন্য ৫৭ টি বাড়ির উপর qualitative এবং quantitative method ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষিকা তার গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন যে বর্তমানে এই গ্রামের শিক্ষার অবস্থা নগণ্য, গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো ভীষণ জরুরী। এক্ষেত্রে সরকারের কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী প্রকল্প গুলির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তাদের শিক্ষার মান উন্নত হলে তাদের পেশার পরিবর্তন হবে এবং আয় এর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে।

দে (জুলাই-আগস্ট, ২০১৫) সাঁওতালদের ইতিহাস সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। যার শিরোনাম হল- "An ancient history: ethnographic study of the Santhal " গবেষক তাঁর গবেষণা পত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ঠিক করেছেন- ১. সাঁওতালদের জীবন যাত্রা খোঁজা। ২. সাঁওতালদের প্রকৃতি, অভ্যাস, সংস্কৃতি ও সমাজকে খুঁজে বের করা। ৩. সাঁওতালদের ঐতিহ্য বহনকারী জীবনযাত্রা এবং পরিবর্তনশীল জীবন যাত্রার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের

করা। ৪. সাঁওতাল জাতিসমূহের বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ খোঁজা। ৫. সাঁওতালদের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে বের করা।

গবেষক এই গবেষণা কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য descriptive method ব্যবহার করেছেন। গবেষক গবেষণা কাজটি শেষ করার পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে খুঁজে পেয়েছেন - সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনের মান আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। শিক্ষার প্রসার এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার তাদেরকে নতুন চাষের পদ্ধতি, রান্নার ধরণ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, পোশাক, রাজনৈতিক সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়ে পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। গ্রাম থেকে মানুষ যখন শহরে যায় তখন তারা বুঝতে পারে তাদের বাচ্চার জন্য শিক্ষা কতটা জরুরি, তারা উন্নত স্বাস্থ্য গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন কুসংস্কার যেমন ডাইনি প্রথা, ওঝা প্রভৃতি বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসে।

সাহা (১২ ডিসেম্বর, ২০২১) উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর গবেষণা করেছেন। শিরোনাম হলো – “Socio economic condition of Tribal people: A study on Uttar Dinajpur district of West Bengal. "

গবেষক তার গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন- **১.** উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান খুঁজে বের করা। ২. উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীদের কাজে অংশগ্রহণের হার দেখা। ৩. এই জেলার আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা গুলি কে খুঁজে বের করা।

গবেষক এই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সরকারি রিপোর্ট, জার্নাল, বই এবং ২০১১ এর আদমশুমারি প্রভৃতির সাহায্য নিয়েছেন। এই গবেষণায় প্রধানত descriptive method ব্যবহার করেছেন।

গবেষক এ গবেষণাটি করে নিম্নলিখিত ফলাফল টি খুঁজে পেয়েছেন যে, উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসীরা সামাজিক অর্থনৈতিকভাবে ভীষণ পিছিয়ে আছে। শিক্ষার হার, শিক্ষার প্রতি অনীহা এবং সচেতনতা না থাকার জন্য আদিবাসীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন হচ্ছিলেন। ২০১১ এর আদমশুমারিতে দেখা গেছে এখানকার আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসী মানুষেরা উন্নয়নের পথে চলতে শুরু করেছেন। তাঁদের নিজস্ব চেষ্টা এবং শক্তি ভীষণ জরুরি তাদের ভালো থাকার জন্য।

দত্ত এবং বিশাই (২০২০) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় এবং শিক্ষার প্রবণতা সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্র টির শিরোনাম হল - "Literary Trends and Difference of Schedule Tribes in West Bengal : A Community Level Analysis."

গবেষকবা এই গবেষণা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি ঠিক করেছেন - ১. পশ্চিমবঙ্গের জাতিগত সম্প্রদায়ের বর্তমানে শিক্ষার প্রবণতা বিশ্লেষণ। ২. পুরুষ এবং মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণের হার এর মধ্যে পার্থক্য। ৩. বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী মহিলাদের শিক্ষাগত অবস্থান উল্লেখ করা।

গবেষকদের গবেষণাটি করার জন্য Effectively Literary rate এবং Literary Growth Rate মেথড ব্যবহার করেছেন।

গুহ এবং দাস (২০১৩-২০১৪) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের শিক্ষাগত উন্নতি সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- "Educational Advancement of Schedule Tribe in West Bengal (1947-2011)".

গবেষকদ্বয় তাঁদের গবেষণা পত্রে খুঁজে পেয়েছেন যে শিক্ষায়ই আদিবাসী উন্নয়নের চাবিকাঠি। পশ্চিমবঙ্গে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত শিক্ষামূলক পরিকল্পনার ফলে এই রাজ্যের তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়গুলি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি করেছে। তারপরও এখানে উল্লেখ্যে যে এই উন্নতিতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না, কারণ শিক্ষার অগ্রগতির পেছনে অনেক কারণ রয়েছে তাই এখন সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো দ্রুততার সাথে আদিবাসী সমাজকে অবগত করা যার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তফসিলি উপজাতিরা অন্তত আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য উন্নত অংশের সমতুল্য হয়ে উঠতে পারে। ১১ টি পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়েছে। তবুও আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার উন্নয়ন একেবারেই ধীর, সুতরাং শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা এবং উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও ছাড় দিয়েও কেন তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় তার কারণ খুঁজে বের করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

চক্রবর্তী, ঘোষ এবং পান্ডা (২০১৯) পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল- "Unravelling the Socio-Economic Condition of Tribal Peoples in West Bengal". এই গবেষণা কাজটি

সম্পন্ন করার জন্য গবেষকগণ নিম্নলিখিত মেথডের ব্যবহার করেছেন- (১) identification of respondent, (২) identification of Civil and economic condition, (৩) education of the respondent's response to construct the social economic condition through ranking and voting.

গবেষকগণ এই গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন যে - আদিবাসী ও উপজাতীয়দের অধিকার সারা বিশ্বে প্রায় সব ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক আন্দোলন গত কয়েক দশকে গতি লাভ করেছে ILO, এর দ্বারা পরিবর্তিত পরিবর্তনের মাধ্যমে। আদিবাসী আন্দোলন পরবর্তীকালে UNDRIPS এর সাথে একটি উল্লেখযোগ্য স্তরে পৌঁছেছে। ১৬৯ নম্বর কনভেনশন এর ৩০ বছর পর শুধুমাত্র ২৩ টি দেশ কনভেনশন টি অনুমোদন করেন। বেশিরভাগ স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মতো ভারত এই কনভেনশনটি অনুমোদন করেনি এবং এখনো সেকেলে ILO (১০৭) নিয়ে চলেছে যা একটি ঐতিহাসিক ভুল হিসাবে সমালোচিত হয়েছিল। বেশিরভাগ দেশের মতো ভারতও UPR জমা দিতে বাধ্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত UPRS এর কোনটিতে ভারতে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে না। এই গবেষণাটিতে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। কর্মচারী,সমাজকর্মী, এনজিও পেশাদারদের কিছু উপলব্ধি ও উন্নয়ন প্রকল্প এবং জীবিকার আরো ভালো বাস্তবায়নের মধ্যে সুপারিশের একটি সেট অনুসরণ করা হয়েছে।

২.২ গবেষণার খামতি/ শূন্যস্থান চিহ্নিতকরণ:

পশ্চিমবঙ্গে যে ৪০ প্রকারের আদিবাসী রয়েছেন সাঁওতাল গোষ্ঠী তাদের মধ্যে অন্যতম। আদিবাসীদের মোট জনসংখ্যার বিচারে সাঁওতালদের সংখ্যা সর্বাধিক। তাই আদিবাসীদের উপর যে সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ এবং নৃতাত্ত্বিকরা গবেষণা করেছেন তাদের একটি বড় অংশ সাঁওতালদের বিষয়ে গবেষণাতে যুক্ত হন। গবেষিকা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপর বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষিকা গবেষণা হয়েছে। ৪৯ টি সংশ্লিষ্ট গবেষণা পত্রকে দীর্ঘকাল ধরে পাঠ করেছেন। তার অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণায় অভাব রয়েছে সেই বিষয় চিহ্নিত করনের চেষ্টা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপর খুব বেশি গবেষণা হয়নি এবং যা হয়েছে তাও খণ্ডিত। এই খন্ডিত চিত্রগুলিকে একত্রিত করে উল্লিখিত দুটি জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সমাজ-সাংস্কৃতিক, আর্থিক অবস্থা এবং শিক্ষার চিত্র অংকন করা সম্ভবপর নয়, কারণ সমাজ এবং সংস্কৃতি যেমন পরস্পর গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে, ঠিক তেমনি করে সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও একটি স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আবার সমাজ- সংস্কৃতি এবং সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা যেকোনো সমাজের বিশেষত আদিবাসী সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। অথবা এভাবেও বলা যায় যে আদিবাসী সমাজে শিক্ষার প্রকৃত অবস্থান নির্ধারিত হয় তার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা। তাই বর্তমান গবেষিকা পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সমাজের সামাজিক-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক এবং

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন এবং নিম্নলিখিত গবেষণার শিরোনামটি প্রস্তুত করেছেন- "পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা"।

তৃতীয়-অধ্যায়ঃ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের সম্পর্কে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ সমূহ:

৩.১ উডের ডেসপ্যাচ:

ব্রিটিশ সরকারের বোর্ড অফ কন্ট্রোল এর সভাপতি স্যার চার্লস উড মনে করতেন যে ভারতে সার্বিকভাবে শিক্ষার বিস্তার করলে ইংরেজ সরকারের এদেশের স্থায়িত্বের কোন আশঙ্কা থাকবে না। বরঞ্চ এদেশের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজ ইংরেজদের স্থায়িত্বের পক্ষে সহায়ক হবে। তাই স্যার চার্লস উডের নির্দেশে একটি মূল্যবান শিক্ষা দলিল রচিত হয় ১৮৫৪ সালে। যেহেতু স্যার চার্লস উডের নির্দেশে এই শিক্ষা দলিল রচিত হয়েছিল তাই একে উডের ডেসপ্যাচ বলা হয়।

উডের ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে যে ব্রিটিশ সরকার এ যাবৎ ভারতবর্ষের সার্বিক জন শিক্ষার সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেননি। বরঞ্চ জনশিক্ষাকে অবহেলাই করে গেছেন। জনশিক্ষা বলতে আপামর সাধারণ মানুষের শিক্ষাকে বোঝায়। এই সাধারণ মানুষ বলতে মূলত ভারতবর্ষের তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষকে বোঝানো হয়। বাস্তবিকই ব্রিটিশ সরকার মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চ জাতির উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ এবং শক্তি ব্যয় করেছেন। ফলে সাধারণ জনগণের বিশেষত তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে। অর্থাৎ 'চুঁইয়ে নেমে আসা নীতি' (Filtration Theory) এর নিন্দা করা হয়েছে উডের ডেসপ্যাচে। উডের ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে যে সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক প্রচেষ্টা না থাকলে এই বিশাল দেশের পিছিয়ে পড়া জন সম্প্রদায়ের জন্য উন্নত গুণমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র বেসরকারি

প্রচেষ্টায় সাফল্য আসতে পারেনা। এর জন্য উডের ডেসপ্যাচ এ বলা হয়েছে প্রতিটি জেলার বিভিন্ন স্থানে সাধারণ জনগণের জন্য একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এবং এইগুলি হবে মূলত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশীয় স্কুলগুলির মান উন্নত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বিশেষত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনার জন্য এবং তাদেরকে ধরে রাখার জন্য নিয়মিত ছাত্র বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং উডের ডেসপ্যাচে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে গণশিক্ষার বিস্তারের স্বপক্ষে বলা হয়েছে। যার মধ্যে তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

৩.২ স্ট্যানলি ডেসপ্যাচ (১৮৫৭):

স্ট্যানলির শিক্ষানীতি বিষয়ক ডেসপ্যাচে উডের ডেসপ্যাচ কে সমর্থন করা হয়েছে। এবং তিনি গণশিক্ষা বিস্তারের পক্ষ গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে স্ট্যানলি পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রাথমিক শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন। ভারতের নিজস্ব দেশজ শিক্ষার ধারাকে তিনি বুঝতে পারেননি।

৩.৩ হান্টার কমিশন (১৮৪২):

হান্টার কমিশন বা ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে বলা হয়েছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্নদের ক্ষেত্রে বেতন গ্রহণের স্বপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। একইসঙ্গে শিক্ষা বোর্ড পরিকল্পিত বা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের দরজা কে সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। হান্টার কমিশন

বুঝেছিলেন জাতিভেদ প্রথার কুফল গুলিকে। তাই তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই কমিশন সুস্পষ্ট মতামত ব্যাখ্যা করেছেন।

৩.৪ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ (১৯৬৪-১৯৬৬):

ভারতের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত। তাদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ গুলি হল –

১. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের শিক্ষার বিষয়ে যে সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেগুলিকে বহাল রাখতে হবে এবং এই সকল সুবিধাকে আরো বাড়াতে হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অনুন্নত শ্রেণি বিশেষত আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। জনবিরল অঞ্চলে বিশেষত বনাঞ্চলে আদিবাসী শিশুদের জন্য আশ্রমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৩. আদিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ও ডে স্কুল সেন্টারের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৪. তপশিলি সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা যাতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর সম্পূর্ণ করতে পারে সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

৫. তপশিলি উপজাতির শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঙ্গনে আগ্রহী করতে এবং ধরে রাখতে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাতে বহুল পরিমাণে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান করেন সে বিষয়ে

কমিশন দৃঢ় মতামত দিয়েছেন। কারণ পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর আদিবাসী ছেলে মেয়েরা অতিরিক্ত তাত্ত্বিক বিষয়কে সহজে গ্রহণ করতে এবং ধরে রাখতে পারে না।

৬. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের জন্য সংগঠন তৈরি করতে হবে। যেখানে প্রথম সাধারণ শিক্ষিত মানুষ তার দায়িত্ব নিলেও ধীরে ধীরে উদ্যোগী এবং মেধাবী যুবকদের এই কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। আদিবাসী যুবকরাই আদিবাসী এলাকায় শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকে বিকশিত করতে সমর্থ হবেন।

৭. যাযাবর এবং অর্ধ যাযাবর শ্রেনীর ছেলে মেয়েরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকার তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত উন্নয়নে সচেষ্ট হবেন।

৩.৪.১ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর ব্লকের গগনাশুলি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী গগনাশুলি গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল গগনাশুলি গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - বিভিন্ন জায়গাতে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে হোস্টেল আছে এই গ্রামের কিছু ছেলে মেয়ে সেখানে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছে।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেছে যার ফলে এই গ্রামের ১০ জন ছেলে-মেয়ে কলেজ স্তরের শিক্ষা শেষ করেছে। ৩ জন কলেজ যাচ্ছে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্রছাত্রীরা কিছু কিছু শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পেয়েছে।

৬. সংগঠন পরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের সচেতনতা এবং ছেলেমেয়েদের সচেতনতার জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

৩.৪.২. তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে কোঠারি কমিশনের অভিমত অনুয়ায়ী ঝাড়গ্রাম জেলার বড়াশুলি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - কোঠারি কমিশনের এই সুপারিশ অনুযায়ী বড়াশুলি গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলি শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সেই সুযোগ-সুবিধা বহাল আছে। এই সুযোগ সুবিধা আগের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি পাচ্ছে বলে গ্রামের মানুষের মতামত।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল বড়াশুলী গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেল নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেনি যার ফলে এই গ্রামের ২০-২৫ জন স্কুলে যায়। এই গ্রামে চারজন স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এবং এদের মধ্যে দুজন মহিলা আছে। সঠিক গাইডেন্স এর অভাবে অচিরেই ছেলেমেয়েরা স্কুলছুট হয়ে যায়।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - ছাত্র ছাত্রীরা কেউই কোন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পায়নি।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাবের জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি।

৩.৫ জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এর সুপারিশ সমূহ:

তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতিতে নিম্নলিখিত সুপারিশ গুলি করা হয়েছে-

১. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের এলাকাগুলিতে গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। যাতে দূরত্বের কারণে তপশিলি উপজাতির শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় বিমুখ হতে না পারে।

২. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীরা তাদের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা সহ ইংরেজি ভাষাকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনা। এই কারণে এদের মধ্যে স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা অধিক, তাই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীদের যতখানি সম্ভব তাদের

মাতৃভাষায় পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা যাতে আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. তপশিলি উপজাতিদের জন্য পাঠক্রম রচনা করতে হবে উপজাতীয় ভাষাতে। তাই উপজাতীয় ভাষাতে বই রচনা করতে পারলে এই সকল শিক্ষার্থীরা অধিক আগ্রহী হবে।

৪. আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় ও আশ্রমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উপরে গুরুত্ব সহকারে সুপারিশ করেছেন জাতীয় শিক্ষানীতি।

৫. তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত কারণে যেহেতু উচ্চ শিক্ষায় যেতে আগ্রহী নন তাই তাদের জন্য তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কারিগরী শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

৬. দারিদ্র্যের কারণে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের আগ্রহ থাকলেও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ নিতে পারেনা। তাই তাদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক আর্থিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা রাখার পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে।

৩.৫.১ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ অনুয়ায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপী বল্লভপুর ১ ব্লকের মাঠাসাই গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নীচে বিশ্লেষণ করা হল:

১. সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখা: - জাতীয় শিক্ষানীতির এই সুপারিশ অনুযায়ী মাঠাসাই গ্রামে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় গুলির শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল বর্তমানে সময়ের সাথে সাথে অনেক বেশি পাচ্ছে।

২. প্রাথমিক স্তরে সুযোগ বৃদ্ধি: - কোঠারি কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করা হয়েছিল মাঠাসাই গ্রামটি তার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এই গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। হাইস্কুল দূরে হলেও যাতায়াতের কোনো অসুবিধা হয় না।

৩. ছাত্রাবাস ও ডে স্কুল সেন্টার: - আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেল নেই।

৪. শিক্ষার প্রসার: - কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এই গ্রামে ঘটেনি যার ফলে এই গ্রামের ১০-১২ জন ছাত্রছাত্রী স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে। ৫ জন ছেলেমেয়ে কলেজ পাস করেছে। বর্তমানে আরো পাঁচজন ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করছে।

৫. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: - মিড ডে মিল, কন্যাশ্রীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায়।

৬. সংগঠনপরিচালনা: - উপজাতিদের উন্নতিকল্পে কোন সংগঠন নেই গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাবের জন্য তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি।

৩.৫.২ তপশিলি উপজাতির শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিমত অনুযায়ী মাঠাসাই গ্রামে বর্তমান অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: - এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে।

২. ভাষার গুরুত্ব: - এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব ভাষায় অর্থাৎ সাঁওতালিতে পড়াশোনা করে না। এই গ্রামে অলচিকি স্কুল নেই।

৩. উপজাতীয় ভাষায় পাঠক্রম: - এইগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেহেতু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সেহেতু তাদের উপজাতীয় ভাষার পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না।

৪. আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয়: - এই গ্রামে কোন আবাসিক ও আশ্রম বিদ্যালয় নেই।

৫. কারিগরি শিক্ষা: - কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মানুষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬. পেশাগত শিক্ষায় বৃত্তি: - কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। ৪ জন চাকরি করে। পড়াশোনার থেকে খেলাধুলায় বেশি আগ্রহী। ছেলে মেয়ে যদি স্কুলে না যায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাড়িতে এসে বাচ্চাদের খোঁজখবর নেন এবং স্কুলে নিয়ে যান। তাই পড়াশোনার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

৭. নারী শিক্ষা: - এই গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে অধিকাংশ পরিবারের মেয়ারা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়না।

৮. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা: - শিক্ষার সচল পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কার্যক্রম থাকলেও নির্দিষ্ট ভাবে কোন প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

৩.৬ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প:

১৯৯৬- ৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের কাজ তাত্ত্বিকভাবে শুরু হয়। ১৯৯৭-৯৯ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় (বীরভূম, কোচবিহার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, উত্তরদিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই প্রসারিত হয়। এই প্রকল্পে তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের জন্য পৃথক করে কিছু বলা হয়নি। তবে সমস্ত শিক্ষার্থী যাতে প্রাথমিক শিক্ষাটুকু (পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত) সম্পূর্ণ করতে পারে এবং পরবর্তী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে এখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মা-মেয়ে মেলা, লোকগান, কবিগান, ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বসাধারনের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ধারাবাহিক ভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই বিষয়ে অবগত করানো হয়েছে।

৩.৭ সর্বশিক্ষা অভিযান:

২০০২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে সর্বশিক্ষা অভিযানের কাজ শুরু হয়। সর্বশিক্ষা অভিযানেও তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত নয়। তবে পশ্চাৎপদ অঞ্চল গুলিতে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গঠন উপযুক্ত নয় বা শিক্ষকের সংখ্যা কম রয়েছে সেই

সকল ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ভবনের সংস্কার, নতুন ভবন তৈরি এবং শিক্ষক নিয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরাও অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভের সুযোগ পেয়েছে।

৩.৮ জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ (NEP 2020):

১৯৯২ সালে যে National Policy of Education বা শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়েছিল তাতে মূলত শিক্ষার সমান অধিকার ও সকলের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরে ১৯৯২ সালে এই বিগত শিক্ষানীতির সংশোধিত রূপ আনার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়। আরো পরে ২০০৯ সালে পেশ করা একটি আইনে বিগত শিক্ষানীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটানো হয়েছিল। বিশেষত শিশুদের জন্য সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

২০২০ সালে ভারত সরকারের অধীন শিক্ষা মন্ত্রক যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশ করেন সেখানে সকলের জন্য পক্ষপাতহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে আর্থ-সামাজিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা ভৌগোলিক পরিচয়ে যারা পশ্চাদপদ রয়েছেন তাদের শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এখানেও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় বিশেষের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব দানের উপর আলোচনা করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ এর তথ্য অনুসারে তপশিলি জনজাতির শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যার ১০.৬১% (প্রাথমিক স্তরে) এবং ৬.৮% (উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে)। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি থাকা তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীর অসময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা

থেকেই ঝরে পড়ার প্রবণতা অধিক। এর কারণ হিসেবে NEP (2020) জানিয়েছেন যে উচ্চ গুনমান সম্পন্ন বিদ্যালয়ের অভাব রয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছাকাছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। এছাড়াও আদিবাসী মানুষদের সামাজিকতা রাজনীতি সামাজিক প্রথা ভাষাগত সমস্যা ইত্যাদিকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর না হওয়ার অন্যতম কারণ বলে জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) তে স্বীকার করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে অতীত কাল থেকে সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত তপশিলি উপজাতি ভুক্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজ কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিখন ফলাফলের বাধা গুলিকে অতিক্রম করানো বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে তপশিলি উপজাতি শ্রেণীভুক্তদের শিক্ষার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আবার তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শিশুরা চিরাচরিত ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক কারণে শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সেজন্য এরা প্রায়শই স্কুল শিক্ষাকে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগতভাবে তাদের জীবনে অপ্রাসঙ্গিক ও বিদেশী বলে মনে করে। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বাস্তবভিত্তিক এবং সময়োচিত ব্যবস্থা নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এরই সাথে আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলিকে গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়টিকে নিশ্চিত করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দানের কথা বলা হয়েছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিশেষত মেয়েদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে সে বিষয়ে গবেষণার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন আদিবাসী ছেলে মেয়েরা গ্রাম থেকে

অনেক দূরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাতায়াত করে প্রায়শই দীর্ঘ জঙ্গল পথ অতিক্রম করে। তাই তাদের জন্য সাইকেলের ব্যবস্থা করা, দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করা এবং তাদের জন্য ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এদের জন্য প্রয়োজনে বুদ্ধিদীপ্ত এবং এগিয়ে থাকা সহপাঠীদের দ্বারা পাঠদান, মুক্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থা, উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং যথার্থ প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অরণ্য সঙ্কুল পাহাড়ের উপর বা পাহাড়ের তলদেশে যে সকল আদিবাসী মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করছেন, তাঁদের এলাকায় তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ছাত্র-ছাত্রীর আবাস যুক্ত বনবাসী বিদ্যালয় স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া। এর লক্ষ্য হল এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব চেনা পরিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন না করে তাদের বসবাসের সমপরিবেশে শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে ভাববে না। সুতরাং এদের শিক্ষার জন্য সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে হলে গবেষণার ফলাফল ভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

চতুর্থ-অধ্যায়: গবেষণার পদ্ধতি

৪.১ জনসমষ্টি বা Population:

যে কোনো ধরনের গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য জনসমষ্টির ধারণাকে সুস্পষ্ট করতে হয়। একটি জনসমষ্টি বলতে একটি বড় দলকে বোঝায়। বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা সমসত্ব জনসমষ্টিকে (Homogenous Population) গ্রহণ করেছেন। এখানে এই জনসমষ্টিতে যে নমুনা অর্থাৎ মানুষেরা রয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সাঁওতাল উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই সাঁওতালি ভাষা বোঝেন এবং এই ভাষায় কথা বলেন। সাংস্কৃতিক এবং আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যাবে এরা প্রায় সকলেই একই বৈশিষ্ট্য যুক্ত।

৪.২ Sample বা নমুনা:

জনসমষ্টির একটি ক্ষুদ্র অংশ হল নমুনা। জনসমষ্টির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে তা ছোট দলের মধ্যে যথাযথভাবে প্রতিভাত হলে তবেই ছোট দলটিকে জনসমষ্টির নমুনা বলা হবে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বহু মানুষের মধ্যে গবেষণার প্রয়োজনে গবেষিকা পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং ঝাড়গ্রাম জেলার মোট ২০ টি ব্লকের মধ্য থেকে ২০ টি সাঁওতাল গ্রাম বা পাড়ার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষকে গবেষণার নমুনা হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষিকা উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনা চয়ন (purposive sampling) প্রণালী গ্রহণ করেছেন। এই পদ্ধতিতে যে সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে গবেষিকা তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়েছেন তাঁরা দুটি জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রতিভূ। এই পদ্ধতিতে

গবেষিকার পক্ষে তথ্য সংগ্রহের কাজ সহজ হয় অথচ গবেষণার উদ্দেশ্য কোনভাবেই বিঘ্নিত হয় না।

৪.৩ গবেষণার নকশা:

বর্তমান গবেষণাটি সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত প্রেক্ষিত বিষয়ে আলোচনা হওয়ায় গবেষিকা গবেষণার নকশা হিসেবে Ethnography পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন। এই পদ্ধতি গৃহীত হওয়ায় গবেষিকা বিভিন্ন সাঁওতাল গ্রাম বা পাড়ায় যেখানে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে কিছুদিন করে বসবাস করেছেন, মানুষ জনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলাপ আলোচনা করে কাটিয়েছেন এবং খুব কাছ থেকে তাদের সংস্কৃতিকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন এবং এরদ্বারা কথোপকথন কালে তারা কি বলছে এবং বাস্তবে তারা কি করছে এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করার চেষ্টা করেছেন

Ethnography পদ্ধতিতে গবেষণার জন্য গবেষিকা এই পদ্ধতির চারটি বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ ভাবে মেনে চলেছেন-

১. গবেষিকা গবেষণার মধ্যে গভীরভাবে ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, যাতে তিনি বিষয়নিষ্ঠভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

২. গবেষণাতে যারা তথ্য দান করেছেন তাদের দৃষ্টিকোন থেকে বর্তমান সমস্যাটিকে অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন।

৩. গবেষিকা তাঁর গবেষণায় অনেকখানি সময় তথ্য সংগ্রহে ব্যায় করেছেন এবং ওতোপ্রোতভাবে তাদের সঙ্গে মিশেছেন।

৪. গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি বিভিন্ন টেকনিক ব্যবহার করেছেন, যেমন- পর্যবেক্ষণ, PRA, FDG, ডাইরি লিখন, পূর্বতন দলিল সমূহকে গভীরভাবে পঠন ও তার বিশ্লেষণ, ছবি সংগ্রহ, রেকর্ডিং ইত্যাদি।

৪.৩.১ পর্যবেক্ষণ:

বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা সুসংগঠিত এবং অসংগঠিত এই উভয় প্রকারেরই তথ্য গ্রহণ কালে তথ্য দাতাদের পর্যবেক্ষণ করেছেন, প্রাপ্ত তথ্য এবং অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। তথ্যের বিশ্লেষণ এবং তার ব্যাখ্যা দানের চেষ্টাও করেছেন।

৪.৩.২ PRA (Participatory Rural Appraisal):

গবেষিকা প্রথম নির্দিষ্ট গ্রাম/পাড়ার মাঝখানে একটি সাধারণের ব্যবহৃত স্থানে সকলকে জড়ো করেন এবং মাদুর/শতরঞ্জি/চাটাই পেতে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসেন। তিনি তার আসার কারণ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন এবং সবাইকে (মহিলা,পুরুষ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কাজে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানান। এই পর্যায়ে গবেষিকা তার গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলেন এবং কারুর কোন প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। গবেষিকা এবার সাদা রংয়ের আর্ট পেপার মেলে ধরেন এবং কম বয়সী যুবক যুবতীদের হাতে একটি করে পেন্সিল ও রঙ্গিন স্কেচ পেন ধরিয়ে দেন। এবার সবাইকে বলেন প্রথম গ্রামের সীমানা নির্ধারণ করতে এবং গ্রামের সীমানার বাইরে কোন দিকে কি আছে তা স্পষ্ট করে লিখতে। এরপর গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রধান রাস্তা, শাখা রাস্তা ও উপশাখা রাস্তা গুলিকে আঁকতে বলেন। এখন রাস্তার কোন দিকে কটি করে বাড়ি, কুঁয়ো, নলকূপ, পুকুর, ধর্মস্থান আছে ইত্যাদি গুলিকে অংকন ও চিহ্নিত করতে বলেন। এখন স্বীকার সাধারণের

শিক্ষার স্থান, সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্যাদের বাড়ি, দরিদ্রতম পরিবার এবং পুরুষ বিহীন মহিলা নির্ভর বাড়ি গুলিকে চিহ্নিত করতে বলেন। এরপর বনজ সম্পদের স্থান, কৃষি জমি, পাড়ার দোকান ঘর, নদী, খাল, কুটির শিল্পের স্থান ইত্যাদি গুলিকে চিহ্নিত ও অঙ্কন করতে বলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্কেচপেন ব্যবহার করতে অঙ্কন কারীদের উদ্বুদ্ধ করেন।

এরপর গবেষিকা গ্রামবাসীর সঙ্গে আলোচনায় বসেন তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবার গুলির আর্থিক উপার্জনের উৎস, জমির উৎপাদন চিত্র, যুবক যুবতীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান থেকে অকালে ঝরে পড়ার প্রবণতা, উচ্চ শিক্ষিত পুরুষ নারীর সংখ্যা, শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা, উচ্চশিক্ষা লাভের সমস্যা, শিক্ষার্থীদের সমস্যা, দারিদ্র্যা দূরীকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি, দারিদ্র্য দূরীকরণে কোন কোন ব্যবস্থা গৃহীত হলে তা এই এলাকায় কার্যকর হবে, পানীয় জলের সমস্যা, পয়ঃ প্রণালীগত ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা ও তার গুণগতমান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় বসেন। এই পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ও কোন কোন গ্রামবাসীর মধ্যে নেতৃত্ব দানের গুণাবলী রয়েছে, সম্পদ পরিমাপনের চিত্র অংকনে কারা অধিক আগ্রহী, এবং সক্রিয় তা বোঝার চেষ্টা করেন। সমস্যার সমাধান বিষয়ে আলোচনাকালে কোন কোন গ্রামবাসী নমনীয়তার সঙ্গে বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছেন, কাদের ভাবনার মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে এবং কারা দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে আগ্রহী অর্থাৎ সৃজনশীলতার গুণাবলী কাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে স্পষ্ট তাও গবেষিকা জানার চেষ্টা করেছেন।

৪.৩.৩ ফোকাস দল আলোচনা বা Focus Group Discussion :-

যেহেতু সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক এবং শিক্ষাগত প্রেক্ষিত এখানে মূল আলোচ্য বিষয় তাই গবেষিকা যে কুড়িটি গ্রামে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেখানে উপস্থিত সমস্ত সাঁওতাল পুরুষ মহিলাকে প্রথমেই তার গবেষণার লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে গবেষিকার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কৌশল এবং পূর্বতন প্রশিক্ষণকে ব্যবহার করে আলোচনাটিকে পরিচালিত হতে দিয়েছেন। এখানে গবেষিকা পূর্বেই একটি খসড়া দিক-নির্দেশনায় তৈরি করে দিয়েছেন,অন্যথায় গবেষণা কর্ম কার্যকর করতে তার অসুবিধা হত। আলোচনার অধিবেশন পরিচালনায় গবেষিকা প্রথমেই উপস্থিত আলোচকদের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাদের সকলকে সাদরে এই আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করেছিলেন। প্রথমে হালকা বিষয় দিয়ে আলোচনা শুরু করে ক্রমশ আরও গভীরে আলোচনাটিকে ধীরে ধীরে গবেষিকা এগিয়ে নিয়ে যান এবং আলোচকদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে তথ্য উপস্থাপন করতে সহায়তা করেন।

আলোচনায় যে সকল তথ্য উঠে আসে গবেষিকা তার কিছু তথ্যকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেন। যথাযথ মূল্যায়নের পর গবেষিকা প্রক্রিয়াজাত তথ্যগুলিকে আলোচকদের সামনে উপস্থাপন করেন, এবং তার যথার্থতা স্বীকৃত হলে অবশেষে আলোচনার চূড়ান্ত রূপ তৈরি করেন।

৪.৩.৪ সাক্ষাৎকার:

বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা দলগতভাবে সংগঠিত এবং অসংগঠিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ কালে তিনি সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন,এবং সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে গ্রামের মানুষদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেন। তাদের নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করেন সরাসরি তথ্য গ্রহণের জন্য এবং অসংগঠিত সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় এমনও কিছু প্রশ্ন করেন যাতে সাক্ষাতদানকারীরা বুঝতে পারেন যে তাদের কাছ থেকে তথ্য গ্রহণ করা হচ্ছে।

পঞ্চম-অধ্যায়: সংগৃীত তথ্যের বিশ্লেষণ

৫.১ তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের বিশ্লেষণ:

❖ নলবনা, গড়বেতা-৩: -

- **সংস্কৃতি:** - এই গ্রামে চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ সবাই করতে পারে। সব ছেলেরাই ধামসা মাদল বাজাতে পারে। সব মেয়েরাই চিরাচরিত সাংস্কৃতিক গান করতে পারে, নতুন প্রজন্ম গান শেখার এবং করার চেষ্টা করে। বেশিরভাগ ছেলেরা দূরে মেলা দেখতে যায় রাতে। এই মেলাতে গিয়ে পছন্দের মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে এসে বিয়ে করার রীতি আছে। সাঁওতালদের যতরকম পুজো আছে সব পুজো এই গ্রামের জাহের থানে হয়। এই গ্রামে অ-আদিবাসীদের সাথে ছেলেমেয়েদের বিবাহের ঘটনা নেই এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহ করার আগ্রহও নেই। অন্যান্য জাতিদের পুজো পার্বণে এরা অংশগ্রহণ করে।
- **শিক্ষা:** - এই গ্রামে প্রায় ১৫ জন মতো স্কুল ছুট হয়েছে হাইস্কুলে, এবং প্রতিটি স্কুলছুটের ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যাই মূল কারণ হিসাবে লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে একটি মেয়ে কলেজে পড়ে। ছেলেদের থেকে মেয়েদের পড়াশোনা করার আগ্রহ বেশি। বর্তমানে তিনটি ছেলে হোস্টেলে পড়াশোনা করছে। অঙ্গনওয়াড়ি গ্রামের কাছে হলেও প্রাইমারি এবং হাই স্কুল একটু দূরে।
- **অর্থনীতি:** - এই গ্রামে দুজন চাকরি করে। একজন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আর একজন সেনাবাহিনীতে। গ্রামের প্রায় সবারই চাষের জমি আছে। বৃষ্টি না হলে ধান বা সবজি চাষ

হয় না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি অনেকে পায়নি। গ্রামের মানুষের প্রধান কাজ হল জ্বালানি কাঠ,পাতা বিক্রি করা। বেশির ভাগ মানুষ দিনমজুরির কাজ করেন।

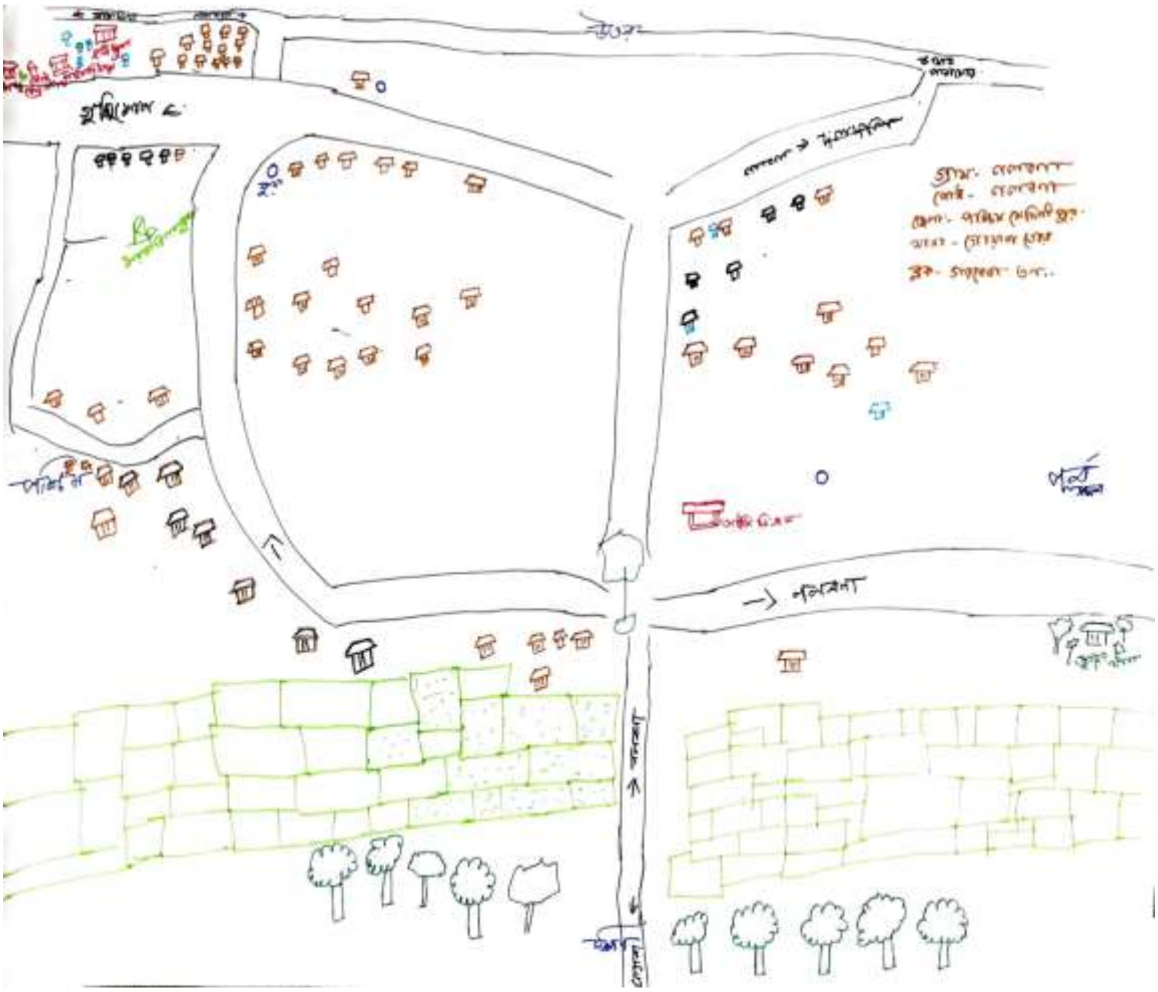

কাঠবেড়ালী, খরগোশ, ইঁদুর, গোসাপ, পভৃতি তারা খাদ্য হিসাবে জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে থাকে। জঙ্গলে যে গাছগুলো পড়ে যায় এবং বাঁকা সেই গাছগুলোই গ্রামের মানুষ কাটে। প্রায় অধিকাংশ যুবকরা নেশাগ্রস্ত। জঙ্গলে শাল, মহুল, কেঁদ, পিয়াল, হরিতকী, চাপাতি, কুল, খেজুর, কুসুম গাছ আছে। জঙ্গল বাঁচাও কমিটি আছে। জঙ্গলকে সবাই রক্ষা করতে চায়। রেশন সবাই ঠিকঠাক পাচ্ছে। অধিকাংশ মানুষই সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জানে না। সরকার থেকে দেওয়া জলের সুবিধা পায়। গ্রামের মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত।

❖ কামারবান্ধি, ঝাঁকড়া, চন্দ্রকোনা-২

❖ **সংস্কৃতি :-** গ্রামের সবপুজোতেই সবাই অংশগ্রহণ করে। সবাই চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ করতে পারে। পুরনো প্রজন্ম সাংস্কৃতিক গান জানলেও বর্তমান প্রজন্ম সাংস্কৃতিক গান শেখেনি। গ্রামে ধামসা মাদল থাকার কারণে সবাই বাজাতে শিখেছে। এই গ্রামে অন্য জাতিতে বিবাহ নেই, অন্য জাতিতে বিয়ে না করার জন্য গ্রাম থেকে কড়া নিয়ম করা হয়েছে। তবে অন্য জাতিতে বিয়ে করার ব্যাপারে ধীরে ধীরে মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। ছেলেরা প্রচুর পরিমাণে পাতা পরবে ঘোরে। এই গ্রামের ছেলেরা প্রেম করে বিয়ে করেছে কিন্তু মেয়েরা প্রেম করে বিয়ে করেনি। যারা প্রেম করে বিয়ে করেছে তারা অল্প বয়সে বিয়ে করে ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অপুষ্ট বাচ্চার জন্ম হয়।

❖ **শিক্ষা: -** এই গ্রামে শিক্ষার হার খুবই কম। প্রায় ৬৮ জন স্কুলছুট আছে। স্কুল ছুট হওয়ার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক সমস্যা এবং খেলাধুলার জন্য পড়াশোনা হয় না বলেই গ্রামের মানুষের ধারণা। এই গ্রামে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে স্নাতক স্তরের পড়া সম্পূর্ণ করতে পেরেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মিড ডে মিলের সমস্যা আছে, খাবার মান ভালো নয়। বর্তমানে চাকরির অবস্থা বেহাল বলে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় আগ্রহ পাচ্ছে না। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার হার বেশি।

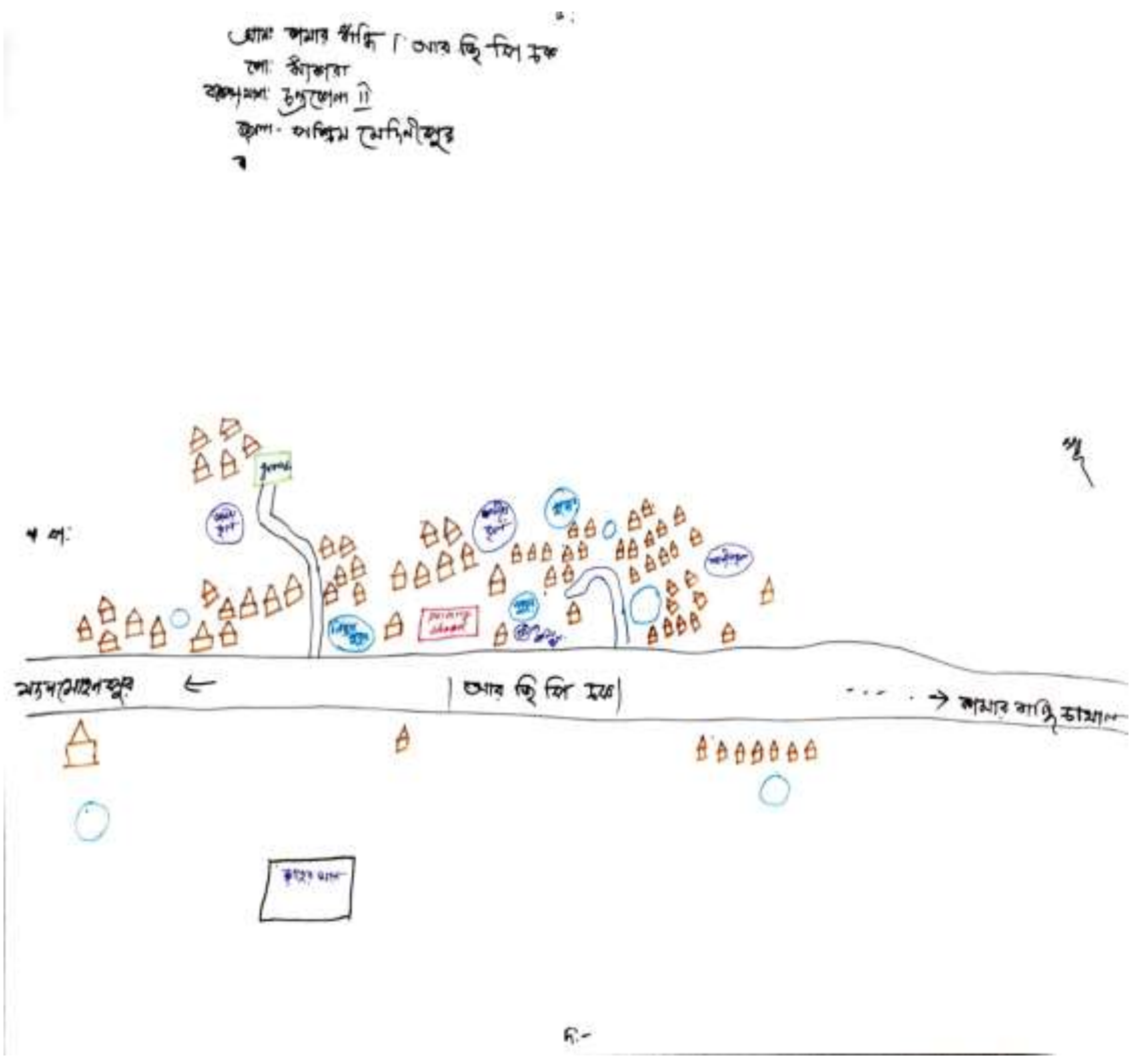

❖ **অর্থনীতি:** - এই গ্রামের সবারই কমবেশি চাষের জমি আছে, এই জমিগুলোতে ধান এবং আলু চাষ হয়। অসুখ-বিসুখ হলে এরা ডাক্তার দেখায় এবং প্রাচীন পদ্ধতিও অবলম্বন করে। যে কোন অনুষ্ঠানে বাড়িতে হাঁড়িয়া এবং মদ তৈরি করা হয়। বয়স্করা মদ, হাঁড়িয়া খায় এবং তার সাথে নতুন প্রজন্মও খাওয়া শুরু করেছে। ১৫ টি পরিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছে। সবাই রেশন ঠিকঠাক পায়, কেউ পুরোহিত ভাতা পায়না। বেশিরভাগ মানুষ দিনমজুরের কাজ করে। গ্রামে একজনের ভূষিমাল দোকান এবং একজনের পান দোকান আছে। বর্তমানে এই গ্রামের বেশিরভাগ পরিবারেরই সঞ্চয়ী মনোভাব আছে।

❖ **গগনাশুলি: -**

- **সংস্কৃতি:-** এই গ্রামের মানুষ সাঁওতালি ভাষায় সবাই কথা বলতে জানেন। বিধবা বা বয়স্করা গান করতে জানলেও নতুন প্রজন্মের মেয়েরা গান করতে জানে না। মেয়েরা সবাই চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ নাচতে জানে এবং চিরাচরিত সাংস্কৃতিক বাজনা বাজাতে সব ছেলেরাই জানে।

- **শিক্ষা:** - এই গ্রামে ভাষাগত কোন সমস্যা নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই গ্রামে কোন ড্রপ আউট নেই কমপক্ষে কলেজ পর্যন্ত সবাই পড়াশোনা করেছে এবং প্রায় সবাই চাকুরীরত অথবা কোনো কাজের সাথে যুক্ত।

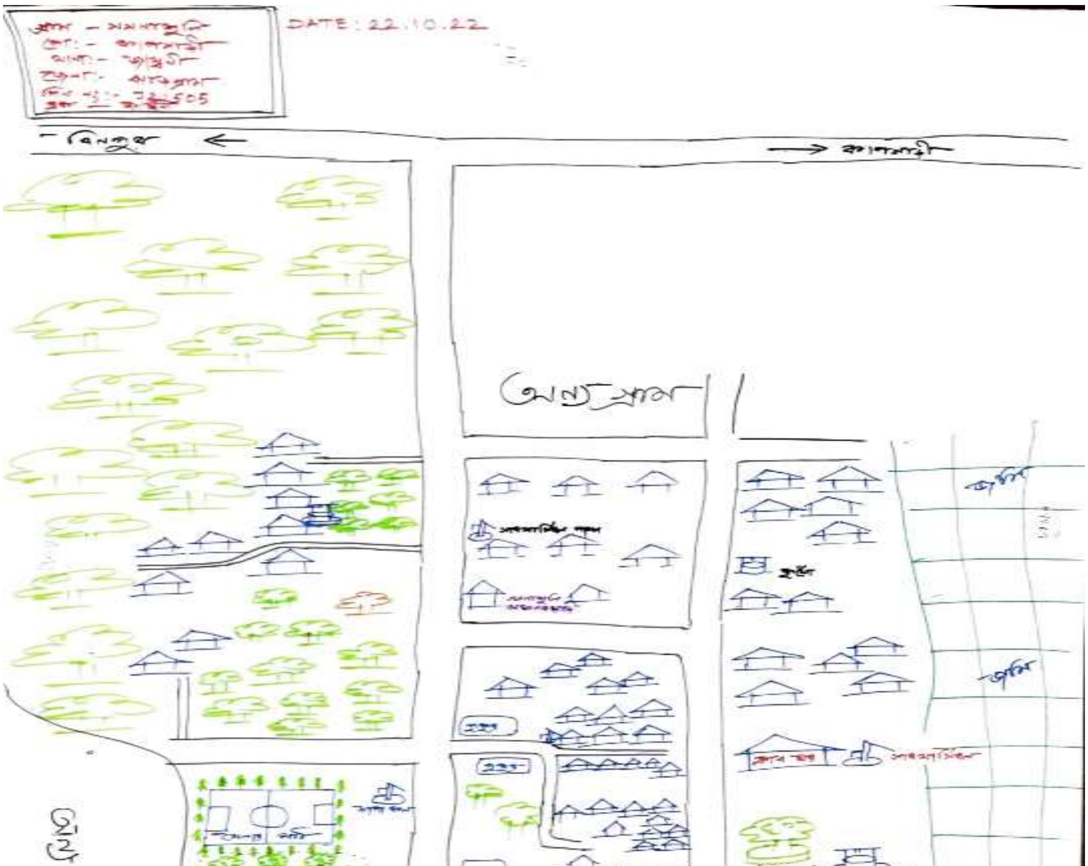

- **অর্থনীতি:** - কমবেশি সবাই চাকুরীরত এবং শিক্ষিত হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত। জঙ্গলের কাঠ সাধারণত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জঙ্গলের উপর সেরকম ভাবে নির্ভরশীল নয় কিন্তু জঙ্গলকে তারা রক্ষা করে থাকে। কয়েকজন গ্রামবাসী চাষবাসের উপর নির্ভরশীল। সরকারি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তারা পায়। সরকারি স্কিম সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন।

❖ কুড়চিবনী (নয়াগ্রাম): -

- **সংস্কৃতি:** – নতুন প্রজন্মের সবাই বাজনা বাজাতে জানেনা এবং শেখার চেষ্টাও নেই। ডিজে ব্যবহার হয় না। পরবে গিয়ে বিয়ে করার চল আছে। পুজোতে বা অনুষ্ঠানে নিজস্ব সংস্কৃতির পোষাক পরে। অন্যজাতির পুজোতে অংশগ্রহণ করে। জাতিভেদ প্রথা নেই। কম বয়সে এবং অন্য জাতিতে বিয়ে করে না।
- **শিক্ষা:** – ছেলেমেয়ে সবাই স্কুলে যায়। ২ জন মেয়ে একজন ছেলে কলেজ পাশ করেছে। ৩ জন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। অঙ্গণ ওয়াড়িতে মিডডে মিল বন্ধ থাকে মাঝে মাঝে।
- **অর্থনীতি:** – সরকার থেকে ৩০ টি বাড়ি ও বাথরুম পেয়েছে। সবার চাষের জমি নেই, ২ বার ধান চাষ হয়। দিনমজুরের সংখ্যা বেশি। সিভিক পুলিশ মিলিয়ে চারজন চাকরি করে। সরকারি নলকূপ থাকলেও তাতে খাবারের জলের সমস্যা মেটেনি।

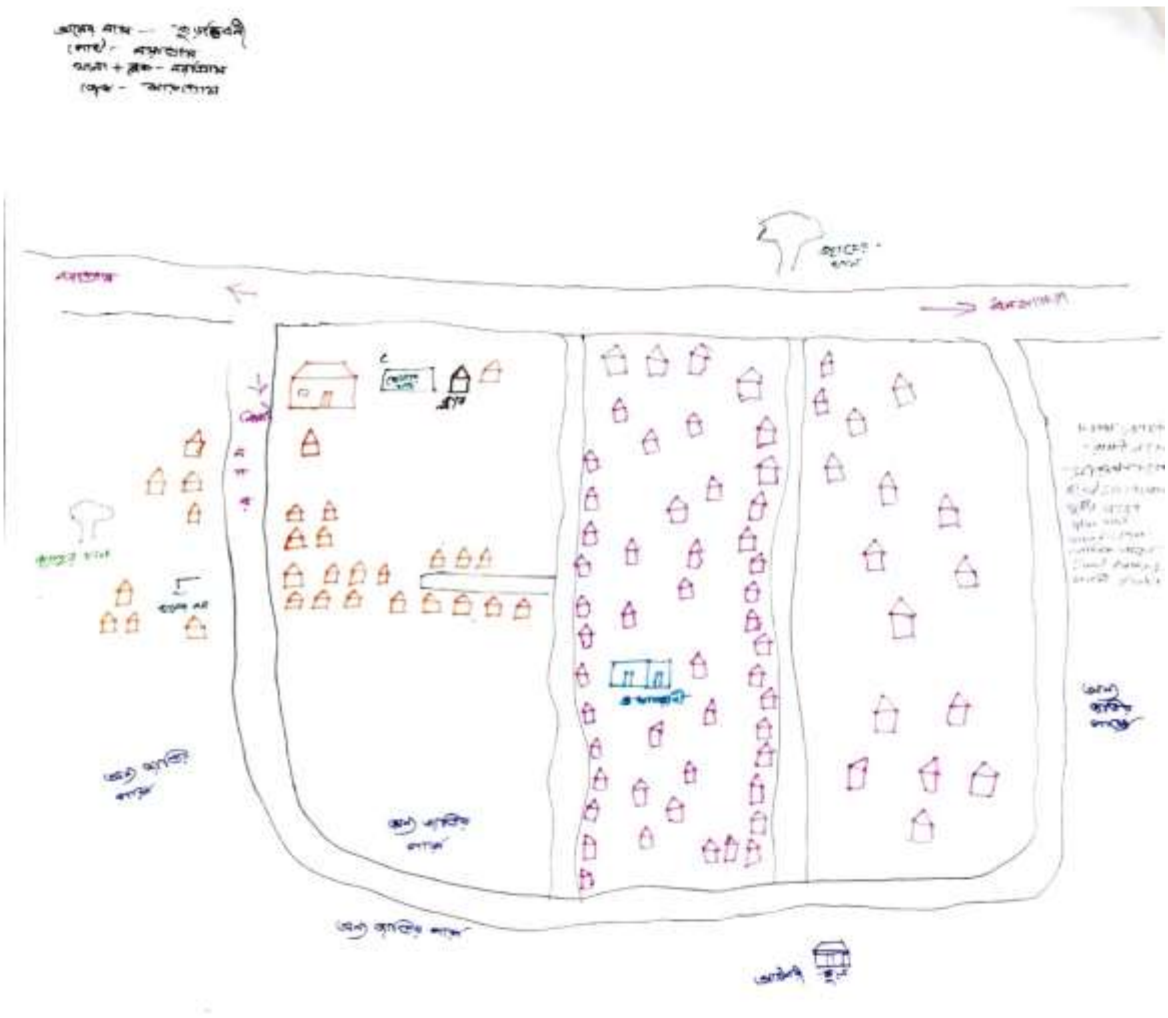

অনেকেই জঙ্গলে পাতা তুলতে যায়, জ্বালানি নিয়ে আসে। অনেকেরই পাতা বিক্রি করে সংসার চলে। শাল, মহুল, কেঁদ, বহেড়া গাছ পাওয়া যায়। জঙ্গলে ইঁদুর, কাঠবেড়ালি, খরগোস, বনবিড়াল আছে। বছরে একবার শিকার পরবের সময় জঙ্গলে শিকার করতে যায়।

ষষ্ঠ-অধ্যায়: প্রাপ্ত ফলাফল ও তার আলোচনা

৬.১ প্রাপ্ত ফলাফল (Findings):

গবেষিকা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লকের কুড়িটি আদিবাসী (সাঁওতাল) গ্রাম থেকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান চিত্র তিনি এই গবেষণায় দেখার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়োজনে তিনি প্রতিটি গ্রামে নিজে গিয়েছেন, কিছুদিন থেকেছেন, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। PRA, FGD এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করে যে তথ্য পেয়েছেন সেগুলিকে নীচে তুলে ধরা হলো-

৬.১.১ সাঁওতালদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য:

ক. সমস্ত গ্রামেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজস্ব সংস্কৃতি এবং সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান।

খ. কোন অবস্থাতেই সাঁওতাল সম্প্রদায় নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন।

গ. বর্তমান প্রজন্মের সাঁওতাল ছেলেমেয়েরাও চিরাচরিত সাঁওতালি সংস্কৃতি মেনে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করে এবং বিয়ে করতে পছন্দ করে।

ঘ. সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থাকে এখনও বর্তমান প্রজন্ম যথেষ্ট সম্মান দিয়ে থাকে।

ঙ. সাঁওতালদের নিজস্ব সারি-সারনা ধর্মকে সকলেই শ্রদ্ধা করে এবং কেউই অন্য কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে চায় না। সমস্ত সাঁওতাল গ্রামেই নিজেদের মধ্যে সাঁওতালি ভাষায় কথোপকথন চলে।

চ. পুরানো প্রজন্মের মতো বর্তমান প্রজন্মের ছেলেরাও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরতে ভালোবাসে।

ছ. পুরনো প্রজন্মের মহিলারা চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী গান করতে জানলেও নতুন প্রজন্মের মেয়েরা চিরাচরিত গান শিখতে পারেনি। কিন্তু তারা এই গান শিখতে আগ্রহী।

জ. পুরনো প্রজন্ম এবং নতুন প্রজন্মের সমস্ত মহিলা ও মেয়েরা তাদের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ নাচতে পারে।

ঝ. সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী বাজনা পুরানো প্রজন্মের পুরুষদের সাথে সাথে নতুন প্রজন্মের ছেলেরাও শিখতে আগ্রহী। বেশিরভাগ গ্রামেই নতুন প্রজন্মের ছেলেরা তা আয়ত্তও করতে পেরেছে।

ঞ. সমস্ত গ্রামগুলিতেই ছেলেদের পরবে গিয়ে কম বয়সে পালিয়ে বিয়ে করার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে।

ট. ডেবরা, পিংলা, শালবনি, সবং, গোহালউড়া, বেগমপুর, কলকলি প্রভৃতি গ্রামগুলিতে অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহের ঘটনা আছে। যদিও বয়স্করা এই ধরনের বিয়েকে মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না।

ঠ. গড়বেতা-২ ব্লকের বুলানপুর গ্রামে চারটি সাঁওতাল পরিবার খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে।

ড. সব গ্রামেই সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনী প্রথায় বিশ্বাস করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

ঢ. সব গ্রামেই সাঁওতালরা তাদের সমস্ত পুজো জাহের থানেই করে।

ণ. প্রায় সব গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষরাই অন্য জাতির পুজোতে অংশগ্রহণ করে।

ত. চিরাচরিত সাংস্কৃতিক নাচ-গানের প্রচলন থাকলেও বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ডিজে বাজিয়ে নাচ করার প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

থ. সব গ্রামে যেকোন অনুষ্ঠানে মদ হাঁড়িয়া তৈরি করা এবং খাওয়ার চল রয়েছে।

দ. যে গ্রামগুলিতে ছেলেমেয়েরা অ-আদিবাসীদের সাথে বিবাহ করেছে, তাদের বেশিরভাগ গ্রামেই এক ঘরে করার প্রবণতা নেই।

ধ. বয়স্ক এবং নিরক্ষর পুরুষ ও মহিলাদের কেউ কেউ 'ডাইনি', অপদেবতা, ভুত-প্রেত, ওঝা-গুনিন বিষয়ে বিশ্বাস রাখে।

ন. এদের মধ্যে পরিযায়ী হওয়ার বা স্থানান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

প. সাঁওতাল পরিবারগুলিতেও বিশ্বায়ন এবং আধুনিকীকরণের ঢেউ লেগেছে।

৬.১.২ সাঁওতালদের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য:

ক. অর্থনৈতিকভাবে সাঁওতালরা পূর্বের তুলনায় একটু ভালো অবস্থানে বর্তমানে থাকলেও অধিকাংশ গ্রামের অধিকাংশ সাঁওতাল পরিবার এখনো দুরবস্থার মধ্যে রয়েছেন।

খ. কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের পক্ষ থেকে আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা থাকলেও, আজও পর্যন্ত তার সুফল অধিকাংশ সাঁওতাল গ্রামের সাঁওতাল পরিবারগুলিতে পৌঁছায়নি।

গ. বহু পরিবারে এখনো পর্যন্ত আধার কার্ড এমনকি কিছু ক্ষেত্রে রেশন কার্ডও নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই সরকারি রেশন বা অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে সাঁওতালদের অনেকেই বঞ্চিত।

ঘ. অধিকাংশ সাঁওতাল পরিবারে কোনো সদস্য/সদস্যা সরকারি/বেসরকারি চাকরি ক্ষেত্রে নিযুক্তি লাভ করেন নি।

ঙ. প্রায় কোন গ্রামেই কোন সাঁওতাল পুরুষ বা মহিলা কোন ধরনের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নয় তবে ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কেউ সবজি বা মসলার স্থানীয় ব্যবসা করেন।

চ. মেদিনীপুর জেলার কিছু ব্লকে এবং ঝাড়গ্রাম জেলার অধিকাংশ সাঁওতাল গ্রামে চাষযোগ্য জমিতে কেবলমাত্র আমন ধানের চাষ হয়। কারণ ওই সকল জমিতে কোনরূপ সেচের ব্যবস্থা নেই। ওই জমিগুলিতে চাষ করার জন্য বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করতে হয়।

ছ. সাঁওতাল গ্রামগুলিতে অধিকাংশ বাড়িতেই শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই।

জ. বহু সাঁওতাল পরিবারই এখনো কুঁড়ে ঘরে বসবাস করে।

ঝ. ঝাড়গ্রামের অধিকাংশ সাঁওতাল পাড়া যেহেতু জঙ্গলের কাছে তাই অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার জন্য তারা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

ঞ. এখনো অধিকাংশ সাঁওতাল পরিবার অর্থনৈতিকভাবে দিনমজুরীর উপর নির্ভরশীল।

ট. বহু সাঁওতাল পরিবার পরিযায়ী শ্রমিক রূপে দূর দূরান্তে ইঁটভাটা, রাস্তা তৈরি, চাষের কাজ, মুরগী ফার্মে ডিম কুড়ানো ইত্যাদিতে শ্রম দান করে।

ঠ. সাঁওতালরা তাদের ছোটখাটো অসুখে জঙ্গলের ঔষধি গাছ ব্যবহার করে।

ড. সাঁওতালরা গেঁড়ি, গুগলি, শাকপাতা, জঙ্গলের বিভিন্ন গাছের মূল,মাশরুম এবং জঙ্গলে শিকার করা পশুর মাংস প্রভৃতি দিয়ে নিজেদের ভিটামিন-প্রোটিনের চাহিদা মেটায়।

৬.১.৩ সাঁওতালদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য:

ক. বর্তমান প্রজন্মের সমস্ত ছেলেমেয়েরাই বিদ্যালয়ে যায়।

খ. বর্তমানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা পড়াশোনা করতে বেশি আগ্রহী।

গ. বনবাসী আশ্রমিক বিদ্যালয় কোন গ্রামে নেই।

ঘ. প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি গ্রামের কাছাকাছি থাকলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ বহুদূরে থাকায় সাঁওতাল পরিবারের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে অপারগ।

ঙ. বাবা মায়ের দূরদর্শিতার অভাব, কাজের চাপ, দরিদ্র্য, জঙ্গলে-মাঠে ছেলেমেয়েদের ঘুরে বেড়ানোর প্রবণতা, শিকারের প্রতি আসক্তি, বিভিন্ন সময়ে সামাজিক অনুষ্ঠান ও পরবে অংশগ্রহণ, ফুটবল খেলায় আসক্তি, কম বয়সে বিয়ে ইত্যাদির কারণে অধিকাংশ সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে এখনো উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী হতে পারেনি।

চ. যেহেতু উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের পক্ষে সরকারি বা বেসরকারি চাকরি সংগ্রহ সহজসাধ্য নয় তাই গ্রামের মানুষরা সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় পাঠাতে অনাগ্রহী।

ছ. অধিকাংশ এলাকায় প্রাথমিক থেকে মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত কোন স্কুল নেই। সাঁওতালি ভাষায় লেখাপড়া করার সুযোগ নেই, ফলে বাংলা ভাষায় পড়তে অনাগ্রহী বহু ছেলে মেয়ে প্রাথমিক স্তরেই বিদ্যালয় ছুট হয়ে যায়।

জ. সমস্ত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা থাকলেও শুধুমাত্র খাবারের টানে সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায় না।

ঝ. অল্প কিছু সংখ্যক সাঁওতাল গ্রামে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও এখনো পর্যন্ত এটি কোন সামগ্রিক চিত্র নয়।

ঞ. মধ্যাহ্ন কালীন আহার গ্রহণের সময়, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা আদিবাসী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে আহার এবং খেলাধুলা করতে আগ্রহ দেখায় না।

ট. সাঁওতালি ভাষা ও সাঁওতালি সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং সাঁওতালি সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান শিক্ষক/শিক্ষিকার অনুপস্থিতির কারণে সাঁওতাল ছেলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে এমনকি উচ্চ শিক্ষার প্রাঙ্গনেও হীনমন্যতায় ভোগে যার ফলে অচিরেই তারা বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ঠ. প্রথা বহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষার পরিমন্ডল আজও অধিকাংশ সাঁওতাল গ্রামে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

ড. পৃথকভাবে 'মহিলা মঙ্গল সমিতি' কোন গ্রামেই তৈরি হয়নি এ বিষয়ে সরকারি বা বেসরকারি কোনো উদ্যোগ আজও চোখে পড়েনি।

৬.২ আলোচনা (Discussion):

বর্তমান গবেষিকা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার যে কুড়িটি গ্রামের তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে সাঁওতাল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা তিনি সাঁওতাল মানুষ জনের মধ্যে লক্ষ্য করেননি। তবে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে উচ্চশিক্ষায় আসা বহু সাঁওতাল যুবক-যুবতী আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর উচ্চবর্ণের ছেলে/মেয়েকে বিবাহ করেছেন এবং নিজের গ্রাম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না যাওয়ার বিষয়ে মনস্থ করেছেন। এদিক থেকে দেখলে গ্রামীণ সাঁওতাল সমাজ মনে করেন উচ্চশিক্ষা তাদের সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ যে শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর ছেলে-মেয়েরা সমাজ-সংস্কৃতি, প্রথা, ধর্ম ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস না রেখে অন্য ধর্ম, অন্য সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ধাবিত হয়, তা যে কোনো সমাজের পক্ষে মৃত্যু ব্যতীত কিছু নয়। বর্তমান গবেষিকাও বিশ্বাস করেন যে সাঁওতাল সমাজের উন্নতির জন্য উচ্চশিক্ষা লাভ করা জরুরী। কিন্তু একই সাথে নিজের সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় পরিচিতি কে অস্বীকার করে নয়।

সাঁওতাল সমাজে মেয়েরা চিরাচরিতভাবেই যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেন। যদিও সাঁওতাল সমাজে মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ছেলেদের তুলনায়

সাঁওতাল সমাজে মেয়েদের অধিক পরিমাণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সাঁওতাল মেয়েরা এখন শুধুমাত্র শালপাতা, সাবুই ঘাস ইত্যাদি শিল্পে নিজেদের বন্দী না রেখে বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ, রূপচর্চা, অফিস সহকারী, রেস্টুরেন্ট সহকারী, স্বাস্থ্য সহায়িকা, শিক্ষিকা, ক্লার্ক ইত্যাদি বৃত্তিতে আগ্রহী হয়েছেন। তবে যে সমস্ত মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তারা উচ্চশিক্ষায় আর অধিক অগ্রসর হতে পারছেন না। গ্রামীণ এলাকায় সাঁওতাল মেয়ে এবং মহিলারা সেল্ফ-হেল্প গ্রুপ তৈরি করে তার মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক সামর্থ্যকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। এখন সাঁওতাল মেয়েরা বুঝেছেন টাকা সঞ্চয় করার গুরুত্ব। তাই পঞ্চায়েত থেকে তাঁদের দক্ষতা বিকাশকারী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিক পরিসরেও শিক্ষিত সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের আগ্রহ এবং উপস্থিতি চোখে পড়ছে। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতিও একজন সাঁওতাল মহিলা। বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিতা সাঁওতাল মেয়েদের সাথে আলোচনা করে এই একই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

সমাজ-সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে সাঁওতাল সমাজে বিশেষ কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা না গেলেও সাঁওতাল মেয়েদের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার এবং স্বশক্তিকরণ এর আকাঙ্খায় এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। সাঁওতাল সমাজের যুবক-যুবতীরা উচ্চশিক্ষায় যথেষ্ট আগ্রহী। চিকিৎসা বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষকতা এবং বিভিন্ন সরকারি চাকুরী ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবণতা বিশেষ ভাবে এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বায়ন এবং আধুনিকীকরণ সাঁওতাল সমাজকে স্পর্শ করেছে এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। বিশ্বায়ন সাঁওতাল সমাজের অর্থনৈতিক চিত্রকে পরিবর্তিত করেছে। শতকরা ৬৫.৫ ভাগ সাঁওতাল বর্তমানে ভালো উপার্জন করেন, ১৫.৫% সাঁওতাল মধ্যম মানের উপার্জন

করেন এবং ৯% সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ স্বল্প মানের উপার্জন করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উপরে অরূপ দে (২০১৫) এর গবেষণায় এই তথ্য ধরা পড়েছে। এই বিশ্বায়নের কারণে সাঁওতালদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রতি প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন শতকরা ৫৩.৫ ভাগ সাঁওতাল পুরুষ ও মহিলা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে আগ্রহী কারণ তাদের বিশ্বাস আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাল মেলাতে গেলে উচ্চশিক্ষা লাভ জরুরী। বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা লক্ষ্য করেছেন যে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুযোগ পেলে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রতি আগ্রহ অধিক। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল পুরুষদের স্বাক্ষরতার হার যেখানে ৬৬.১২% ছিল সেখানে সাঁওতাল মেয়েদের ওই সময় সাক্ষরতার হার ছিল ৪৩.৫% এবং সামগ্রিকভাবে এই সাক্ষরতার হার ছিল ৬৬.১২%। বর্তমানে এই হার বৃদ্ধির প্রবণতা যথেষ্ট লক্ষণীয়। তাই সাঁওতাল পরিবার উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য তাদের ছেলেমেয়েদের দূরের স্কুল-কলেজের হোস্টেলে রাখতে আর দ্বিধাবোধ করেন না। তবে একথাও ঠিক যে সামগ্রিকভাবে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট না থাকায় উচ্চশিক্ষিত/শিক্ষিতা সাঁওতাল যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চশিক্ষা লাভের ফলে এরা আর চিরাচরিত শারীরিক শ্রমের কাজে অংশ নিতে পারছেন না। তাই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত সাঁওতাল যুবক যুবতীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট হতাশা জেগেছে।

গবেষিকা তাঁর গবেষণায় লক্ষ্য করেছেন যে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের ন্যায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয় শিক্ষাটুকুই শেষ করতে পারেনা। প্রাথমিক শিক্ষা শেষের আগেই অনেকে স্কুলছুট হয়ে যায়। অন্তত মাধ্যমিক শ্রেণি অবধি ধারাবাহিক শিক্ষা লাভ না করলে অধীত বিদ্যা এরা ধরে রাখতে পারে না। ফলে পূর্বতন

শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কারণ হিসাবে জানা গেছে পরিবারের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, ভাষাগত সমস্যা, বাড়িতে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করার মতো লোকের অভাব, সহপাঠীদের বঞ্চনা এবং সহপাঠীদের কাছ থেকে পৃথকীকৃত থাকা, পারিবারিক কাজকর্মে নিযুক্তি ইত্যাদির কারণে এরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করতে পারেনা। বর্তমান গবেষিকার প্রাপ্ত ফলাফল কে স্বীকার করেছেন বিভিন্ন গবেষক- মুরমু, দে এবং মাইতি (২০২০), গৌতম (২০০৩) প্রমুখরা।

সরকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের মধ্যে স্বনির্ভরতার পাঠদানের লক্ষ্যে Large Sized Multipurpose Cooperative Society (LAMPS) তৈরি করে আর্থিক ঋণদান, উন্নতমানের বীজ, সার, ওষুধ, চাষের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। এছাড়াও আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আদিবাসী এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে অধিক সংখ্যক আদিবাসী শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আদিবাসী ছেলেরা যাতে সরকারি চাকুরীতে ঢুকতে পারেন তার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৬.৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য:

বর্তমান শিক্ষাক্ষেকে গবেষিকার গবেষণাটি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে-

১. আদিবাসী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করা এবং পুরো শিক্ষার সময়কাল তাদেরকে ধরে রাখার বিষয়ে প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকারা বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন। পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের এই সমস্ত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা ভাষাগত সমস্যা, সঞ্চিত শব্দভাণ্ডারের অপ্রতুলতা এবং পরিবারে শিক্ষার্থীর বিষয়

ভিত্তিক সহায়তা দানের সুযোগ না থাকার জন্য এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় ছুট হয়ে যায় তাই এদের জন্য অবসর সময়ে অতিরিক্ত সহায়তা দানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২. অর্থনৈতিকভাবে এই পরিবারগুলি পিছিয়ে থাকে। এদের অধিকাংশের যথেষ্ট পরিমাণে চাষযোগ্য জমি নেই। যে অল্প জমি রয়েছে তাতে বর্ষার জল ভিত্তিক চাষটুকু হয়। এই সকল দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সারা বছরের প্রয়োজনীয় বই, খাতা, পেন, পেন্সিল, রং, দুই সেট করে ইউনিফর্ম, জুতা, ছাতা, জলের বোতল সমস্ত বিদ্যালয়ে থেকে এদের সরবরাহ করতে হবে। দারিদ্র্যের কারণে অনেক পরিবারে দিনান্তে একবার মাত্র রান্না হয় এবং খাবার জোটে, তাই বহু ছেলে-মেয়ে সকালে অভূক্ত অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসায় লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারেনা। তাই মধ্যাহ্নকালীন আহারের দিকে তাদের নজর থাকে। বিদ্যালয়ের শুরুতেই যদি এদের জন্য ভারী টিফিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তাহলে একদিকে যেমন এরা পুষ্টি লাভ করবে তেমনি অন্যদিকে শিক্ষার প্রতি এদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে অবশ্যই। অভুক্ত শরীরে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ যে অসম্ভব এ কথা প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরাও জানতেন।

৩. ভাষাগত সমস্যার কারণে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বহু শিক্ষার্থী তাদের প্রার্থিত শিক্ষাটুকু লাভ করতে পারে না, তাই সাঁওতালি ভাষায় পাঠদানের জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সকল এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীর আধিক্য রয়েছে সেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের অধিকাংশ সংখ্যায় শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করলে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের ধরে রাখা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

৪. আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে আরো গভীরভাবে নিরন্তর গবেষণার প্রয়োজন। সরকারি প্রচেষ্টা এবং সাহায্য ব্যতিরেকে দীর্ঘমেয়াদি গুণগত মান বিশিষ্ট গবেষণা অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেও আদিবাসী বিষয়ের গবেষণায় আগ্রহ দেখাতে হবে এবং গবেষকদের বিশেষ ভাবে আর্থিক সহায়তা দান ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫. বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এবং আদিবাসীদের সম্পর্কে উন্নত গুণমানের গবেষণা গুলিকে প্রকাশিত করতে হবে। অন্যথায় আদিবাসী বিষয়ে গবেষণার সুফল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে পৌঁছাবে না।

৬. সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আদিবাসীদের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পত্র যুক্ত রাখতে পারলে ভাবী কালের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা আদিবাসীদের সমস্যা এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ জানবেন। এই সমস্ত শিক্ষকরা তবেই শ্রেণীতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পর্যায় গুলি গ্রহণ করতে পারবেন।

৬.৪ পরবর্তী গবেষণার সুযোগ:

১. আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য পাঠক্রম এর মধ্যে আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক কাহিনীকে কিভাবে যুক্ত করা যায় এবং তুলে ধরা যায় সে বিষয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

২. আদিবাসী বয়স্কদের নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা, তাদের জন্য পাঠাগার প্রস্তুতকরণ বিষয়েও গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

৩. বনজ সম্পদকে সুরক্ষিত রেখে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে কিভাবে সেগুলিকে সুরক্ষিত রাখা যায় এ বিষয়ে গবেষণার সুযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. আদিবাসীদের জন্য এলাকাভিত্তিক এবং সম্পদের প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে নতুন ধরনের কি কি বৃদ্ধিতে এদের নিযুক্ত করা যায় ও আর্থিকভাবে এদের সাফল্যের মুখ দেখানো যায় সেই বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

৫. বর্তমানের বিশ্বায়ন, পাশ্চাত্যীকরণ এবং আধুনিকীকরণের প্রভাব সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উপর কতখানি এই নিয়ে গবেষণা করা যায়।

৬. আদিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার এবং ডাইনি প্রথা, মন্ত্র, ভূত-প্রেত, ওঝা-গুনিন ইত্যাদি থেকে মুক্ত করবার জন্য এবং এদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

৬.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

১. গবেষিকা কেবলমাত্র সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করেছেন। তিনি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের তুলনামূলক আলোচনাতে প্রবেশ করেননি।

২. তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা দানের জন্য গবেষিকা কেবলমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে মাত্র কুড়িটি গ্রাম চিহ্নিত করে কাজ করেছেন। ফলে অপরাপর গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ না করায় এই গবেষণায় সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বিষয়ে বহু তথ্যই গবেষিকার জানার বাইরে থেকে গেছে।

৩. তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষিকা কেবলমাত্র দুটি জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামকে চিহ্নিত করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন। সময়ের অভাব, অর্থাভাব, যোগাযোগের ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে অন্যান্য জেলাগুলি থেকে গবেষিকা তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি।

৪. আদিবাসী সম্প্রদায় বিশেষত সাঁওতালদের নিয়ে প্রচুর গবেষণা না হওয়ায় গবেষিকা খুব বেশি সংখ্যক গবেষণা পত্রের পর্যালোচনা করে উঠতে পারেননি।

৫. উপযুক্ত সহায়ক ব্যবস্থা না থাকার কারণে গবেষিকা আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ কালে যে কৌশল গুলিকে ব্যবহার করেছেন তার বিস্তারিত স্থিরচিত্র এবং অডিও ভিসুয়াল চিত্র সংগ্রহ করতে পারেননি।

পরিশিষ্ট (Appendix)

পরিশিষ্ট – I

তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২, ভারত

*JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700032, INDIA

DEPARTMENT OF EDUCATION

To whom it may concern

Certify that Miss. Rima Kisku is a bonafide student in our department of education, Jadavpur University and is persuing her Ph.D. degree under my Supervision.

She is intelligent, deligent and hard-working. I wish her all Success in life.

B Nanda 24.01.2022

DR. BISHNUPADA NANDA
PROFESSOR
DEPARTMENT OF EDUCATION
JADAVPUR UNIVERSITY

*Established on and from 24th December, 1955 vide Notification No. 10986/JU-42/55 dated 6th December, 1955 under Jadavpur University Act, 1955 (West Bengal Act XXXIII of 1955) followed by Jadavpur University Act, 1981 (West Bengal Act XXIV of 1981

দূরভাষ : (৯১) - ০৩৩ - ২৪৫৭-২৮৮২
দূরবার্তা : (৯১) - ০৩৩ - ২৪১৪-৬০০৮

Website : www.jadavpur.edu
E-mail : education.JU@gmail.com
hod@education.jdvu.ac.in

Phone : (91)-033-2457-2882
Fax : (91)-033-2414-6008

পরিশিষ্ট – II

তথ্য সংগ্রহ কালীন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট – III

তথ্য সংগ্রহ কালীন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট – IV

তথ্য সংগ্রহ কালীন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট – V

তথ্য সংগ্রহ কালীন স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট – VI

সাকরাত পরবের মাংস পিঠা (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট – VII

সহরায় বঙা (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট – VIII

দাঁসায় নাচ (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট – IX

সাঁওতালিদের বাড়ির দেওয়াল চিত্র (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট – X

সাকরাত বঙা (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট – XI

মাঘসিম বঙা (স্থিরচিত্র)

পরিশিষ্ট – XII

মাঃ মড়ে পুজোতে ঠাকুর ভর হওয়ার চিত্র (স্থিরচিত্র)

সাঁওতাল উপজাতি সম্প্রদায়ের বিবাহে সিঁদুর দান

পরিশিষ্ট – XIII

সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র ও সেমিনার পাঠ করা পত্র

Two Days International Seminar

NEP 2020: Policy Reforms in Higher Education and Obstacles in Implementation Issues in Undergraduate Level

(10 & 11 August, 2023)

Organized by-

Sailajananda Falguni Smriti Mahavidyalaya

In Association with

Internal Quality Assurance Cell (IQAC)

Certificate of Participation

This is to certify that Rima Kisku, Research Scholar of Jadavpur University has presented a research paper titled NEP (2020) IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS SITUATED IN THE RURAL AREAS OF WEST BENGAL and has actively participated in this Seminar.

Dr. Bhaswati Ghosh
Principal
S.F.S. Mahavidyalaya

Dr. Ajay Saha
IQAC Coordinator
S.F.S. Mahavidyalaya

Imrul Kayes Alam Sarkar
Joint Convener

Masud Rana Mondal
Joint Convener

পরিশিষ্ট – XIV

সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র ও সেমিনার পাঠ করা পত্র

TWO DAYS INTERNATIONAL SEMINAR

ON

"IMPLEMENTATION AND EXECUTION OF NEP 2020 IN THE LIGHT OF INCLUSIVE EDUCATION"

Date: 21st February, Tuesday & 22nd February, Wednesday, 2023

Organised by

VIVEKJYOTI COLLEGE

Estd. 2007

In

Association with "Internal Quality Assurance Cell" (IQAC)

Dakshin Mechogram :: Panskura :: Purba Medinipur :: W.B. :: 721139 :: India

Recognised by NCTE, Affiliated to Baba Saheb Ambedkar Education University and West Bengal Board of Primary Education

Certificate Of Participation

This is to certify that Rima Kisku, *Principal / TIC / Professor / Associate Professor / Assistant Professor / Lecturer/Teacher/ Research Scholar/ Student of* Jadavpur University *partook as a participator/ Paper presenter/ Speaker in the TWO DAYS INTERNATIONAL SEMINAR on 21st & 22nd February, 2023 at VIVEKJYOTI COLLEGE, Mechogram, Purba Medinipur, W.B., India. His/Her engagement enriched and enlightened us.*

Prof. (Dr.) Saumen Kumar Mahapatra President Vivekjyoti College	Prof. (Dr.) M. Tariq Ahsan Institute of Education & Research (IER) University of Dhaka	Mr. Manas kumar Sahu Teacher-In-Charge Vivekjyoti College	Mr. Amitava Jana and Mr. Tanmoy Das Coordinator & Co-Coordinator Seminar Organizing Committee Vivekjyoti College

পরিশিষ্ট – XV

সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র ও সেমিনার পাঠ করা পত্র

TWO-DAY INTERNATIONAL SEMINAR
on
"SOCIO-CULTURAL, EDUCATIONAL & MEDICINAL PRACTICES OF TRIBAL S"

Organized by
SEVAYATAN SIKSHAN MAHAVIDYALAYA
(A Govt. Sponsored College)
(Affiliated to Vidyasagar University & The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration)

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to certify that
Prof./ Dr./ Mr./ Mrs./ Ms. ....Rima Kisku of Jadavpur............
College/ Mahavidyalaya/ University has participated/ presented his/her paper in the Two-Day International Seminar entitled "SOCIO-CULTURAL, EDUCATIONAL & MEDICINAL PRACTICES OF TRIBAL S" held on 26th & 27th August, 2022 at Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya, Sevayatan, Jhargram.

Dr. Ashis Kumar Gupta Principal & Secretary of GB Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya	Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda Patron Professor & Former Head Department of Education, Jadavpur University	Mr. Ram Hari Barik Joint Coordinator Two Day International Seminar Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya	Mr. Asis Manna Joint Coordinator Two Day International Seminar Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya	Mr. Ananda Nanda Bera NAAC Convener Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya

IMPLEMENTATION AND EXECUTION OF NEP 2020 IN THE LIGHT OF INCLUSIVE EDUCATION

RENOVA

Edited by:
Prof (Dr.) Bishnupada Nanda
Asst. Prof. Manas Kumar Sahu

About Vivekjyoti College

Vivekjyoti College is "A unit of Vivekananda Education Trust" established in March, 2007 with 100 intake. Now Vivekjyoti College is running with B.Ed. 2 unites and D.El.Ed. 1 unit since 2016 Recognized by NCTE and Affiliated to BABA SAHEB AMBEDKAR EDUCATION UNIVERSITY & WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATON successfully in full swing.

Vivekjyoti College aspires to be a pioneer teacher education institution actualizing Swami Vivekananda's educational vision by making ideal and committed teachers and researchers that continuously respond to the changing social needs through the discovery, development and application of knowledge. As the college is by the name of Swami Vivekanda, so another purpose of the college is devine manifestation of a Person's innate perfection, harmonizing the best elements of Eastern and Western values.

Published by:

RENOVA

Renova International Publications

B-322 Upper Ground Floor, Bhumiya Mata Mandir Marg, Hari Nagar, Ashram, New Delhi-110014
renovapublications@gmail.com
Contact- 8287036186, 886404542
www.renovabooks.com

9 789393 873361

₹ 1200/-

36. বর্তমান ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজে ভগিনী নিবেদিতার চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর নিরিখে তার একটি বিশ্লেষণ। 272
Payel Giri

37. একীভূত/ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বাস্তবায়নে পথশিশু দের শিক্ষার গুরুত্ব - একটি আলোচনা। 281
Manas Bhunia & Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda

38. নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP)২০২০ এর প্রেক্ষাপটে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম - একটি তাত্ত্বিক আলোচনা 291
Amrita Mishra

39. নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP)২০২০ এর প্রেক্ষাপটে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম একটি তাত্ত্বিক আলোচনা 297

40. NEP 2020: An Analysis of Language Policy 302
Mrs Sukla Hembram & Dr. Laxman Kumar Soren

41. Music Therapy: Way to Educational Improvement for Disabled Children 312
Asima Jana Maiti

42. The Impact of Intelligence and the Effectiveness of Teaching Methodology on the Achievement in Science Scores of the Secondary Students of Howrah District of West Bengal: A Critical Study 319
Tapan Kumar Ghosh

43. NEP 2020 and Education for the Differently-Abled: A Prospective Critical Analysis 328
Soumyashree Sarkar

44. Early Childhood Care and Education 334
Biswajit Mishra

45. Implementation and Execution of NEP 2020 in the Light of Inclusive Education, Yoga Health and Psychological Well- Being 338
Uma Manna

46. A Study of Equitable and Inclusive Education 343
Mrs. Peu Mandal

47. NEP 2020: The Role of Higher Education Educators 347
Debasri Pramanik

48. Role of Yoga on Child Health and Mental Wellbeing in Present Day Situation 352
Niladri Roy

39

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP)২০২০ এর প্রেক্ষাপটে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম - একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

রিমা কিস্কু, গবেষিকা, শিক্ষাবিভাগ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি।

বিমূর্ত বিষয়:

স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরেও সাঁওতালরা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। যার ফলে তা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে।কিছু সংখ্যক মহিলা এবং পুরুষ যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, কোন না কোন পেশার সাথে যুক্ত তাদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাঁওতাল ছাত্রছাত্রীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেটা মূলত ভাষার সমস্যা। তারা নিজেদের মাতৃভাষায় লিখতে পড়তে না পারার জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুসারে প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ মাতৃভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ পায় তাহলে সাঁওতালদের শিক্ষার মান অনেক উন্নত হবে। এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

ভূমিকা:

ভারতে প্রায় ৪০০ ধরনের আদিবাসী রয়েছেন। সাঁওতালরা এই অঞ্চলের আদিমতম অধিবাসী। এরা জঙ্গল,পাহাড় এবং নদীর উপত্যকা বসবাস করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে 40 প্রকারের আদিবাসীদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে সংখ্যায় সাঁওতাল জনজাতির মানুষ অধিক। এরা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, ত্রিপুরা এবং উড়িষ্যাতে এরা সংখ্যায় অধিক। ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৯০ মিলিয়ন আদিবাসী, যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.১০%(জনগণনা রিপোর্ট ২০১১)।মোট আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে অর্ধেকেরও কিছু বেশি ৫১.৮%। জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ২০২০ সমস্ত ধরনের সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষার মূল স্রোতে আনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই আদিবাসী তথা ভারতের আদিম অধিবাসীদের শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে বনবাসী আদিবাসীদের বনবাসী আশ্রম বিদ্যালয় এবং নবোদয় বিদ্যালয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করবার কথা বলা হয়েছে। নবোদয় বিদ্যালয় এবং বনবাসী আশ্রম বিদ্যালয় উভয়ই আবাসিক বিদ্যালয় যেখানে ছাত্রছাত্রীরা থাকা, খাওয়া, জামাকাপড়, শিক্ষার সাজ সরঞ্জাম এবং লেখাপড়া সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করতে পারবে। এই বিদ্যালয়গুলোর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে সংশ্লিষ্ট সরকার পক্ষ। সাধারণ বিদ্যালয়েও আদিবাসী ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত পরিকাঠামোর সৃষ্টির কথাও বলা হয়েছে। উন্নত গুণমানের বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়,এ কথা বিভিন্ন গবেষণা পত্রে স্বীকৃত হয়েছে।

শম্পা দাস (২০১৭) তাঁর গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন যে সাঁওতাল সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন নির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত। গবেষণাপত্রে এও দেখা গেছে যে সাঁওতাল সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন মেয়েদের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল।এই গবেষণা যথার্থভাবে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর মতকে প্রতিফলিত করছে। যে সকল সাঁওতাল মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন তারা কর্ম ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ উপার্জন করছেন। তাই সাঁওতাল সমাজে উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি সাঁওতাল মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করা। আবার মেয়েদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকার কারণে তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের চাহিদা মত অর্থ ব্যয় করতে পারেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে উচ্চতর শিক্ষার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সাঁওতাল মেয়েদের শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন সাঁওতাল পরিবার এবং সমাজের মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে অবহিতকরন, পারিবারিক শিক্ষা, সদিচ্ছা, আত্মবিশ্বাস, উৎসাহ দেওয়ার মানসিকতা, মানসিক প্রস্তুতি ইত্যাদি। গবেষণায় আরও প্রমাণিত যে শিক্ষিতা সাঁওতাল মেয়েরা অশিক্ষিতা সাঁওতাল মেয়েদের তুলনায় অধিক স্বাধীন এবং ক্ষমতা অর্জনের অধিকারী হয়েছেন।

গুরুপদ সরেন (২০১৩) তার গবেষণাতে দেখিয়েছেন যে সাঁওতাল সমাজের উপর বিশ্বায়ন এবং আধুনিকীকরণের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। আধুনিকীকরণ, নগরায়ন এবং বিশ্বায়নের কারণে সাঁওতালরা তাদের নিজস্ব পাহাড়, জঙ্গল ভিত্তিক বাসস্থান ছেড়ে শিল্পাঞ্চলে এবং শহরে ছড়িয়ে পড়েছেন। স্থানান্তরকরণের জন্য সমাজ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে সাঁওতালদের সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত চর্চার মধ্যে একটি পরিবর্তন এসেছে। এর ফলশ্রুতিতে তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, প্রাতিষ্ঠানিক এবং পরিবার ও সমাজে একজন ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যদিও সাঁওতাল পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। এখানে তাদের প্রথা পুরুষ এবং নারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করার পর সাঁওতাল মেয়েরা চিরাচরিত প্রথা এবং বিশ্বাস ভেঙে অনেকখানি স্বাধীন হয়েছে, সুতরাং সাঁওতাল মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।শিক্ষা সাঁওতাল মেয়েদের কৃষি কাজে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যুক্ত হতে সহায়তা করেছে। শিক্ষিতা সাঁওতাল মেয়েরা আধুনিক কৃষিকাজ পদ্ধতিকে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে যে শিক্ষিতার সাঁওতাল মেয়েরা অশিক্ষিতাদের তুলনায় অধিক উন্নতি লাভ করেছে এবং বহু ক্ষেত্রে শিক্ষিত সাঁওতাল পুরুষ এবং শিক্ষিত সাঁওতাল নারীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় সমান। স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রেও শিক্ষিতা সাঁওতাল মেয়েরা অশিক্ষিতদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে, রাজনীতি তথা ভোট প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষিতা সাঁওতাল মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে।

শুভঙ্কর সামন্ত (২০২১) আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষা এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে যে সাঁওতাল মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষদের উপর অধিক নির্ভরশীল। এও লক্ষ্য করা যে সাঁওতাল পরিবারের মেয়েদের কেবলমাত্র বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বপ্না ব্যানার্জি এবং বাসুদেব অধিকারী(২০০১৭) সাঁওতাল ছাত্র-ছাত্রীদের লাইব্রেরীতে বা পাঠাগারে অংশগ্রহণের বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তারা লক্ষ্য করেছেন যে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে আসা সাঁওতাল ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বাধা বা বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এগুলি হল তাদের লাজুকতা, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, মানসিক দূরত্ব এবং অ-আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে সাংস্কৃতিক দূরত্ব বজায় রাখা। ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তারা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। গবেষকরা আরো লক্ষ্য করেছেন যে ভাষাগত বাধার কারণে বেশিরভাগ আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন এলিট বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে।

আলোচনা :

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে স্পষ্টভাবে ত্রিভাষা সূত্র এবং বহুভাষা সূত্রের কথা বলা হয়েছে। কোন দুই ধরনের আদিবাসীদের ভাষা কখনো এক হয় না। সংস্কৃতির ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে আদিবাসীদের গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। অথচ আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা যখন সাধারণ স্কুলে শিক্ষার জন্য ভর্তি হয় তখন তারা মাতৃভাষায় আলোচনার সুযোগ পায় না,মাতৃভাষায় কোন বই পায় না,এমনকি তাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা আদিবাসী প্রথা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করেন না।স্বাভাবিকভাবেই এই সকল ছাত্রছাত্রীরা অকালে মূল স্রোতের শিক্ষার আঙিনা থেকে ঝরে পড়ে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে তাই মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর ভীষন ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু,পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ভগিনী নিবেদিতা, এমনকি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মাতৃভাষার উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রবেশ করতে হলে একই সঙ্গে এক বা একাধিক আধুনিক বিদেশী ভাষাতেও শিক্ষা নেওয়া দরকার।

ইউরোপের বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্র মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা দান করেন এমনকি গবেষণাও করেন।আমাদের পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশও মাতৃভাষাতে উচ্চশিক্ষা দান এবং সরকারি সমস্ত কাজে মাতৃভাষার ব্যবহার আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে।সুতরাং দ্ব্যর্থহীন ভাবে এ কথা বলা যায় যে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মূল স্রোতে ধরে রাখতে হলে তাদের মাতৃভাষাতেই প্রাথমিক স্তরের শিখনের সমূহ ব্যবস্থা করতে হবে।এজন্য আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় অধিক সংখ্যক আদিবাসী

শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ এবং আদিবাসী ভাষায় বই এবং প্রকাশনার যথেষ্ট গুরুত্ব দাবি রাখে। সর্বোপরি আদিবাসী ভাষাকে কিভাবে উন্নত করা যায় সেই বিষয়ে নিরন্তন গবেষণা হওয়া জরুরী। যা নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

আদিবাসী ছেলে মেয়েরা শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে তার আর একটি কারণ হল তাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অভাব। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার আদিবাসীদের শিক্ষাদানের জন্য কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল তাই সরকারকে প্রয়োজন ভিত্তিক আদিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

আদিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা আদিবাসী সংস্কৃতি, ভাষা এবং প্রথার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল, যারা আদিবাসী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে আগ্রহী সেই রকম শিক্ষক এই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিয়োগ করতে হবে। এছাড়াও পিছিয়ে পড়া আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিকারমূলক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং উচ্চতর শ্রেণীতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকশিক্ষণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে "দলিত এবং আদিবাসী" শিক্ষা বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামে অবস্থিত সাধু রামচাঁদ মুরমু বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরকম একটি পূর্ণাঙ্গ পত্র তৈরি এবং প্রকাশের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি এখন মূল স্রোতের ও অ-আদিবাসী ছেলে-মেয়েরা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চাতে থাকতে পারে তাদের মা-বাবাদের দীর্ঘ সযত্নে লালিত আদিবাসীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব। সুতরাং উপযুক্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সহপাঠী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের পৃথকভাবে এর প্রয়োজনীয়তা এবং এর ইতিবাচক দিক সম্বন্ধে অবহিত করবেন।

আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাদের পরিবারবর্গকে অবহিত করতে হবে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ,সমাজসেবী এবং স্থানীয় সরকারি প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার :

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রমে সকলকে একই গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। আদিবাসী এবং অন্যান্য ও সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ শিক্ষার্থীদের বিষয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন এবং

উপযুক্ত পথ দেখিয়েছেন। তাই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর আলোতে আদিবাসী সমাজের শিক্ষা বিষয়ে আমাদের সকলকে যত্নবান হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে,

"পশ্চাতে ফেলিছো যারে

সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"

সুতরাং আধুনিক ভারতকে জগত সভায় পুনরায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে হলে সমস্ত শিক্ষার্থীর সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার গুণগতমান বাড়াতে হবে।

References:

Das, M. (2017). Economic Growth and Women Empowerment through Education : A Study on Santal at Birbhum, West Bengal. *IJEDR*, 5(3), 392-397.

Dr.Saren, G. (2013). Impact of Globalization on the Santals : A Study on migration in West Bengal, India. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 2(7), 29-33.

Samanta, S. (2021). Attitude Towards Girls' Education and Socio Economic Status of the Tribal Village in W.B. *IJCRT*, 9(1), 2624-2631.

Banerjee, S., & Adhikary, B. (2017). Multiculturalism and Academic Libraries : a case study of Santal Tribe of West Bengal, India.

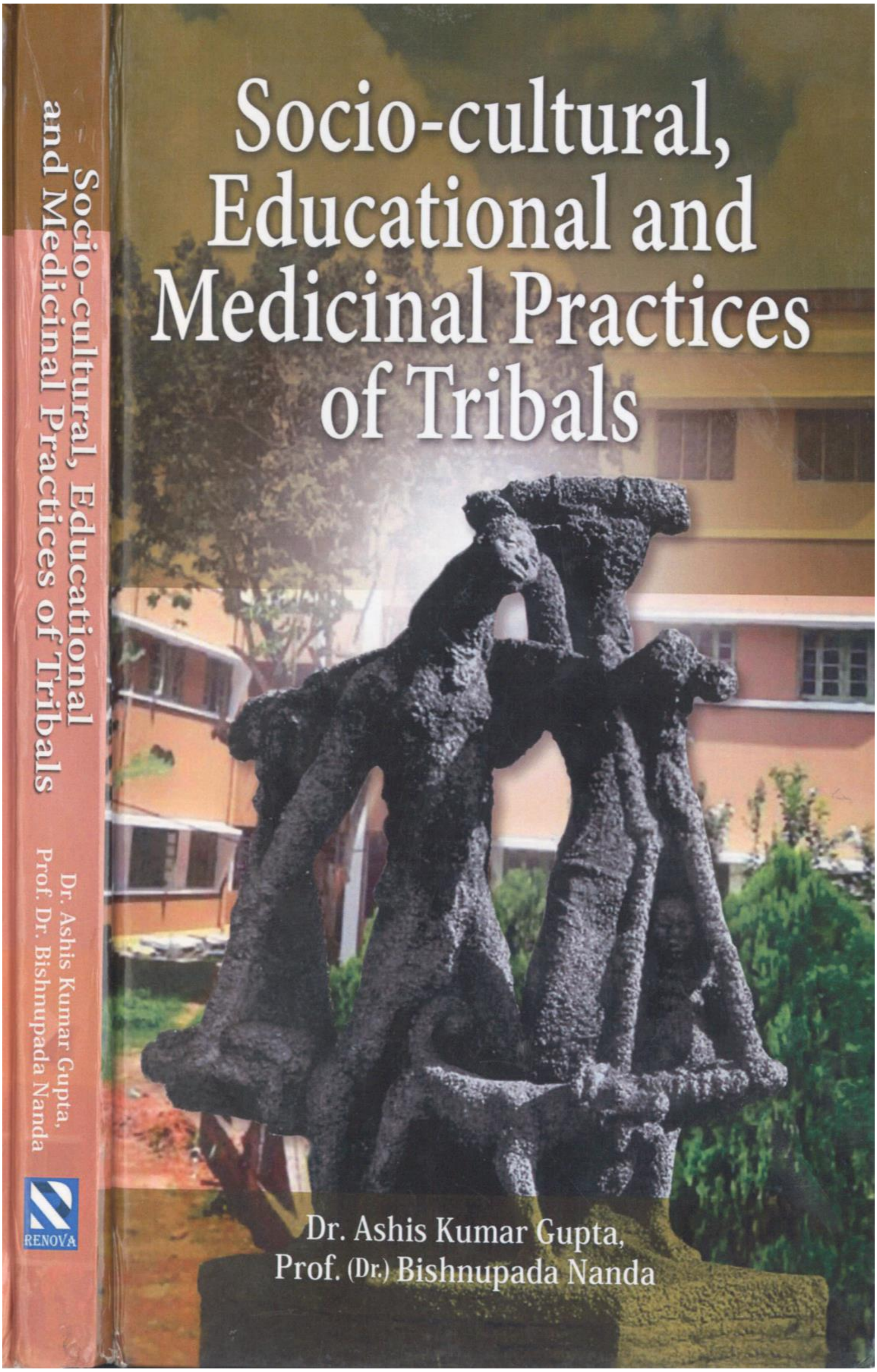
Socio-cultural, Educational and Medicinal Practices of Tribals
Dr. Ashis Kumar Gupta,
Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda
Socio-cultural, Educational and Medicinal Practices of Tribals
Dr. Ashis Kumar Gupta, Prof. Dr. Bishnupada Nanda
RENOVA

Socio-cultural, Educational and Medicinal Practices of Tribals

SEVAYATAN SIKSHAN MAHAVIDYALAYA

To meet the growing demand for trained teachers in qualitative development of Secondary Schools in West Bengal, it was decided to open from 1959 a new Government Sponsored Post Graduate Teacher Education Degree College at the Sub-Divisional town of Jhargram situated on the south eastern railway in the district of Medinipur (Earlier) now at Paschim Medinipur. The Board of Trustee, Sevayatan Satsanga Mission agreed to offer land for building, site and necessary initial assistance for the implementation of the scheme. Accordingly, Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya was started at Sevayatan, about three miles away from the Sub-divisional head quarter. Jhargram is now a new district, West Bengal. Continuous updating of knowledge and use of modern technology in Teacher Education with enhancement of capability through pursuits of higher knowledge is the mission of our college. Course has already been initiated with due recognition of NCTE and the Government of West Bengal. Our Faculties has been approved by West Bengal University of Teachers' Training Education Planning Administration (WBUTTEPA). Since 2013, we have been offering postgraduate courses and degrees in M.A in Education for the purpose of awarding postgraduate degrees under The Vidyasagar University.

ISBN -978-93-93873-14-9

9 789393 873149

Renova International Publications
B-40, First Floor, Aruna Nagar, Civil Lines
Delhi-110 054 (India)
E-mail: renovapublications@gmail.com
Phone: 011-26345520, Mobile: 8826404542

CONTENTS

1. The Scheduled Tribes: Problems and Prospects 1
   Prof. Bishnupada Nanda
2. Santal Marriage System in India: A Sociological Analysis 9
   Amal Kumar Das & Peu Mandal
3. A Study on Socio-Cultural Status of Santals at Satyapur Village, Paschim Medinipur District 16
   Rima Kisku
4. Cultural Change of Santals in West Bengal 26
   Adwaitya Sar & Dr. Swapan Kumar Maity
5. The Marginalized Santals: Their Cultural and Religious Life 31
   Dr. Panchanan Halder, Dr Subhashis Banerjee & Mr Biswarup Chatterjee
6. Religious and Supernatural Beliefs of the Santals: A Reading of the Select Santali Folktales 38
   Dr. Samit Kumar Maiti
7. Educational Status of Birhor People: A Semi-Nomadic Tribe of Purulia District 42
   Sunny Baskey & Prof. Bishnupada Nanda
8. Folktales of the Sabar Community of Purulia District in West Bengal 48
   Dr. Anup Biswas
9. Cultural Aspects of Jungle Mahal: A Discussion 53
   Ujjwal Mahato, Suchismita Sau, Sanjarul Mollick & Dr. Udayan Mandal
10. Tribal Education Status and Quality of Life: Issues and Challenges 61
   Asis Manna

3

A Study on Socio-Cultural Status of Santals at Satyapur Village, Paschim Medinipur District

Rima Kisku*

Ph.D. Scholar, Department of Education, Jadavpur University

Abstract:

Reported is the study of santals people at Satyapur village in Paschim Medinipur District. The present investigator studied Socio-Cultural, Economic and Educational status of santals. The investigator used PRA (Participatory Rural Appraisal) method for data collection. The investigator collected data from 110 santals. She used purposive sampling technique for sample selection. Results showed that the santal people though developed but still they used their traditional life style. In respect of socio-cultural aspect, no major change observed. In respect of economic status much change was noted, at least now they are not starved like-a few years back. Educational scenario of these people is far better now days, though a good number of children drop-out from mainstream education programme. Further in-depth research is necessary.

Keywords: *Tribals, Socio-Cultural Status, Economic Condition, Educational Status*

Introduction

Guha and Ismail (2015) studied that santal is the largest Hindu religious believer tribal community in India. The tribal people of India are termed as **scheduled tribe** by the Indian constitution. In West Bengal 40 different types of tribals are living. Some of them are ASUR, MUNDA, ORAON, MECH, RAVA, GARO, KORA, TOTO, LODHA, SANTAL etc. They can be found mainly in the states of Jharkhand, Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh, Assam, Tripura and Orissa. In India, 90 million people belong to this indigenous communities known as adivasis or tribals. All these tribal people are socially excluded from the mainstream of the society. Due to varied type of eco system, varied type of tribal peoples is living in India. According to 2011 census, 10.43 crore tribal people are living in India that represent 8.3 % of total population. Among them 89.97 % are living in rural areas and 10.03% in urban areas. The sex ratio of tribals in India was 990 females per thousand males. According to Oxford Dictionary.

"A tribe is a group of people in a primitive or barbarous stage of development acknowledging the authority of a chief and usually regarding themselves as having a common ancestor."

This community has its own diverse culture that isolates them from the other cultures in India. That culture includes different religious practice, different singing and dancing style, different rituals for special occasions or festivals, different traditional attires etc. Though they mostly get inclined to the Hindu religion they worship the **nature**. Mythologically, the first 2 santals namely **Pilchu Haram** and **Pilchu Budhi** were born from the cosmic egg cells of two mythological birds namely **'Has'** and **'Hasil'**. These two human beings living in **Hihiri Pipiri** (i.e., the earth) gave birth to 7 sons and 7 daughters. After getting married among themselves each couple formed a separate clan. Total 12 clans were made after inclusion of five more groups. Each of these clans has **'totem'**- a plant or animal with which member of the clan shared a sacred link. A total 12 clans were founded among Santals. They are **Hansdah, Murmu, Hembrom, Soren, Kisku, Tudu, Mandi, Baskey, Besra, Chorne, Puria** and **Bedea**. This mythological story explains the connection of birds and humans as the ancestors and it also describes the kinship between human being and animals.

They hold an immense faith revolving around their Gods such as **Maran Buru, Moreko Turuiko, Jaher Era** and **Gosain Era**. These Gods are represented in **nature, trees, mountains, forests** and **stones**. They have no organized religion, no temples and not even a time or place to worship. They have a strong stigma towards omnipresent and malevolent spirits (**Bonga**) that guide their lifestyles with watchful eyes. Thus, they have a dogmatic belief in supernatural and eulogize power of the Almighty unlike the other cultures where worshipping is one of the prime facets of life.

Education is an instrument of social change. Literacy is considered as a fairly reliable index of socio-cultural and economic advancement. It determines the current status and the direction of any certain culture. Due to the low participation of education of attainment tribal community are back behind of modern streams. The most of the literate population are primary educated.

In West Bengal there are 40 types of tribal lives are living. The major tribals types has given bellow.

All Scheduled Tribes	% of total Population	Total Population
Asur	0.072	3864
Baiga	0.31	13423
Bedia, Bediya	1.68	88772
Bhumij	7.10	376296
Bhutia, Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan, Yolmo	1.26	66627
Birhor	0.04	2241

Birjia	0.02	1123
Chakma	.008	466
Chero	.10	5477
Chik Baraik	.40	21376
Garo	.04	2039
Gond	0.3	13535
Gorait	0.05	2.498
Hajang	0.01	621
Ho	.44	23483
Karmali	.04	2466
Kharwar	0.4	20270
Khond	0.01	660
Kisan	1.86	98434
Kora	3.0	159404
Korwa	0.05	2912
Lepcha	0.64	33962
Lodha, Kheria, Kharia	2.1	108707
Lohara, Lohra	0.5	24783
Magh	0.2	8032
Mahali	1.54	81594
Mahli	0.05	2609
Mal Pahariya	0.84	44538
Mech	0.78	41242
Mru	0.003	197
Munda	6.92	366386
Nagesia	0.31	16378
Oraon	12.14	643510
Parhaiya	0.02	921
Rabha	0.53	27820
Santal	47.4	2512331

According to the 2011 Census, the santal tribal literacy rate of West Bengal is 42.2% in which male literacy rate is of 57.3% and female literacy rate is of 27%.

The tribes are an independent political division of a population with a common culture and they are primitive residents of our country. Santal tribes originally belong to the Adivasi family. The term Adivasi means the member of any of the aboriginal tribal peoples living in India before the arrival of the Aryans in the second millennium BC. Generally, the peoples live in India from very earlier were commonly named as

Adivasi. India has the second largest tribal population after African continent. Though the primitive activities like haunting, fishing, food gathering etc. are commonly found in tribal community, but recently many of them are engaged in settled agriculture, firms and labor of tea gardens. Socio economic condition are often discussed in broad term as satisfaction of needs, feelings of well-being, good or bad working conditions, and other indicators. Drinking water, health, occupation, schooling etc. are the good indicators of socio-economic status of any tribe. Now in 21st century, the impact of globalization is worldwide but it is despairing that some of the tribal communities are still surviving in a grievous condition.

Thus the present paper is concentrated to identify the socio-cultural, educational and economic status of santal community at satyapur village,Midnapur(west).

Objective

- To identify the present scenario of socio-cultural, condition of Santal community at Satyapur village of Paschim Medinipur district.

Methodology

- **Primary Data**

  To get the proper understanding of the issues related to the socio-cultural status of the santals in the area of Satyapur village, the researcher studied the ground realities from the tribal community itself. Thus, the researcher found the root of the problem and analyzed them to reach to some solution. During the survey, the researcher used Participatory Rural Appraisal (PRA) approach among the villagers including the santal children of the village Satyapur of Debra Block in Paschim Medinipur district of West Bengal. A structured interview schedule with high degree of flexibility in responding has been used in the fieldwork that would seem like a discussion to some extent.

- **Secondary Data**

  Apart from primary sources, secondary data were collected from Census Report of India 2011, books and various academic journals

Tools:

The researcher used Participatory Rural Appraisal (PRA) approach as the main tool along with semi-structured interview schedule. The PRA approach aims to incorporate the knowledge and direct opinions of rural people in the planning and management of development projects and programs. This procedure was followed to know the status of awareness within the santal people about their surroundings and also to know how they think to progress in the upcoming years. Using this technique the researcher doesn't have to depend on any particular guide or any certain someone's

personal opinion, rather the researcher noticed the exact participation of the villagers and they also did not feel excluded from the survey.

The Study Area

- The data for this paper comes mainly from the village namely Satyapur in Debra Block of Kharagpur sub-division under Debra Police Station of Paschim Medinipur district, a south-western part of West Bengal. Debra Block has **total population of 288,619** as per the Census report of India 2011. Out of which 145,559 are males while 143,060 are females. In 2011 census report there were total 66,456 families residing in Debra Block. The **Average Sex Ratio of Debra Block is Female: Male = 983:1000.**
- As per Census 2011 out of total population, 4.8% people lives in urban areas while 95.2% lives in the rural areas. The average literacy rate in urban areas is 87.4% while that in the rural areas is 81.8%. Also the Sex Ratio of Urban areas in Debra Block is 1,047 while that of rural areas is 980.
- The population of Children of age 0-6 years in Debra Block is 31859 which is 11% of the total population. There are 16034 male children and 15825 female children between the age of 0-6 years. Thus as per the Census 2011 the **Child Sex Ratio of Debra Block is 987** which is greater than Average Sex Ratio (983) of Debra Block.
- **The total literacy rate of Debra Block is 82.03%**. The male literacy rate is 79% and the female literacy rate is 66.84%.

Schedule Caste (SC) constitutes 13% while Schedule Tribe (ST) is 20.5% of total population in Debra Block. Debra Block has total population of schedule tribe of 59122 that consists of 29422 males and 29700 females. The present investigator used survey method for data collection in Satyapur village of Kharagpur subdivision of Paschim Medinipur district, West Bengal. Satyapur is a tribal village having santal tribals. The respondents were informed about the nature, objectives and rationality of the study and after getting the consent from the villagers, the investigator collected data. This tribal community people residing in this locality for more than last 100 years. The survey was done among 24 families having110 people residing in this village that includes 18 children, 34 males and 58 females.

Results and Discussion

Socio-Culture: Status & Analysis

Singing & Dancing Style-

The santals have their own traditional singing and dancing style. The singing instruments used to focus on mainly the beating of drums and rhythmic tunes of fluits

without any external intrusion. They used open fire as the source of light. But over time the style of celebration changed and that shifted towards modern generation using loud speakers as the musical source though they try to stick to their tradition by using drums (*dhamsa-madal*) and flutes. The santal women perform in their traditional songs for various occasions where some santals sing with dhamsa-madal and the women follow that rhythm to make their dance steps. One of their dance styles is Chhapol dance.

During the survey at Satyapur village the present researcher interacted with 110 respondents. Out of 110 respondents 34 were males. Out of 34 male respondents only 11(28.94%) respondents can play Dhamsa Madol during their social programs. Other 23(67.64%) male respondent cannot play this traditional instrument. All the male respondents use colorful traditional dress, feathers of the birds and green leaves.

Among 58 female respondent 14(24.13%) know to sing the traditional Santali songs where's other 44(75.86%) females did not know the santal traditional songs.

All this santal girls and women's present during PRA inform that they know traditional way of dancing and they dance during their social programs.

Some girls responds that though they know their traditional dance but they are less interested about their traditional dance. They preferred modern dance with hindi songs and DJ. Some of the present respond that they preferred Indian classical dance and therefore they sent their children to learn the Indian classical dance.

It is clear that traditional songs and dances were changed gradually though the aged santal people do not prefer it but due to changes in the social structure of santal community such external cultural practices entered in their community. The service holder prefers to train their children in the latest item songs.

Food Habits:

Since the santals in this region are mostly daily-labours they use very simple yet effective food habits. They gain their nutrition from rice, potato, leafy vegetables, dal. They consume lightly fermented rice-based dish known as Da Madi where Da means water and Madi means Food. They don't like oily or spicy food like other neighbour cultures. They consume pork in big occasions whereas for general occasions they prefer to have chicken and mutton. They prefer to hunt varieties of wild animals, birds, rats, crabs, fish, frogs, ants, wildcats, eggs etc. In all family as well as in special festivals they consume a special drink 'Handia'. This is a popular traditional beverage that can be made by rice with some chemicals and it's used as the main drink for everyone irrespective of gender or age.

Though maximum santal people still consume rice, vegetables, fish/meat but now-a-days young santal people preferred western food. Though 'Handia' is commonly

consumed by santal particularly during their social and cultural programs, but young and adult santals consume other liquors including the foreign branded. In almost all villagers the adult and aged males and aged females consumed Handia. Educated santals now habituated in fast-food and junk-food, when they live in urban areas. It means that educated and rich santal in urban areas are habituated in spicy and oily food.

Dressing Style

The Indian tribal people still live under primitive belief and try to protect their heritage of traditional attire. Their dressing style is totally different from modern culture and still they are strongly followed by their own traditional dresses. Normally male members wear a medium piece of cloth around his waist known as Dhoti and during the time of working, they usually wear a small piece of cloth which is called kopni. Generally, Santali women get dressed up with a larger piece of cloth or saree, the white Saree with red border is of common use during the time of festival. But their traditional dress is Panchi Parhat. These all clothings are made of cotton generally. They like to decorate themselves with flowers, feathers and similar things. The Santali women like to wear various types of ornaments like necklace, ear ring, bangles, wristlets, ring, girdles etc. made of (brass) silver nickel.

Modern santal girls and women's use gold as their ornaments. Educated do not use any ornaments even in their adult age. Like other non-tribals educated santal girls only use a wrist watch and sometimes bangles. So, in dressing style also changes are commonly seen.

Festivals

Santals have mainly two festival which flaunts its rich culture the Soharai and the Baha. These festivals are either related to nature or agriculture. The celebration of these festivals extends over number of days and include folk dance, which are accompanied by respective folk songs and music of traditional musical instrument. Before the festival, women starts brewing rice beer which is first offered to their bonga/ancestors and later is consumed by all, men and women alike. Since santals are agriculture type, their way of life and rituals / worshipping resembles to the cycle or states of agriculture like crop harvesting which they mostly do. And thus they have number of worshipping that they seek to do in order to achieve good harvest. They celebrate many festivals, among them four festivals are mainly celebrated by them in Debra Block. These are -

i) **Baha** – It is a spring festival, a festive of joy that welcomes flowing breeze of change in nature, blossoming of new flowers, growing of new leaves. Baha means flowers in Santali. Santals find it as the symbol of life in this lovely earth. At first they worship Neem leaves, Mangoes & Mahua flowers in their house. Then they join to celebrate it in Jaherthan following the conveying of village priest from his

house to Jaherthan with dancing and singing folks songs. The men and women dress in interesting traditional custom adoring flower on their head to perform folk dance around within the Jaherthan whereas the village priest offers thanks giving sacrifice to god/Bonga namely **Marang Buru, Jaherayu** and others.

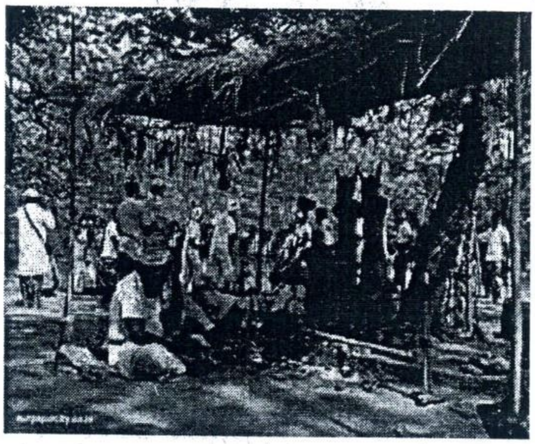

ii) **Sohray** – it is an agricultural festival, which is also the second most important festival of Santal. It is the time when Santal celebrate their harvest. The celebration extends to two to three days. On the first day, cows & bulls are bathed and are worshipped and thanked being their companion throughout the year. The celebration is associated with the bulls specially. At night people awake the animal by singing and dancing from door to door. It is being continued till last day. This practice is called **Gai Jagaw.** On the last day, **Khuntaw** (Bull Play / Badna Parav) is organized which is enjoyed by all villagers and afterwards they gather at **Anejakhra,** enjoy folk dance with loud humping sounds of drams.

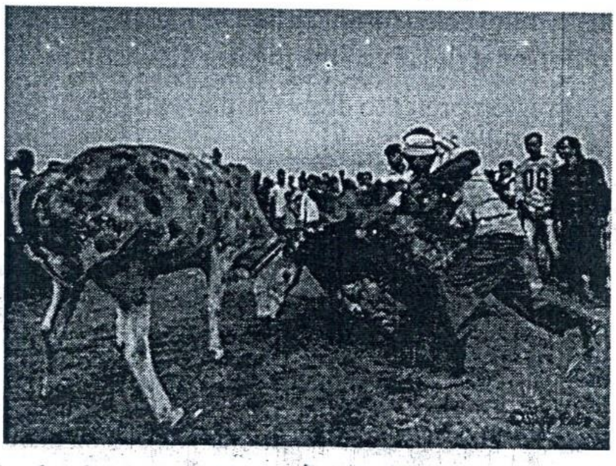

iii) **Sakarat** – It is also known as Makar Parab. Though it is not in the list of tribal festival the Santals observe it very jubilantly. In this festival Santals delicacies like

Jil Pitha is made and rice beer is brew. As it's a post harvest festival they enjoy this festival to relax and have traditional food.

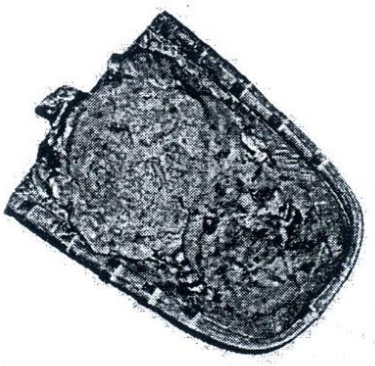

iv) **Maghsim** – This is invoked in Magh (Jan- Feb) near water and cut grass indicating end of Santal year. After 10 days Manjhi convenes a general meeting and his reelected with other village officials offering rice bears to all.

Santal peoples still habituated in their traditional festival baha, sohoray, sakrat, and maghsim. In maghsim they prepared 'SORE' (khichuri with chicken), 'LATO' (atop rice dust with chicken) etc. During marriage festival and adoration (SRADDHA) santal people use fishes.

Wall Painting

santal folk painting is the historic art of India. This art is not done by proffesion, this art is done for enjoying and celebration. The masin themes of this art are basically weding, dancing, family life, rituals, harvest, music, nature, daily activities and creaters. The santals paint is done on wall, cloths, pata. Santals earlier used natural colour that were ready from numerous leaves, muds and flowers. Their design is various types and application of colour from region to region. Bankura, Medinipur and Purulia have very different styles. Even the themes distinctly differ.

The people in this region prefer to draw simple wall painting.

Marriage & Rituals

The Santal follow a totally different custom of marriage from the other neighbour cultures. They don't have any dowry system or bride-price rather they prefer to pay groom-price. They don't allow parallel or cross cousin marriage. There are 8 different kind of marriages i.e. Kirin Bahu Bapla, Tunki Bipi Bapla, Ghardi Jawae Bapla, Itut Bapla, Nir Balak Bapla, Kirin Jawal Bapla, Golanti Bapla, Rajaraji Bapla.

Among these 8 different ways of marriage the most conventional one is Kirin Bahu Bapla. In this type of marriage young man and young woman get fixed their marriage by a Rae Baric or the matchmaker. Here the groom side has to pay a minimal price to take their bride along with them. The groom side even hand over a heifer calf and a bull calf along with a special type of saree namely Khanda Gendha to the bride side.

During the survey, it was seen that among 110 people 82 people know all the festivals and rituals whereas the remaining people know some about the festivals and rituals. But there is no one who doesn't know anything about the festivals.

Conclusion:

From the very ancient ages the santal live in India. In West Bengal, Orissa, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Uttar Pradesh. There number is more than in other states. In Jharkhand, Orissa and Bihar a good number of different types of tribes live. Santals are the major people among Indian tribals. Still date their socio-cultural condition is almost static in nature and they preferred it. Here social change and social mobility is very slow in comparison to some other tribals in India. Still, they preferred to maintain the traditional social structure, cultural practices and environment. The present researcher concluded that inspite of economic and educational development. The santal preferred to maintain their socio-cultural status.

References:

1. Census Report of India 2011.
2. https://en.m.wikipedia.org
3. http://www.population.com/in/west-bengalpopulation.
4. Guha, S., & Ismail, M. (2015). Cultural changes of tribes and their impacts on environment special reference to santhal in west Bengal. *GJISS*, 4(3), 148-156.

IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ATTITUDE OF SANTAL MOTHERS TOWARDS GENDER DISCRIMINATION

Rima Kisku* & Prof Bishnupada Nanda**

***Ph.D. Scholar, Department of Education, Jadavpur University**

**** Professor & former HOD, Department of Education, Jadavpur University**

ABATRACT:

In India tribal communities are marginalized and continue to suffer discrimination. Tribal mothers face more discrimination still there fighting to achieve their equal right and gender justice. The attitude of gender issue is varying person to person and area to area. Still date a misbelieve exists that tribal (Santal) mother have usually enjoyed a higher social status then other mother from the general cast. This study is design to find out the gender discrimination among santal mothers. The selective area is Debra block under Medinipur West district. The investigators selected 50 santal mothers by using purposive sampling techniques. The samples were in the age group 20-40 and educationally 4 are illiterate,21 have primary education,8 have upper primary education,,5 have secondary, 7 have higher secondary and 5 are graduate. 41 sample are house wife and involved in daily labour, 9 are service holder, all of them are living in rural areas. For data collection the investigator used a questionnaire having seventeen items, developed by the present investigators. Results shows that the attitude of santal mothers towards their daughter is positive and gender discrimination though normal in the male dominated patriarchal societies. Its negative impact towards daughters and sexual subjective towards sons were not found. Most of the mother in the santal community remains poor and they need the special support from government and the non government organization.

Keywords: Santal women, Gender discrimination.

INTRODUCTION:

India is a multiethnic country and most of the communities are patriarchal that is male dominated. In the male dominated society women did not get equal social status like that of their male counter parts. Their condition may differ from place to place and society to society.

The tribal people of India are termed as scheduled tribe by the Indian constitution in west Bengal 40 different types of tribal's are living. Some of them are ASUR,MUNDA,ORAON,MECH,RAVE,GARO,KORA,TOTO,LODHA,SANTAL etc. All this tribals people are socially excluded from the main stream of the society. Tribals are excluded communities in India. Due to varied type of eco system, varied type of tribal population are living in India, According to 2011 census 10.43 crore tribal people are living in India that represent 8.3 % of total population. Among them 89.97 % are living in rural areas and 10.03% in urban areas.The sex ratio of tribals in India was 990 female per thousand males in India.

Gender discrimination is common a patriarchal system and more patriarchal among marginalized women. Gender discrimination has meant that women are worst affected among the tribal community and also they face problem and challenges in getting standard socio-economic condition and health status. Due to marginalization poverty and lack of literacy tribal girls are worst effected among the tribal community and are valuable to abuse an unequal access to education. Early marriage, cultural taboos resistance against co-education classes, living outsides the family etc are some of the major barriers which hinder women in Santal community.

Santal women's have to face struggle and challenges in the community. Though very less santal womans face sexual exploitation by contractors, landlords, bureaucratic and those who hold power in mainstream society (Nishi k dixit, 2006) .

According Rao (1990) santal tribal's treats their son and daughters equally and rejoices at the birth of a female child. Santal girls never face any problem of up-bringing and there is no dowry system from santal girls during their marriage.

Among the tribals literacy rate though low but among the girls literacy rate is high because among the boys higher literacy rate then the girls. Though santal girls face number of constrains and barrier to access and benefit from education. Poverty and hunger are the major cause of low literacy among the girls. Due to anganwari, mid-day-mil, kanyashree prokolpo and other facilities in West Bengal, more and Moreno of santal girls are educated and even a good number of them are present in higher education system.

OBJECTIVES:

1. To study attitude of santal women towards gender discrimination in their families.
2. To find out the child sex ratio of santal families.
3. To find out the socio-economic background of santal women.

METERIAL AND METHOD:

Debra block is a block in the Kharagpur subdivision of the Paschim Medinipur district in the state of West Bengal. Debra Block has **total population of 288,619** as per the Census 2011. Out of which 145,559 are males while 143,060 are females. In 2011 there were total 66,456 families residing in Debra Block. The **Average Sex Ratio of Debra Block is 983**.

As per Census 2011 out of total population, 4.8% people lives in urban areas while 95.2% lives in the rural areas. The average literacy rate in urban areas is 87.4% while that in the rural areas is 81.8%. Also the Sex Ratio of Urban areas in Debra Block is 1,047 while that of rural areas is 980.

The population of Children of age 0-6 years in Debra Block is 31859 which is 11% of the total population. There are 16034 male children and 15825 female children between the age of 0-6 years. Thus as per the Census 2011 the **Child Sex Ratio of Debra Block is 987** which is greater than Average Sex Ratio (983) of Debra Block.

The total literacy rate of Debra Block is 82.03%. The male literacy rate is 79% and the female literacy rate is 66.84% in Debra Block.

Schedule Caste (SC) constitutes 13% while Schedule Tribe (ST) is 20.5% of total population in Debra Block. Debra Block has total population of schedule tribe of 59122 that consists of 29422 males and 29700 females. The present descriptive, epidemiological study with a cross sectional design was conducted in the tribal predominant villages (chakkumar,simana and chandia) of Kharagpur subdivision of Paschim Medinipur district, West Bengal. All the tribal mothers of

Reproductive age group, 15-45 years were considered as study subjects. Complete enumeration was done. The inclusion criterion was selected before preparation of the proforma. Only the mothers with one living children were chosen as participants. The respondents were informed about the nature, objectives and rationality of the study and afterwards the informed consent was obtained before data collection. All these activities were started after the study was approved by the Institutional Ethics Committee. After obtaining ethical clearance, the proforma was pre tested on ten mothers complying with inclusion criteria. After minor modification, final proforma was obtained. This tribal community people were mainly Santals residing in this locality for more than last 100 years. The people were well conversant in Bengali but their mother tongue was Alchiki. An Outpatient department was running weekly in the local club for providing health service to the people of this community as well as to neighborhood. Being a resident of the mentioned community I collected all the data and Complete enumeration of the household was done during the time of survey. Data was collected for a period of one month, October in this year spending 2 hrs in morning. Weekends were utilized for the purpose. Effort was made for finding the absentees during daytime by visiting again in afternoon on Sunday. The final number of respondents was 50. All the information was obtained by direct interview method. The process of analysis and report writing took fifteen days.

Tool:

The investigators studied in-depth about the culture and traditions of santal women. They also studied the philosophy of gender discrimination. On the basis of theoretical knowledge, the investigators develop a questionnaire having 23 items. They then sent the type questionnaire to three professors, who have expertization in questionnaire construction for their critical support. After getting the questionnaires from the expert they rejected those questions which the expert answered as low level item. Finally 17 item questionnaire were again sent to the same three experts for their criticism after 21 days. The responses finally accepted as the 17 items questionnaires.

Discussion:

Inspite of higher level of education the common peoples still posses are discrimination against the gender. This view is well established according to the news reported in the newspaper and other electric Medias. When there is a girl child in the family a good number of families cannot accept their girl child. But in the tribal families and more particularly in the santal families gender discrimination is almost negligible as they either doesn't bother about the gender of their first child or they never bother about gender of their babies, i.e. either girls or either boys. It may be because in the santal families both boys and girls equally support their family members by physical labors. On the other hand like the higher cast people dowry system is absent in the santal communities only in the illiterate santal families the bride have to pay dowry to the wife's family like 2 cows, 1 goat, cloths, country liquor and rupees 1.25 only. The total cost of marriage is bear by the bride's family. Therefore, perhaps the santal families have no negative views about their girls' child.

From this small study it is clear that there is no gender discrimination among santal families. The same is applicable for the Koradh families also. Even the santal mothers prefer to give birth of girls child which is different from the higher cast. At present santal families are also interested to provide education to both their sons and daughters. To drop out rate of santal boys are more than the santal girls. It means that santal girls are more advanced than the boys and therefore gender discrimination is less.

Reference:

Dixit, N.K. (2006). Tribals in India. Vista International, New Delhi.

Socio-Cultural, Economic and Educational Status of Santal Tribes in Paschim Medinipur and Jhargram District

ORIGINALITY REPORT

0%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	www.discoveryjournals.org Internet	27 words — < 1%
2	www.wbnsou.ac.in Internet	26 words — < 1%
3	jppipa.unram.ac.id Internet	25 words — < 1%
4	www.journalppw.com Internet	21 words — < 1%
5	Faisal Mahmood. "Globalization and Exclusion of Marginalized Sections of the Society:", Society & Sustainability, 2021 Crossref	20 words — < 1%
6	ijip.in Internet	20 words — < 1%
7	european-science.com Internet	19 words — < 1%
8	docslib.org Internet	17 words — < 1%
9	halshs.archives-ouvertes.fr	

Internet

15 words — < 1%

10	ijcrt.org Internet	15 words — < 1%
11	media.neliti.com Internet	14 words — < 1%
12	www.ijrte.org Internet	14 words — < 1%
13	ijrcs.org Internet	10 words — < 1%
14	archive.org Internet	8 words — < 1%
15	mafiadoc.com Internet	8 words — < 1%
16	saudijournals.com Internet	8 words — < 1%
17	www.coursehero.com Internet	8 words — < 1%
18	"Unraveling the Socio-Economic Condition of Tribal Peoples in West Bengal", International Journal of Recent Technology and Engineering, 2019 Crossref	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES	ON	EXCLUDE SOURCES	< 6 WORDS
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	ON	EXCLUDE MATCHES	OFF